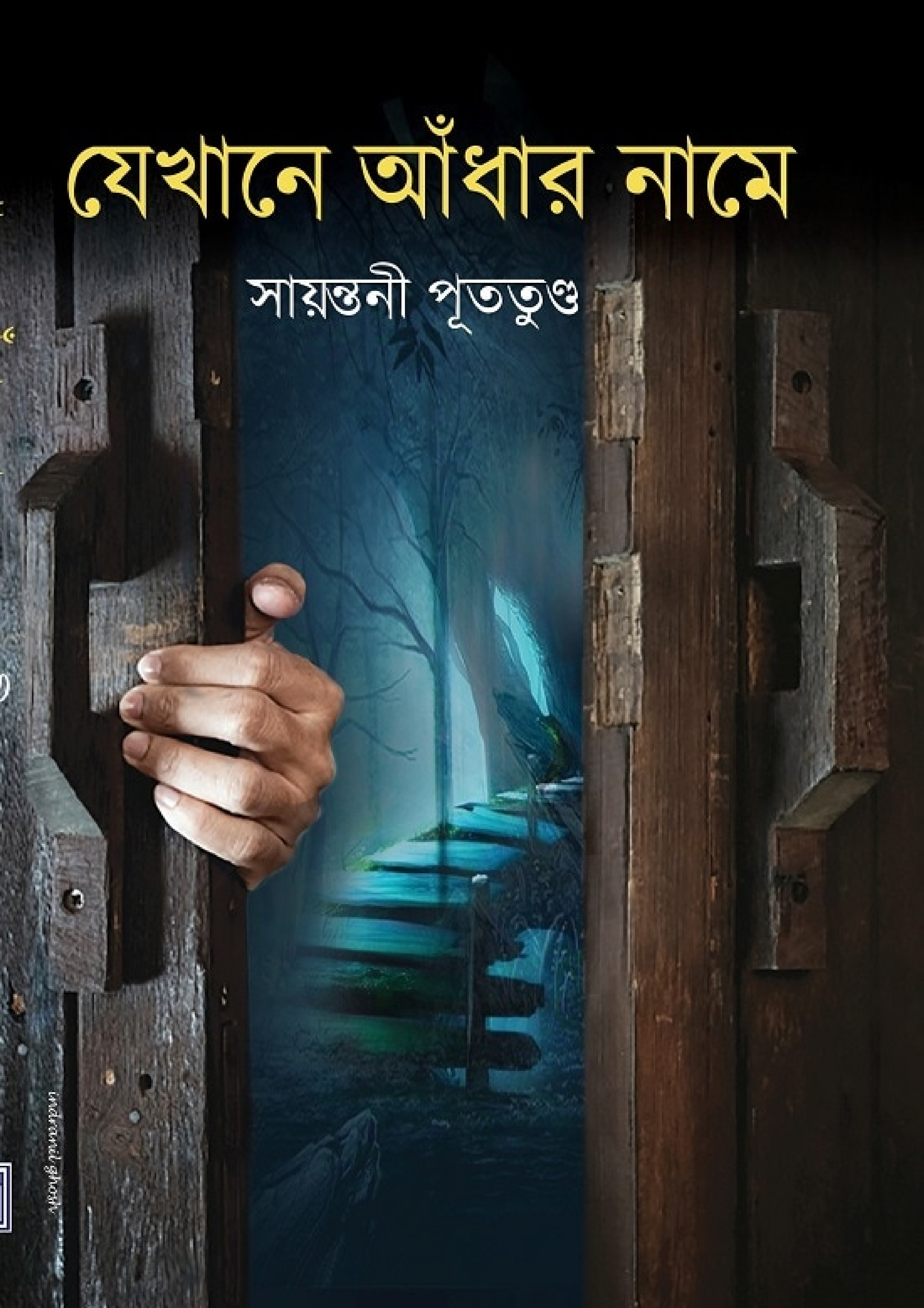

যেখানে আঁধার নামে
সায়ন্তনী পূততুণ্ড

যেখানে আঁধার নামে

যেখানে আঁধার নামে

সায়ন্তনী পুততুণ্ড

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড

JEKHANE ANDHAR NAAME

By

SAYANTANI PUTATUNDA

(A Collection of short Stories)

Code : 72 J 30

Dev sahitya Kutir (Pvt.) Ltd.

21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009

www.devsahityakutir.com

Tel : 2350-4294/4295/7887

Email : dev_sahitya@rediffmail.com

ISBN. 978-81-945179-5-5

প্রথম প্রকাশ : **বইমেলা, জানুয়ারি ২০২১, মাঘ ১৪২৭**

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

থেকে শ্রী রাজর্ষি মজুমদার ও রূপা মজুমদার

কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার

কর্তৃক এ. টি. দেব প্রেস

থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনীল ঘোষ

উৎসর্গ

আমার জ্যেঠুর চরণকমলে।
তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে
প্রণাম জানাই।

ভূমিকা

না, হরর বা থ্রিলার নয়। হয়তো আরও একটু ভয়াবহ।

ভূত বা খুনির থেকেও অনেক বেশি ভয়ংকর মানুষের মনের অন্দরমহল। অত্যন্ত সাধারণদর্শন নিরীহ মানুষের হাতে খুনির আঙুলও থাকতে পারে তা কেউ ভেবেছিল? শূন্য খাদের থেকেও ধোঁয়াশা বেশি মানুষের মনে! একজন মেগালোম্যানিয়াক যখন বলেন—'লেটস দেয়ার বি লাইট', তার পেছনে ভগবানের চেয়ে শয়তানের থাকার সম্ভাবনাই প্রবল! লুলুর মতো নিশ্চুপ অথচ প্রতিবাদী চরিত্রটি আসলে কে, আসলে কী? দুষ্ট আত্মা বলতে আমরা পিশাচকে বুঝি। কিন্তু শুধুমাত্র পিশাচেরাই কি ভয়ানক?...নাকি তার চেয়েও ভয়াবহ আরও কিছু আছে! বিশ্বস্ত সঙ্গী বলে আদৌ বাস্তবে কিছু আছে?...

এমনই কিছু ডার্ক গল্পের সংকলন নিয়ে আসছে...

যেখানে আঁধার নামে।

কে বলতে পারে, গল্পের আয়নায় কে কী দেখে ফেলবেন!!!! সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কে জানে, অন্ধকারে কার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!...

সূচি

চার নম্বর

১

বারাসতের রাখি পালের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই বালিগঞ্জ নিবাসী, রিটায়ার্ড সরকারি অফিসার পরেশ সান্যালের। কিন্তু তবু ওর খবর শুনতেই হবে তাঁকে! তিনি শুনতে না চাইলেও প্রায় কান ধরে টেনে শোনাবে চ্যানেলওয়ালারা! বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে সেই কিশোরীর নিষ্পাপ মুখ! পালাবার পথ নেই!

টিভিতে প্রতিটা চ্যানেলে তখনও সেই একই সংবাদ চলছে! সংবাদপাঠিকা নীল ব্লেজার পরে, লাল রঙের লিপস্টিক লাগিয়ে ন্যাকা ন্যাকা কণ্ঠে সেই একই শব্দগুলো বারবার বলে চলেছেন। এ ভাষণের আপাতত কোনও বিরাম নেই। যতদিন না ব্র্যান্ড নিউ, আরও গরম কোনও খবর না আসছে, ততদিন এই ধারাবাহিক বিবরণী চলবে। রাখি পাল নামক এক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর ওপরে তিন মদ্যপ, কামার্ত জানোয়ারের নৃশংস অত্যাচার! গ্যাং রেপ ও মার্ডার কেস! দুজন অভিযুক্ত ধরা পড়লেও তিন নম্বর এখনও ফেরার। পুলিশ সবেগে তার জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

'আপনার কী মনে হয় দিদি?' সংবাদপাঠিকা এবার ফোনে ধরেছেন এক বিখ্যাত সমাজসেবিকাকে। লাল ঠোঁট বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চুইংগাম চিবোনোর মতো চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'রাজ্যে এভাবে একের পর এক নৃশংস ধর্ষণের ঘটনার কারণ কী?'

সমাজসেবিকা কিছু বলার আগেই পরেশবাবু অস্ফুটে বললেন, 'সানি লিওন।'

পিছন থেকে মেয়ে মিঠির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। কণ্ঠস্বরে প্রতিবাদের সুর স্পষ্ট, 'মেয়েটা স্কুল ইউনিফর্ম পরে ছিল বাবা।'

পরেশবাবু বুঝলেন তাঁর মন্তব্যটা মিঠির কানে গিয়েছে। তিনি দুম করে সঙ্গে সঙ্গেই টিভি অফ করে দেন। রেপ নিয়ে মেয়ের সঙ্গে আলোচনা করবেন, এখনও তিনি অত আধুনিক হয়ে উঠতে পারেননি। বরং বাড়াবাড়ি রকমের রক্ষণশীল! মেয়ের যাতে চোখে না পড়ে সে জন্য খবরের কাগজ এলেই কাঁচি দিয়ে সটাসট কেটে দেন পৌরুষবর্ধক ক্যাপসুল বা বক্ষসৌন্দর্যবর্ধক তেলের বিজ্ঞাপনগুলো। টিভিতে অন্তর্বাস বা কন্ডোমের বিজ্ঞাপন দেখাতে শুরু করলেই চ্যানেল পালটে দেন। সন্ধে ছ'টার পরে মিঠির বাইরে থাকা বারণ। বন্ধুদের সঙ্গে ফিল্ম কিংবা বন্ধুর বাড়ির আড্ডা তো নৈব নৈব চ! কলেজ এবং বাড়ির বাইরে মিঠি একমুহূর্তও কোথাও কাটায় তা পরেশবাবুর পছন্দ নয়!

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মেয়ের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে তিনি আড়চোখে তার দিকে তাকালেন। ড্রেস কোড ঠিক আছে তো? মিঠি স্কুল ছেড়ে কলেজে পদার্পণ করলেও কখনও কাজল, লাইনার, মাস্কারা বা লিপস্টিক ব্যবহার করে না! ওর অন্যান্য বান্ধবীদের মতো মিঠিরও যে সাজতে ইচ্ছে করে না তা নয়। কিন্তু বাড়িতে বাবার বিশেষ বারণ আছে। কলেজে কি মানুষ পড়তে যায় না

স্টাইল দেখাতে যায়? 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'! শারীরিক সৌন্দর্যচেতনা সেই তপস্যার পথে মূর্তিমান ব্যাঘাত। এসব ব্যাপারে মাথা গলালে ছেলে-মেয়ে গোল্লায় যায়! এ বিষয়ে পরেশবাবু অত্যন্ত সতর্ক।

'ওড়নাটা কাঁধে ফেলে নিয়েছিস কেন?' তিনি মেয়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক করে নে।'

মিঠি ওড়না দিয়ে বুক ঢাকল। ইচ্ছে করছিল, খানিকটা মাথায় টেনে, ঘোমটা দিয়ে নেয়। কিন্তু বাবার সামনে বেশি বাড়াবাড়ি করার সাহস তার নেই। সুতরাং ওড়না ঠিক করে নিয়ে থমথমে মুখে বলল, 'ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'আসছি।'

'আয়।'

মিঠি বেরিয়ে গেল। পরেশবাবু অলস চোখে তার গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর আবার টিভিটা অন করে দিয়েছেন। ফের শুরু হয়ে গেল সেই একঘেয়ে প্যানপ্যানানি, 'গত শুক্রবার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী রাখি পাল...!' সঙ্গে সঙ্গেই স্ক্রিনে ভেসে উঠল উদ্ভিন্নযৌবনার পেলব মুখের ছবি।

এবার কিন্তু আর টিভি অফ করলেন না তিনি। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন মেয়েটির কোমল ফর্সা মুখ। টানা টানা কালো কুচকুচে ভুরুর নীচে দুটি মায়াবী স্বপ্নালু চোখ। ঈষৎ স্ফুরিত, অভিমানী একজোড়া গোলাপি ঠোঁট...!

২

রোজ বিকেলবেলায় সামনের পার্কে নিয়ম করে টহল দেওয়া অভ্যাস পরেশ সান্যালের। রিটায়ার করার আগে অবশ্য এই নিয়মটা ছিল না। কিন্তু কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই তিনি রীতিমতো স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠেছেন। রোজ নিয়ম করে ভোরে উঠে প্রাণায়াম, কপালভাতি ইত্যাদি নানারকম যোগাসন করেন। সঙ্গে একঘণ্টা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ। চল্লিশের পর সেই যে মিষ্টি খাওয়া ছেড়েছেন, আর কোনওদিন ছুঁয়েও দেখেননি। অবসর নেওয়ার পর থেকেই খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনেছেন। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য কম খান, সবজি খান বেশি। এমনকি খাবারের তালিকায় মাছ, ডিম, মাংসের পাটও তুলে দিয়েছেন। স্রেফ নিরামিষ বরাদ্দ। স্ত্রী হিমানীর ছলছলে দৃষ্টি, নম্র অনুরোধও তাঁকে আমিষমুখো করতে পারেনি! বিকেলে এই বিরাট মাঠটায় ন্যূনতম পাঁচ পাক চক্কর মারেন। অনেকটা ক্যালোরির সঙ্গে ঝরে যায় ফ্যাট, কোলেস্টেরল জাতীয় উৎপাত।

তাঁর হাঁটার সঙ্গী রতনবাবু মাঝেমধ্যেই বলেন, 'আপনি তো মশাই রীতিমতো সাত্ত্বিক মানুষ! আমাকে দেখুন! এত বয়েস হল, তা সত্ত্বেও মিষ্টির ওপর ছেলেমানুষের মতো লোভ! রাস্তায় এগরোল ভাজার গন্ধ বা গরম শিঙাড়ার সুবাস পেলেই নোলা সকসকিয়ে ওঠে। তখন বঙ্কিমবাবুর ওই

লাইনটা মনে পড়ে যায়! জীবনে রসগোল্লা, পান্তুয়া নেই! শিঙাড়া, তেলেভাজা দেখলেই মনে হয় পরস্ত্রী'র দিকে তাকাচ্ছি! হে ঈশ্বর, 'এ জীবন লইয়া কী করিব?'

মনে মনে মৃদু হাসেন পরেশ সান্যাল। 'সাত্ত্বিক' শব্দটা শুনতে তাঁর ভারী ভালো লাগে। অল্পবিস্তর অহং বোধও হয়। তবে মুখে কিছু বলেন না। শুধু বিশেষণটা উপভোগ করেন।

'এখনও পর্যন্ত ক'চক্কর মারলেন দাদা?'

আজ পার্কে ঢুকে গোটা দুয়েক পাক মারার পরই রতনবাবু এসে উদয় হলেন। দ্রুতগতিতে তাঁর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'কোটা কমপ্লিট নাকি?'

'না।' হাঁটার গতি না কমিয়েই উত্তর দেন পরেশ, 'আরও তিন পাক বাকি আছে।'

'আপনি মশাই কিছু মেইনটেইন করেছেন নিজেকে'। রতন বললেন; 'আমার গিন্নি তো রোজ কানের কাছে ক্যাটক্যাট করেন। 'ভুঁড়ি কমাও, ভুঁড়ি কমাও!' কিন্তু ভুঁড়ি বাবাজি আর কমবার নাম নিচ্ছেন না। একেবারে প্রেয়সীর মতো কোমর আঁকড়ে বসে আছেন।'

'হাঁটাহাঁটি তো আপনিও কম করেন না! তবু ভুঁড়ি কমছে না কেন?'

রতনবাবু একটা প্রাণখোলা হাসি হাসলেন, 'কী করে কমবে দাদা! দেহটাকে কষ্ট দিয়ে ক্যালোরি ঝরাচ্ছি, কিন্তু ওদিকে যে চোখ বেয়ে প্রাণের আরাম হচ্ছে। তাতেই ক্যালোরি বেড়ে যাচ্ছে।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বিরক্ত হন পরেশ। রোজ সকালে ও বিকেলে অল্পবয়সি মেয়েরা এই মাঠেই কবাডি খেলা প্র্যাকটিস করে। টাইট টপ আর শর্টস পরিহিত মেয়েদের ধস্তাধস্তি চলতেই থাকে। টানা-হেঁচড়ার চোটে কারোর টপটা খানিকটা উঠে যায়। চোখে পড়ে কমনীয় কোমর বা পেট। কখনও শর্টসটা উঠে যায় আরও ওপরে! সবার সামনে উন্মুক্ত কচি মেয়ের জঙ্ঘা! পরেশবাবুর অস্বস্তি হয়! রাগও হয়! এটা খেলা, না শরীরের প্রদর্শনী! খেলার চোটে ওদের কারোর খেয়ালই থাকে না যে কখন নীচু হয়ে আক্রমণ করার সময়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্লিভেজ! টেনে ধরার সময়ে কারোর শর্টস বিপদসীমার ওপরে উঠে যাচ্ছে! মেয়েগুলো কী নির্বিকার! নির্বিকার না নির্লজ্জ! ওদের বাপ-মা কি এসব দেখে না? বরদাস্ত করে কী করে? আর রতনবাবুও বলিহারি! এখানে এসে এইসব দেখছেন! মেয়েরা ছোট ছোট জামা পরে লাফালাফি করছে দেখে ওঁর চোখের নাকি আরাম হচ্ছে!

'ওই মেয়েটা দারুণ খেলে।' রতন একটি লম্বা বলিষ্ঠ চেহারার মেয়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, 'ওকে আমি চিনি। রেলপাড়ের বস্তিতে থাকে। ওর মা লতা আমাদের বাড়িতে ঠিকা কাজ করে। মেয়েটা পড়াশোনায় আহামরি কিছু না। কিন্তু খেলোয়াড় হিসাবে দুর্দান্ত। অসম্ভব পরিশ্রমও করে। লতা মাঝেমধ্যেই বলে, মেয়ে যদি একটা টিমে সিলেক্টেড হয়ে যায়, তাহলে ভালো চাকরি পাবে। ওর বাপটার তো অ্যাক্সিডেন্টে দুটো পা-ই কাটা গিয়েছে! সংসার লতাই চালায়! মেয়েটা যদি কোনওভাবে স্কোপ পেয়ে যায় তবে...!'

রতনবাবুর কথা কানে ঢুকছিল না পরেশ সান্যালের। তিনি মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলেন। লম্বা, চওড়া যথেষ্ট ভরন্ত দেহ। তার ওপর টপটা যেন কেটে বসছে শরীরে। ঘামে ভিজে লেপ্টে গিয়েছে

গায়ের চামড়ার সঙ্গে। বুকের ঔদ্ধত্য, কোমরের খাঁজ, মসৃণ উরুর পেলবতা; সব যেন বড় বেশি প্রকট!

মেয়েটার কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম পড়ছিল! শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে। তবু ঘর্মাক্ত মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শত্রুকে যে করেই হোক হারাবে। তার অনেক শত্রু। বাড়িতে পঙ্গু বাপ বসে আছে। মা দশ বাড়িতে খেটে দু-বেলা দু-মুঠো খাবার জোগাড় করে! ছোট বোনটা গতবছর তিনদিনের জ্বরে বিনা চিকিৎসাতেই মারা গেল। ছোট ভাইটার স্কুল ফিজ এবার জমা না দিলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে...!

মেয়েটা লড়ছিল প্রতিপক্ষের সঙ্গে! পরেশবাবু তখন তার পরনের ঘামে ভেজা টাইট টপ আর শর্টস দেখে মেয়েটির চরিত্র বিশ্লেষণ করছিলেন! মেয়েটির মুখ এতদূর থেকে ভালো করে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু মনে হল স্পষ্ট দেখছেন :

...সেই কোমল ফর্সা মুখ। টানা টানা কালো কুচকুচে ভুরুর নীচে দুটি মায়াবী স্বপ্নালু চোখ। ঈষৎ স্ফুরিত, অভিমানী একজোড়া গোলাপি ঠোঁট...!

রাখি পালের স্কুল ইউনিফর্ম কী ছিল? টাইট ব্লাউজ? আর হাঁটুর অনেকটা ওপরে তোলা স্কার্ট?

৩

তখন মধ্যরাত। কোথাও যেন জল পড়ার অবিরাম শব্দ, টুপটাপ। তার মধ্যেই দুটো কুকুরের প্রবল আস্ফালন ভেসে আসে। নিজেদের অধিকার নিয়ে চলছে লড়াই। কেউ কাউকে একতিলও জায়গা ছেড়ে দেবে না। হিংস্র দন্তপংক্তি বের করে প্রবল গর্জনে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে দুটি শ্বাপদ। সর্বশক্তি দিয়ে হারানোর চেষ্টা করছে একে অপরকে।

পরেশবাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে দেখছিলেন এই প্রাণান্তকর যুদ্ধ। এ যুদ্ধ অকারণ নয়। দুটি যুযুধান সারমেয়র মাঝখানে বসে আছে এক সুন্দরী। তাকে নিয়েই যুদ্ধ চলছে দুজনের। যে অপেক্ষাকৃত বলবান, সে-ই যুদ্ধ জিতে দখল নেবে সুন্দরীর। আর পরাজিত সারমেয়টি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রাস্তা ছেড়ে দেবে। এটাই নিয়ম! এটাই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ক্ষুধা থেকে শুরু করে যৌনতা; সব কিছুর জন্যই ওদের লড়তে হয়। ওরা কুকুর। মানুষ নয় যে ভাগ-যোগ করে ভোগ করবে। মানুষ হলে তো দুজনে মিলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত! আফটার অল, সামাজিক প্রাণী!

আজ রাতেই রাখি পাল গ্যাংরেপ ও মার্ডার কেসের তৃতীয় অপরাধীটি ধরা পড়েছে। তার বাবা-মা থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন, এমনকি প্রতিবেশীরাও বিশ্বাস করতে পারছেন না যে ওই আপাতনিরীহ ছেলেটি এমন ভয়ংকর কাজ করতে পারে! প্রত্যেকেই মিডিয়াকে বলছেন, ‘ও এমন কাজ করতেই পারে না। ও তো ভালো ছেলে!’

‘ভালো ছেলে’! শব্দটা শুনেই হাসি পেয়ে যায় পরেশের। এ তো সামাজিক বিশেষণ! যেমন রতনবাবু তাঁকে বলেন ‘সাত্ত্বিক মানুষ’!

এখনও বেডরুম থেকে তাঁর স্ত্রী হিমানীর কাতর গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন যন্ত্রণায়। হয়তো নির্যাতনটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছে। হিমানী চাননি। আপ্রাণ বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরেশবাবু তাঁর সমস্ত প্রতিরোধকে দুরমুশ করেছেন নৃশংস ভাবে! তাঁর ভালো লেগেছে স্ত্রী'র ওপর অত্যাচার করতে। সব কাজ শেষ করে এই মুহূর্তে ভীষণ,...ভীষণ পরিতৃপ্ত পরেশ সান্যাল। অনেকদিন পরে সত্যিই এমন আরামদায়ক অভিজ্ঞতা হল।

শুধু একটা কথা কোনওদিন কেউ জানবে না। হিমানীও বুঝতে পারেননি, আগামীতেও পারবেন না। যখন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন হিমানীর ওপরে, অত্যাচারে তাকে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করছিলেন, অদৃশ্য দাঁত-নখে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করছিলেন, তখন ওখানে হিমানী ছিল না! ছিল সেই কোমল ফর্সা মুখ! টানা টানা কালো কুচকুচে ভুরুর নীচে দুটি মায়াবী স্বপ্নালু চোখ! ঈষৎ স্ফুরিত, অভিমানী একজোড়া গোলাপি ঠোঁট...!

তিন নম্বর ধরা পড়েছে। কিন্তু তাতে পরেশবাবুর কী? রাখি পালের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই!

তিনি তো শুধু চার নম্বরে আছেন!

—

অ্যালঝাইমার

'আই হেট অ্যালঝাইমার! অ্যালঝাইমার কী জিনিস জানেন?'

প্রশ্নটা আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে রইলেন তরুণ বিজ্ঞানী সুগত সেন। তাঁর তীব্রদৃষ্টি আমায় জরিপ করছিল। যেন শব্দটার গুরুত্ব বোঝাতে চাইছেন। আমি চুপ করে বসেছিলাম। ভদ্রলোক আঙুল তুলে নির্দেশ করেন—

'ওই দেখুন, অ্যালঝাইমার।'

শব্দগুলো উচ্চারণ করেই তিনি বারান্দার দিকে তাকালেন। আমিও তাঁর নজর অনুসরণ করে তাকাই। বারান্দায় আরামকেদারায় এক বয়স্ক ভদ্রলোক চুপ করে বসে আছেন। একমাথা সাদা চুল, পাকা গোঁফ-দাড়ি। কোনওদিকে হুঁশ নেই। শুধু চুপ করে সামনে তাকিয়ে থাকা ছাড়া যেন জগতে আর তাঁর কোনও কাজ নেই! একেবারে পুতুলের মতো স্থির।

'উনি আমার বাবা!' সুগত একটু থেমে বললেন, 'সারাদিন ওখানেই বসে থাকেন। খেতে দিলে খান, নয়তো অভুক্তই থাকেন। চলতে ফিরতে ভুলে গেছেন। অবশ্য এখনও কথা বলেন। তবে আমার সঙ্গে নয়। মায়ের সঙ্গে। ওঁর তো এও মনে নেই যে মা বহুবছর হল মারা গিয়েছেন।'

আমি কী বলব বুঝে পাই না। এমন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলাও খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। শব্দগুলোরও বুঝি স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যায়। বেশির ভাগ সময় একটাই স্বরবর্ণ এমন অবস্থায় সামাল দেয়। আমার মুখ থেকেও সেই অক্ষরটাই বেরোল, 'ও!'

' 'ডিমেনশিয়া' থেকে একটু একটু করে 'অ্যালঝাইমারের' দিকে চলে গেলেন। প্রথম প্রথমই কিন্তু সবকিছু ভুলতেন না। শুধু সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোই ভুলে যেতেন।' সুগত বিড়বিড় করে বললেন, 'পরে আর কিছুই মনে রইল না। শুনেছি আমার ঠাকুর্দারও এই রোগটা ছিল। ওঁকেও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল অ্যালঝাইমার। বাবার মুখেই শুনেছি।'

আমি একটু আন্তরিক স্বরেই বলি, 'বুঝতে পারছি।'

'না। আপনি বুঝতে পারছেন না।' ওঁর কণ্ঠস্বর এবার তীব্র হয়ে উঠেছে, 'যে এই রোগের মুখোমুখি দাঁড়ায়নি, সে কখনও এই কষ্ট, এই নরকযন্ত্রণা বুঝবে না। আপনার কোনও প্রিয় মানুষের এই রোগ হয়েছে?'

আমি নেতিবাচক ভাবে মাথা নাড়ি। আমার পূর্বপুরুষেরা কখনও বিস্মৃতির রোগে ভোগেননি। বরং তাঁদের স্মৃতিশক্তি এতটাই জোরালো ছিল যে শৈশবের প্রতিটা ঘটনা শেষদিন পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন তাঁরা।

'তাহলে জীবনেও বুঝবেন না।' সুগত বললেন, 'আমি আমার ঠাকুর্দাকে দেখেছি। তখন একেবারে লাস্ট স্টেজ। বেশির ভাগ সময়ই চুপ করে বসে থাকতেন। আর প্রায়ই খুব শান্তস্বরে ঠাকুমাকে

ডাকতেন। আজও তাঁর সেই কণ্ঠস্বর মনে পড়ে। বাবা রোজ তাঁকে বোঝাতেন যে ঠাকুমা কোনওদিনই ফিরবেন না, তিনি সাত বছর আগেই মারা গিয়েছেন! কিন্তু কে শোনে কার কথা! সাময়িক চুপ করে যেতেন ঠিকই, আবার কিছুক্ষণ পরেই ডাকাডাকি শুরু হয়ে যেত! কীভাবে খেতে হয়, ভুলে গিয়েছিলেন। খাবার দিলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন। যেন কী দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারছেন না!' তাঁর কণ্ঠস্বরে অব্যক্ত যন্ত্রণা উঠে এল, 'ভেবে দেখুন, আপনার প্রিয় মানুষ আপনারই চোখের সামনে একটু একটু করে জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ভুলে যাচ্ছেন, আপনাকে এমনকি নিজেকেও ভুলে যাচ্ছেন, অথচ আপনার কিছু করার নেই! একটা অদৃশ্য ডাস্টার আস্তে আস্তে একটা অস্তিত্বকে মুছে দিচ্ছে, আপনার জীবনের একটা মূল্যবান অধ্যায়কে শেষ করে দিচ্ছে, অথচ আপনার নীরব দর্শকের মতো দেখা ছাড়া উপায় নেই! এই যন্ত্রণার নাম : অ্যালঝাইমার! ক্যান্সারও হয়তো এর চেয়ে অনেক সদয় রোগ। দুটো রোগই কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। ক্যান্সার কষ্টকর! কিন্তু অ্যালঝাইমারের মতো নিষ্ঠুর জিনিস এ পৃথিবীতে আর নেই।'

'সেজন্যই কি অ্যালঝাইমারকে এত ঘৃণা করেন?'

প্রশ্নটা অবিকল সাংবাদিকের মতো ছুড়ে দিয়েছি। ভদ্রলোক ফের কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। তরুণ বিজ্ঞানীর কাটা কাটা ধারালো সুন্দর মুখে অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি! চশমার পেছনের ভাসা ভাসা চোখ একটু অন্যমনস্ক। যেন মনে মনে উত্তরটা খুঁজছেন।

আমি প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করব কিনা ভাবছিলাম। তার আগেই তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'না। শুধু এটুকুই নয়। অ্যালঝাইমার আমার জীবন থেকে আরও অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে। অনেক দামি কিছু...!'

'কী?'

কৌতূহলী হয়ে জানতে চাই। সুগত আমার দিকে ওঁর আকর্ষণীয় চোখদুটো তুলে তাকালেন। ভদ্রলোক অসম্ভব রূপবান। বয়স কত হবে? মেরেকেটে চল্লিশ! কিন্তু রূপের চেয়েও বেশি আকর্ষণ করে তীক্ষ্ণতা। তীক্ষ্ণ চোখদুটোর দৃষ্টি এখন যেন তীক্ষ্ণতর। দৃষ্টি নয়, যেন লেসার বিম! ভয় হল, উনি একবার আমার ওপরে দৃষ্টিটা আলতো করে বোলালেই আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাব!

তেমন কিছু অবশ্য ঘটল না। সুগত দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'সে অনেক কথা। বলতে সময় লাগবে।' একটু থেমেই ফের জুড়ে দিলেন আরও একটা শব্দ, 'শুনতে চান?'

ডঃ সুগত সেনের কথা :

আমার মা যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেদিনটা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

দিনটা অন্য কারণে আমার কাছে স্মরণীয় ছিল। সেদিনই আমি প্রথম স্কুলে গিয়েছিলাম। এদিকে আমি প্রথমবার স্কুলে গেলাম, আর ওদিকে তিনি প্রথমবার হাসপাতালে গেলেন। তফাত একটাই। আমি দিনের শেষে বাড়ি ফিরলাম। তাঁর আর সেদিন ফেরা হল না।

বাবা তখন উঠতি সাহিত্যিক। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে দেবী সরস্বতীর যতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে ততটাই বৈরিতা! দুই দেবীর মারপিটে আমাদের নাভিশ্বাস উঠত। মা স্কুলে চাকরি করে সংসার চালাতেন। ফলে তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়াটা আমাদের কারোর কাছেই অভিপ্রেত ছিল না। মা-বাবার প্রেমজ বিয়ে। মা বড় ঘরের সুন্দরী, বিদুষী মেয়ে। কিন্তু কষ্টের সংসারের জোয়াল নিজের কাঁধে তুলে নিতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি করেননি। হাসিমুখেই সব কর্তব্য করতেন। কোনওদিন তাঁকে কোনও অনুযোগ করতে শোনা যায়নি।

বাবা বেশির ভাগ সময়টাই অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে থাকতেন। সে ঘোরে প্রেম, বিপ্লব, স্বপ্ন ও স্বপ্নসুন্দরী, দুনিয়ার তাবৎ সুন্দর ও রোম্যান্টিক জিনিস থাকতে পারে, কিন্তু ডাল, চাল, তেল, নুন, আটা কখনই ছিল না। বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে ঘাড় গুঁজে ডায়েরিতে একমনে লেখালেখি করে যেতে দেখেছি। দুনিয়ার কোথায় কী হচ্ছে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা ছিল না। শুধু যখন আমার অ্যালঝাইমারগ্রস্ত ঠাকুর্দা ঠাকুমার নাম ধরে ডাকাডাকি করতেন, তখনই একটা অদ্ভুত যন্ত্রণার ছায়া তাঁর নিস্পৃহ মুখে ছাপ ফেলে যেত। এ ছাড়া উনি আমার কাছে স্রেফ একটুকরো হিমশৈল; আইসবার্গ বললে বোধহয় ঠিক হয়! সংসার সমুদ্রে একটুকরো নির্লিপ্ত শীতল বরফের ভাসমান চাঁই। উপরটুকু দেখা যায়। তার শিরা-উপশিরা সমুদ্রের অতলান্তে কতদূর ছড়িয়ে আছে বোঝা দুষ্কর!

এই অবধি বলেই ডঃ সেন একটু থামলেন। তাঁর চোখদুটো তখন অতীতের সাম্রাজ্যে বিচরণ করছে। আমি তাঁর মৌনতাকে ভাঙলাম না। বরং কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওঁর বাবার দিকে তাকিয়েছি। ভদ্রলোক এখনও আরামকেদারায় চুপ করে বসে আছেন। দক্ষিণের দামাল বাতাস তাঁর সাদা চুলে ঝটপটিয়ে খেলা করছে। সাদা পাঞ্জাবি ইতস্তত উড়ছে। কিন্তু লোকটার কোনও সাড় নেই।

একটু সময় নিয়েই ফের সুগত মুখ খুললেন, 'প্রায় দিন পনেরো পরে মা বাড়িতে ফিরে এলেন। আমি বাদে সবাই জানতে পারল, রোগটা লাং ক্যান্সার। আমি দেখলাম আমার সুন্দরী মা কয়েকদিনেই শুকিয়ে কালো হয়ে গেছেন! বিশেষ কিছুই বুঝলাম না। শুধু দেখলাম এই প্রথম আমার হিমশৈল বাবা বিচলিত হলেন। ভয় পেলেন! একদিন সকালে আমার দাদু, দিদু, মামা, মাসি আচমকা এসে হাজির। ক্যান্সারের চিকিৎসা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য বাবার ছিল না। কিন্তু দাদুর ছিল। তাই বাবাকে যা নয় তাই বলে ভর্ৎসনা করে, শেষ পর্যন্ত মাকে ওঁরা নিয়ে গেলেন। আমাকে আর বাবাকে দেখার জন্য রেখে গেলেন পুষ্পমাসিকে। মায়ের অবিবাহিতা পিসতুতো বোন। পুষ্পমাসি এতটাই কুৎসিত ছিলেন যে বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাপ-মা কেউ ছিল না বলে দাদুর সংসারে আশ্রিতা ছিলেন। তবে সংসারের কাজে অসম্ভব পারদর্শী হওয়ায় তিনিই আমাদের সংসারের দায়িত্ব নিলেন।

এরপরের বিস্তারিত ইতিহাস বলে আর গোটা আখ্যানকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। মা চিরদিনই অত্যন্ত দৃঢ় চিত্তের, লড়াকু মনের মানুষ! শেষ পর্যন্ত লড়লেন রোগটার সঙ্গে। আমাকে মামা রোজই স্কুল থেকে নিয়ে যেতেন দাদুর বাড়িতে। সেখানে মাকে দেখতাম। শীর্ণ, ক্লান্ত মুখটা ঝলমল করে উঠত আমাকে দেখলেই। প্রায়ই বাবার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। খুব আদর করে পাশে বসিয়ে জলখাবার খাওয়াতেন। তারপর মামাই আবার পৌঁছে দিতেন আমাদের বাড়িতে।

আমার ছোট্ট মনে প্রায়ই একটা প্রশ্ন উঠত। আমি তো রোজই আসি। কিন্তু বাবা কেন মাকে দেখতে আসেন না! সে কথা বললেই মা বিষণ্ণ হয়ে যেতেন। এক টুকরো হাসি কোনওমতে টেনে এনে উত্তর দিতেন, ‘বাবার তো অনেক জরুরি কাজ! তাই হয়তো সময় পান না। কাজ শেষ হলেই আসবেন।’

একবছর রোগটার সঙ্গে প্রাণপণ লড়ে গেলেন মা। তার মধ্যে একদিনও বাবার তথাকথিত ‘জরুরি কাজ’ শেষ হল না! বরং জরুরি কাজের মধ্যে আরও কিছু কাজ যুক্ত হল। যখন আমি মামাবাড়ি থেকে ফিরতাম, তখন দেখতাম বাবা মাসির সঙ্গে কোথাও বেরোচ্ছেন! মাসি আমার মায়ের গয়না, শাড়িতে সেজেগুজে কোথাও চলেছেন! বয়েস কম ছিল। কিন্তু তবু সহ্য হত না! মাসি কেন মায়ের শাড়ি পরবে? কেন গয়না পরবে? কেন বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?

শুধু এইটুকুই নয়! একদিন রাতের বেলায় আচমকা ঘুম ভেঙে আবিষ্কার করলাম, বাবা পাশে নেই! ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক তাকাই। কই, কোথাও কেউ নেই তো! ভয়ে কান্না পেয়ে গেল। উঠে বাইরে বেরিয়ে দেখি মাসির ঘরে আলো জ্বলছে। এক শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতেই ছুটে যাই সেদিকেই। কিন্তু যা দেখলাম, তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝলাম না! মাসির সঙ্গে বাবা এটা কী করছে? খেলছে নাকি! ওদের দুজনেরই গায়ে জামাকাপড় নেই কেন! এ কী! আমায় একা ফেলে বাবা এখানে মাসির সঙ্গে খেলবে কেন?

রেগেমেগে নালিশ করলাম মায়ের কাছে। মা যথারীতি আদর করতে করতে বলেছিলেন, ‘লক্ষ্মী হয়ে থেকো বাবু। ভালো করে পড়াশোনা কোরো। মাসির সব কথা শুনে চলবে। আর বাবা লিখতে বসলে একদম বিরক্ত করবে না।’

আমি চটেমটে বললাম, ‘বাবা তো লেখেই না। রাতে রোজ আমায় ছেড়ে মাসির সঙ্গে খেলা করে। আমার একা শুতে খুব ভয় করে মা!’

মায়ের মুখ দিয়ে শুধু একটা কথাই বেরোল, ‘কী!’

এ জাতীয় কথা যে সর্বসমক্ষে বলতে নেই তা জানা ছিল না! ফলস্বরূপ যা হওয়ার তা হল। দাদুর মুখ গম্ভীর হল। মামা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন, ‘শালা লম্পট! আজ ওর একদিন কী আমার একদিন! জা-নো-য়া-র! ব্লাডি বাস্টার্ড...!’

বলতে বলতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি! আর মা এতদিন এত যন্ত্রণা সহ্য করেও যা করেননি, সেদিন তাই করলেন। কেঁদে ফেললেন। তখন সেই কান্নাকে বর্ণনা করার সঠিক বিশেষণ জানা ছিল না। বড় হতে হতে অনেকরকম কান্না দেখেছি। আজ বলতে পারি মায়ের কান্নাটাকে ‘বার্স্ট ইনটু টিয়ার্স’ বললে হয়তো খানিকটা বোঝানো যায়।

পরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত! দাদু আমায় আর ফিরে যেতে দিলেন না ও বাড়িতে। পুষ্পমাসিকেও এ বাড়িতে ফিরিয়ে আনা গেল না। তিনি বাবার সঙ্গেই থাকলেন। এর মধ্যেই মা এক সকালে চলে গেলেন। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ ওই একটা কুৎসিত বাস্তবই তাঁর সমস্ত বাঁচার ইচ্ছে, লড়াই করার

সাহস ; একলপ্তে ছিনিয়ে নিয়েছিল। মা তো সেদিনই শেষ হয়ে গিয়েছিলেন। দৈহিক তথা আনুষ্ঠানিক মৃত্যুটা শুধু বাকি ছিল। যাওয়ার আগে আমায় ডেকে বললেন, 'বাবু, বাবাকে ক্ষমা করে দিস।'

এরপর গঙ্গা, ভলগা, দানিয়ুব দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেল। আমি বড় হলাম। বড় হতে হতেই শুনলাম, আমার বাবা একজন চরিত্রহীন, লম্পট, স্বার্থপর এবং সুবিধাবাদী। মায়ের মৃত্যুর জন্য বাবাই দায়ী! বাবার অবহেলা, তঞ্চকতা, বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই অকালে চলে গেলেন মা। শুনতে শুনতে, জ্বলতে জ্বলতে বড় হলাম। ও পক্ষের কথা শোনার সুযোগ ছিল না। কারণ প্রথমদিকে আমায় ও বাড়িতে যেতে দেয়নি কেউ। পরে আমি নিজেই যেতে চাইনি কখনও। ছোটবেলায় যে দৃশ্যগুলো কাঁচা চোখ দেখেছিল, সেগুলোর প্রকৃত অর্থ এতদিনে বুঝতে পারলাম। সর্বশরীর ঘৃণায় রি রি করে উঠল! আইসবার্গের অদেখা অংশটা এত কুৎসিত! ঘৃণা, ক্ষোভ, প্রশ্নের চেয়েও বেশি ছিল প্রতিশোধস্পৃহা! যত বয়েস বাড়ে, প্রতিহিংসার জ্বালাও বেড়ে যায় ততগুণ! মা ক্ষমা করে দিতে বলেছিলেন। আমি পারলাম না। এতদিন ধরে শোনা কথাগুলোই বসে গেল মনের ভেতরে। আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করলাম, মারণ রোগ ক্যান্সার নয়, ওই দুই নারী-পুরুষ আমার মায়ের মৃত্যুর কারণ! ওরা মায়ের বিশ্বাসকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল! তার শাস্তি পাবে না? এ কি সম্ভব? ক্ষমা নয়, শাস্তিই পেতে হবে। কঠোর শাস্তি!

যত দিন যায়, তত দিনই অন্ধরাগ মাথায় চড়ে বসতে থাকে। আমি পড়াশোনা করে বড় হলাম। দাঁতে দাঁত চেপে জেদের বশে একের পর এক স্কলারশিপ ঘরে তুললাম! এই অসম্ভব জেদ ও পরিশ্রমের ইন্ধন জুগিয়েছিল সেই ভয়ংকর প্রতিশোধস্পৃহা! লোকমুখেই শুনেছিলাম বাবা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। পুষ্পমাসি ছোটখাটো একটা কাজ করে সংসার চালায়। ভাবলাম, বেশ হয়েছে। ওদের দেখিয়ে দেব, আমি, ওই হতভাগী, প্রবঞ্চিত মায়ের ছেলে কত বড় মানুষ হতে পারি! যাঁকে তোমরা মেরে ফেলেছ, তাঁর রক্ত কত বড় হতে পারে প্রমাণ করার ছিল। বিজ্ঞানী হলাম। নামডাক হল অল্পবিস্তর। কিন্তু নিজের মনেরই রাশ আমার হাতে নেই। দিনরাত শুধু মাথার মধ্যে একটাই শব্দ আগুনপাখির মতো ডানা ঝাপটে মরত, 'প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে হবে!'

আর কতদিন এভাবে চলত কে জানে। প্রতিশোধের জ্বালায় ক্রমাগত অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। অথচ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উপায় নেই! নিজের মধ্যেই গুমরে মরছি। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলাম, সাফল্যে শান্তি নেই। প্রতিশোধে আছে! কথায় আছে, মানুষ একান্তভাবে যা কামনা করে, দুনিয়ার কোনও শক্তি, এমনকি স্বয়ং ঈশ্বরও তাকে সেই বহু ঈপ্সিত বস্তু থেকে বেশিদিন দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না। আমি রিভেঞ্জ চেয়েছিলাম। কিন্তু রাস্তা দেখতে পাইনি। শেষ পর্যন্ত ভাগ্য সে সুযোগ এনে দিল।

একরাতে পুষ্পমাসি ফোন করলেন। বললেন, 'বাবু, কিছু কথা তোমার শোনা দরকার। তোমার বাবা গুরুতরভাবে অসুস্থ! হয়তো বেশিদিন থাকবেনও না! তোমার এবার কিছু কথা জানার সময় এসেছে।'

এককথায় রাজি হয়ে যাই। কেনই বা আপত্তি করব! এই সুযোগটার অপেক্ষাতেই তো এতদিন বসেছিলাম! আমি আর আমার মায়ের খুনিরা মুখোমুখি! এবার ওঁদের সব কথা শুনব আমি। আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এতদিন যে জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছি, ওঁদেরও সেই জ্বালায় জ্বলতে হবে। শাস্তি পেতে হবে, নির্মম শাস্তি!

পরদিন বিকেলে ঠিক সময়মতোই ও বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। বহুবছর পর যাচ্ছি; তাই সৌজন্যবশত একটা ছোট মিষ্টির বাক্স নিতে ভুললাম না! আমার মনের অবস্থা তখন বলার মতো নয়! মায়ের খুনিদের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি, অথচ হাতে বন্দুকের বদলে মিষ্টির বাক্স! নিজের ওপরই ঘৃণা হচ্ছে। ভীষণ...ভীষণ ঘৃণা! সারা রাস্তা নিজেকে চাবুক মারতে মারতে গেলাম। যন্ত্রণা আর ঘৃণা উত্তরোত্তর বাড়ছে। মনে হচ্ছিল নিজেকেই মেরে ফেলি! জীবনে নিজেকে খুনি বলে মনে হয়নি। কিন্তু যখন নিজের পৈতৃক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখনই টের পেলাম আমার ভিতরে একটা উন্মত্ত জানোয়ার লাফিয়ে, দাপিয়ে মরছে। বেল বাজাতেই পুষ্পমাসি দরজা খুললেন। ইচ্ছে করছিল তখনই তাঁর গলা টিপে ধরি!

'এসো!' মাসি আমায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন, 'কত বড় হয়ে গেছ! কত নামডাক তোমার! তোমায় কত ছোট দেখেছিলাম! তুমি একেবারে দিদির চেহারা পেয়েছ!'

আদিখ্যেতা! টের পেলাম জিঘাংসা ক্রমাগতই সহ্যের সীমা ছাড়াচ্ছে!

ভিতরের ঘরে বাবা বসেছিলেন। অনেকদিন পর দেখলাম তাঁকে! সেই একই রকম! আস্ত একটা হিমশৈল! কোনও তাপ-উত্তাপ নেই!

'এই দেখো। তোমার ছেলে!' মাসি হেসে বললেন।

বাবা বিস্মিত, 'আমার ছেলে! কিন্তু সে তো ভেতরের ঘরে!'

এবার আমার ভিতরের রাগটা চরম সীমায় পৌঁছল! নিজের স্ত্রীকে অপমান করেছে এই জানোয়ারটা! তাঁকে খুন করেছে। এখন তাঁর গর্ভজাত ছেলেকেও এতবড় অপমান! আমাকে অস্বীকার করছে লোকটা! ভিতরের ঘরে ওঁর কোন ছেলে আছে? এই বেশ্যার অবৈধ সন্তান? সে-ই ওর ছেলে? আমি নই? আমার ভেতরের জানোয়ারটা এবার শেকল ছেঁড়ার জন্য দাপাদাপি করতে শুরু করে...!'

বলতে বলতেই ফের থেমে গেলেন সুগত। ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছেন। চোখদুটো ফের অন্যমনস্ক। কাঁপা হাতে সিগারেট ধরালেন। আমি একটু অধৈর্য হয়েই বলি, 'তারপর?'

'তারপর?' তিনি একটু হেসে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা পুরোনো চিঠি বের করে এগিয়ে দিলেন, 'মাসি এই চিঠিটা তুলে দিলেন আমার হাতে। বললেন, 'সময় করে পড়ে নিও।'

'স্নেহের বাবু,

হয়তো তুমি আমাদের ওপরে এখনও রেগে আছ। হয়তো মনে মনে ঘৃণা করো আমাদের। তবু আশা করছি এ চিঠি পড়ার পর আমাকে না হোক, তোমার বাবাকে অন্তত ক্ষমা করতে পারবে। তুমি

একজন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের পরিভাষা বুঝবে বলেই সব কথা জানাচ্ছি।

তোমার মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তোমার বাবার অবস্থা দেখার মতো ছিল। অনুশ্রীদি, মানে তোমার মাকে ছেড়ে থাকা মানুষটার পক্ষে যমযন্ত্রণার শামিল। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝি; সমস্যাটা তখন থেকেই শুরু হয়। প্রথম প্রথম বেশি কথাবার্তা বলতেন না। কেমন চুপ করে থাকতেন। তারপর আচমকা একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'অনু, চা দেবে না?'

আমি ওঁর ভুল শুধরে দিই, 'জামাইবাবু, আমি অনু নই। পুষ্প।'

এর ঠিক মিনিট পাঁচেক পরেই ফের ডাক এল, 'অনু, চা দিয়ে যাও!'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ওঁকে চা দিয়ে এলাম। কিন্তু ঘটনাটা সেখানেই থেমে থাকল না। ফের একদিন বললেন, 'অনু, তুমি আজকাল আর সাজো না কেন? সাজলে তোমায় বেশ দেখায়!'

আমি অবাক, 'জামাইবাবু, আমি অনু নই!'

জামাইবাবু স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। যেন আমার কথা কানেই যায়নি। তারপর নিরুত্তাপ কণ্ঠেই বললেন, 'আজ বিকেলে একটু বেরোব। তুমি তৈরি থেকো! আর নীল রঙের শাড়িটা পরবে। তোমায় ওই শাড়িটায় দারুণ মানায়।'

এই শুরু! এরপর ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াল। উনি আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করলেন। আমি আপ্রাণ বাধা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বারবার ছেলেমানুষের মতো বলতে লাগলেন, 'আমায় ফিরিয়ে দিও না অনু। কতদিন তোমায় ভালোবাসিনি! কতদিন তুমি আমায় ভালোবাসো না! প্লিজ, ফিরিয়ে দিও না!'

আমি বুঝতে পেরেছিলাম কোথাও একটা ভুল হচ্ছে! আমি 'অনুদি' নই। কিন্তু ভুলটাই আমার কাছে বড় মনোরম ছিল। চিরকালই আশ্রিতা হয়ে জীবন কাটিয়েছি। রূপ ছিল না, কিন্তু তা বলে কি স্বপ্নগুলো মরে যায়? আমি কুৎসিত বলে কি কোনও চাহিদা থাকবে না, সংসার থাকবে না, আদর সোহাগ করার পুরুষ থাকবে না! আমার জীবনে কি কিছুই পাওয়ার নেই? তাই যখন এমন একটা কাণ্ড হল, স্বার্থপরের মতোই মেনে নিলাম! তোমার বাবা সকালে, বিকেলে, বকার সময়ে, আদর করার সময়ে, বিছানায় সবসময়ই একটা নামই বলে যেতেন; 'অনু...অনু...অনু!' খুব খারাপ লাগত। তবু প্রতিবাদ করিনি।

তখন ডাক্তার দেখানোর কথা ভাবিনি। কিন্তু এরপর যখন তোমার মামা এসে আমাদের যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করে গেলেন তখন সমস্যাটা আরও বাড়ল। জামাইবাবু বারবার অস্থিরভাবে বলতে শুরু করলেন, 'অনু, বাবু কোথায়? বাবু?' আমি অনেকবার বোঝালাম যে তুমি এখানে নেই। তবু বারবার একই কথা বলে গেলেন, 'বাবু, আমার বাবু, আমার বাবু কোথায়? অ্যাঁ?' ক্রমাগতই তিনি হিংস্র হয়ে উঠছিলেন। আমি নানারকম স্তোকবাক্যে ওঁকে সাময়িক ভাবে ভোলাই।

আজও ওঁর ধারণা যে বাবু এখনও ছোট আছে। আজও উনি বাবুকে খোঁজেন। আজও আমাকে অনু বলেই ডাকেন। কারণটা বলাই বাহুল্য ওঁর মনের অসুখ। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, অনুশ্রীদিকে তোমার বাবা এতটাই ভালোবাসতেন যে তাঁর অত বড় অসুখ, আসন্ন বিচ্ছেদের ভয় তিনি মন থেকে মেনে

নিতে পারেননি। তাঁর মস্তিষ্ক ওই ভয়াবহ সত্যিটাকে ভুলতে চেয়েছিল। ডাক্তারবাবু আরও বলেছেন, এই খবরটা ওঁর কাছে চরম যন্ত্রণাদায়ক একটা শক ছিল। ফলস্বরূপ ওই শকেই উনি সমস্ত কিছুই ভুলে গিয়েছিলেন। শুধু মনে ছিল, অনু ওঁর সামনে আছে। অনু সঙ্গে আছে। আমি যদি এই ভুল ভাঙাতে যাই তবে হিতে বিপরীত হতে পারে।

আমি ওঁর ভুল ভাঙাইনি। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট বুঝেছিলাম। জীবনের একটা দিনও উনি 'পুষ্প' বলে কাউকে ভালোবাসেননি। 'পুষ্প' বলে কারোর অস্তিত্ব ওঁর জীবনে ছিলই না! ছিল শুধু অনু! জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উনি 'অনুদি' মানে, তোমার মাকেই ভালোবেসে গেছেন! অনুদির স্মৃতির সঙ্গে যৌবনের দিনগুলোতেই আটকে আছেন। আর কিছুই মনে নেই ওঁর।

ডাক্তার বলেছেন, এই রোগটার নাম অ্যালঝাইমার! এর নাকি কোনও ওষুধ হয় না! পারলে তোমার অসুস্থ বাবাকে ক্ষমা করে দিও। উনি বিশ্বাসঘাতক নন, অসুস্থ মাত্র!'

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এই হল অ্যালঝাইমার! ডঃ সুগত সেনের ভাষায় 'নিষ্ঠুরতম রোগ'।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম পরম যত্নে নিজের বাবাকে খাইয়ে দিচ্ছেন ডঃ সেন! ওঁর তো মনেই নেই যে, যে মিষ্টির বাক্সটা নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে সুকৌশলে নিজেই বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। পরে যখন বাড়ি ফিরে চিঠিটা পড়লেন, ততক্ষণে সব শেষ! সঙ্গে সঙ্গেই আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কপালজোরে বেঁচে যান। কোর্টও ওঁকে কোনও শাস্তি দিতে পারেনি! কারণ বিচারাধীন থাকাকালীনই তিনি ফের আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আর তারপরই একদিন আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেলেন। জেলারকে বারবার অনুরোধ করলেন তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কারণ ওঁর বাবা অ্যালঝাইমার পেশেন্ট। উনি না দেখলে তিনি খাবেনও না, শোবেন না, কিছুই করবেন না!

বলাই বাহুল্য, এরপর তিনি জেল থেকে চলে এলেন আমার মেন্টাল অ্যাসাইলামে! এবং এইমুহূর্তে উনি একটি বড়সড় গোঁফ-দাড়িওয়ালা ম্যানিকুইনকে বাবা ভেবে পরমানন্দে খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন! কী অদ্ভুত প্রশান্তি তাঁর মুখে! সেখানে কোনও ঘৃণার ছাপ নেই। কোনও দুঃখ নেই! আপাতত ডিমেনশিয়ায় আছেন। অর্থাৎ সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো ভুলে গিয়েছেন। অ্যালঝাইমারের ফার্স্ট স্টেজ। এই ভাবেই একসময় আস্তে আস্তে...!

এই হল অ্যালঝাইমার! আশীর্বাদ না অভিশাপ জানি না! কিন্তু ফ্যাসিনেটিং ডিজিজ। নয়?

—

বাঘিনি

১
বিশেষ খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা :

"শহরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বাঘনখের আবির্ভাব হল! দু-মাস আগে বাঘনখের আক্রমণে প্রথম মারা গিয়েছিলেন প্রবীণ গ্রহরত্নবিক্রেতা ও স্বর্ণব্যবসায়ী শ্রীশ ঘোষ! বর্তমানে আবার বাঘনখের শিকার হলেন এক যুবতী। যুবতীর নাম কল্পনা বসু। জানা গিয়েছে, তিনি পেশায় ফটোগ্রাফার ছিলেন। দেড় বছর আগেই এক বিখ্যাত পশু সংরক্ষণশালায় বাঘিনি 'তেজস্বিনী'র আক্রমণে 'সুবীর মুর্মু" নামক কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যুর লাইভ ও সম্পূর্ণ ফুটেজটি তিনিই তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই ফুটেজটি বেসরকারি চ্যানেলকে বিক্রিও করেছিলেন কল্পনা। অথচ তারই মর্মান্তিক মৃত্যু হল বাঘনখের হামলায়! আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, এই হত্যাকাণ্ডেরও একটি লাইভ ফুটেজ তোলা হয়েছে স্বয়ং কল্পনারই মোবাইলে! কোনও অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি মোবাইলটি একটি বিখ্যাত বেসরকারি চ্যানেলকে পাঠিয়েছেন! ফুটেজে অবশ্য শুধু কল্পনাকেই দেখা গিয়েছে, হামলাকারীকে দেখা যায়নি। পুলিশ আপাতত মোবাইলটির প্রেরককে খুঁজছে।

এ সম্পর্কে তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন যে প্রথমে প্রত্যেকটি ছিন্নভিন্ন মৃতদেহকে দেখে হিংস্র পশুর আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে বলেই মনে করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু ফরেনসিক রিপোর্ট সবাইকেই স্তম্ভিত করে দেয়। ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী কোনও হিংস্র পশুর নখে নয়, বরং উপরোক্ত ব্যক্তিদের মৃত্যু হয়েছে মজবুত টাইটানিয়াম অ্যালয়ের তৈরি ধারালো ও তীক্ষ্ণ কোনও অস্ত্রে, যার আকার অবিকল বাঘের নখের মতো। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এও জানান যে টাইটানিয়াম অ্যালয়ের কৃত্রিম বাঘনখ আসল বাঘের নখের থেকেও অনেকগুণ বেশি ধারালো ও মজবুত। কল্পনা-হত্যার ভিডিও ফুটেজ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের মতমতকেই সঠিক প্রমাণ করেছে! ভিডিও ফুটেজে হত্যাকারীকে দেখা না গেলেও বাঘনখটিকে স্পষ্ট দেখা গেছে। তদন্তকারী অফিসার অবশ্য বাঘনখ রহস্যের অন্ধকারে বিশেষ কোনও আলোকপাত করতে পারেননি। তাঁর মতে এগুলো কোনও বিকৃত মস্তিষ্ক সিরিয়াল কিলারের কাজ।"

২

আজ এখানে, এই পশু সংরক্ষণশালার মুক্তাঞ্চলে একটা লড়াই হবে। ভারী মজার লড়াই।

প্রথম যোদ্ধার নাম শুইমুই মুর্মু। শুইমুই নাম শুনলেই বোঝা যায় যে, সে জন্মসূত্রে বাঙালি নয়। প্রণয় ও পরিণয়সূত্রে বাঙালি হয়েছে। নাগাল্যান্ডের কোনও এক গ্রামে তার বাবার জন্ম হয়েছিল।

আর তার জন্ম হয়েছিল এক সার্কাস পার্টির তাঁবুতে। নাগাদের সহজাত ও স্বভাবগত প্রবৃত্তিতে সে বেপরোয়া হিংস্র যোদ্ধা ও প্রতিহিংসাপ্রবণ! বয়েস চল্লিশ। দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। ওজন ১০৭ পাউন্ড। প্রজাতি মানবী। তার আরেকটি পরিচয়, সে দেড় বছর আগে বাঘিনির আক্রমণে মৃত হতভাগ্য কিশোর 'সুবীর মুর্মু'র মা!

শুইমুই-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হল 'তেজস্বিনী'। কোনও এক কালে তার কোনও পূর্বপুরুষ হয়তো সুন্দরবনের অরণ্যে ছিল, তবে তার মা-বাপ, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা; মায় কয়েক পুরুষ এই পশু সংরক্ষণশালায় জন্মেছে। তার জন্মও এখানেই। তবে সহজাত ও স্বভাবগত প্রবৃত্তিতে সে ভয়াবহ হিংস্র। তার সম্বন্ধে দুটি ইংরেজি শব্দ অমোঘভাবেই বলা যায়। 'অটোম্যাটিক কিলিং মেশিন' ও 'ন্যাচারাল প্রিডেটর'। বয়েস, পাঁচ বছর। দৈর্ঘ্য মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত সবমিলিয়ে ৯ ফুট। ওজন সাড়ে তিনশো পাউন্ড। প্রজাতি বিশুদ্ধ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগ্রেস, বাঘিনি। তার আরেকটি পরিচয়, সে শুইমুই-এর একমাত্র সন্তান 'সুবীর মুর্মু'র খুনি!

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিচয় দিয়ে দিয়েছি। এবার যুদ্ধ শুরু হবে। ভারী মজার যুদ্ধ। যে কোনও রিয়েলিটি শো'র টি আর পি-কে চ্যালেঞ্জ করতে পারত এই লড়াই। কিন্তু সে উপায় নেই। এ যুদ্ধ চোখে দেখা যাবে না। তাই সেই যুদ্ধের গল্পই আজ বলব তোমাদের। ধরে নাও, এটা এক অদ্ভুত সংগ্রামের ধারাবিবরণী!

৩

শুইমুই প্রাণীটার গন্ধ পাচ্ছিল। একটু আগেই পশু সংরক্ষণশালার দুই প্রহরীকে চিরঘুমের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে তেজস্বিনীর খাঁচা নিজের হাতে খুলে দিয়েছে সে। ওই দুই অপদার্থ সিকিউরিটি গার্ডের মৃত্যুই ছিল উপযুক্ত শাস্তি! ওরা সুবীরকে বাঁচায়নি। ওদের মরাই উচিত!

সে খাঁচা খুলে দিয়েই মুক্তাঞ্চলে ঢুকে গেছে। অবশ্য তেজস্বিনী তখনও ব্যাপারটা কী হচ্ছে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি। সে তার তিন সন্তানকে নিয়ে খাঁচায় ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু খাঁচা খোলার শব্দ পেয়েই কান খাড়া হয়ে গিয়েছিল তার। এই মুহূর্তে সে তিন তিনটি ব্যাঘ্রশিশুর জননী। তাই সবসময় স্নায়ু টানটান হয়ে থাকে!

তাই আজও অসময়ে গেট খোলার আওয়াজ শুনে সে তখনই মুক্তাঞ্চলে যায়নি। বরং আশপাশটা ভালোভাবে জরিপ করে নিল! ব্যাপারটা ঠিক কী হচ্ছে হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে। ততক্ষণে অবশ্য বাচ্চাদের ঘুম ভেঙে গেছে। মহানন্দে আহ্লাদি গরগর আওয়াজ করে তারা ছুটেছে মুক্তাঞ্চলের দিকে। ঘুরে বেড়াবার বাগানটা তাদের ভারী পছন্দ। একবার বেরোলে আর খাঁচায় ঢুকতেই চায় না! তেজস্বিনী গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। বাচ্চারা মুক্ত উদ্যানের দিকে যাচ্ছে। ওদের একা যেতে দেওয়া উচিত নয়। অগত্যা সে-ও পেছন পেছন গেল।

ততক্ষণে অবশ্য মুক্তাঞ্চলের বিরাট একটা গাছের মগডালে উঠে গিয়েছে শুইমুই। এবার পচা মাংসের বিকট বুনো গন্ধটা পেয়ে বুঝল শত্রু খুব কাছাকাছিই আছে। ছোটবেলা থেকেই সে প্রায়

বাঘের সঙ্গে ঘর করে এসেছে। তার বাবা ছিল সার্কাসের নামজাদা রিংমাস্টার। সারাজীবনে অজস্র বাঘকে চাবকে সোজা করেছিল বাবা। শুইমুই যখন ছোট ছিল তখন থেকেই বাবার ট্রেনিং দেওয়া দেখত। জীবনে প্রচুর বাঘ দেখেছে ও। বাবার মুখে শুনেছে ওদের দুর্বলতার কথা। বাঘের গায়ের গন্ধ, বাঘের আক্রমণ কৌশল, বাঘ কী ভয় পায়, তার দুর্বলতা কোথায়; এ সব কিছুই শৈশব থেকে শুইমুইয়ের নখদর্পণে!

দেহটাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে অদ্ভুত কৌশলে পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল ও। তার মাথাটা নীচের দিকে। এখন শরীরটা পেন্ডুলামের মতো দুলছে। দুলতে দুলতেই সে বাঘটার উপস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে। অন্য কেউ হলে নির্ঘাৎ নীচে পড়ে যেত। কিন্তু সার্কাসে মানুষ হওয়া শুইমুই অল্পবয়েসে সার্কাসে ট্র্যাপিজের খেলা দেখাত। দেহের ব্যালান্স, ক্ষিপ্রতা, রিফ্লেক্সের চরম সীমায় নিজেকে নিয়ে গিয়েছিল সে। তার জন্মদাত্রীও ট্র্যাপিজশিল্পীই ছিলেন। এই বিদ্যা তার জন্মলব্ধ ও কুড়ি বছরের সাধনায় শানিত!

তেজস্বিনী তখন ঠিক সেই গাছটার নীচেই দাঁড়িয়েছিল। তার তিন সন্তান এখন মায়ের লেজ নিয়ে খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তেজস্বিনী আলতো সতর্ক দৃষ্টিতে একবার ওদের দেখে নিল। পরক্ষণেই উৎকর্ণ হয়ে উঠে কী যেন শোনার চেষ্টা করে। একটা অস্ফুট শব্দ তার কানে এল। শব্দটা মাথার ঠিক ওপরে! গাছের মগডালে অদ্ভুত একটা চাঞ্চল্য তার তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে ধরা পড়েছে। তার সঙ্গে একটা অপরিচিত গন্ধ। সে কৌতূহলী হয়ে মুখ তুলে গাছের দিকে তাকাতেই যাচ্ছিল, তার আগেই গাছ থেকে ঝুপ করে কেউ একটা লাফিয়ে পড়ল একদম সামনে!

তেজস্বিনী প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েই পিছনে হটে যায়। অদ্ভুত দৃষ্টিতে জরিপ করছে সামনের প্রাণীটিকে! একটা মানুষ! আস্ত একটা মানুষ! কিন্তু এ কী ভয়ংকর মানুষ! সারা গায়ে তার অজস্র কাঁটা! দু-হাতে ধারালো লম্বা লম্বা নখ! অতবড় নখ তেজস্বিনীর নিজেরও নেই!

তেজস্বিনী কী করে জানবে যে শুধু এই কাঁটাওয়ালা আঁটোসাঁটো জামাটা তৈরি করাতেই মানুষটা তার সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছে! শুইমুইয়ের বাঙালি স্বামী তাদের সার্কাসেই ছুরির খেলা দেখাত। সুবীর যখন শুইমুইয়ের পেটে এল, তখন দুজনে মিলে ঠিক করল, আর সার্কাসে চাকরি করবে না। সুবীরের বাবা চাকু, ছুরি ভালো বুঝত। সে প্রথমে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছুরি, বঁটিতে শান দেওয়ার কাজ করত। তারপর একটু মূলধন জমা করে নিজেই একটা ছোট্ট দোকান দিয়ে বসল। চাকু, ছুরি, বঁটি, দা বানাত সে। ধারও দিত। তার সঙ্গে থেকে থেকে শুইমুইও ধাতু গড়া-পেটা-শান দেওয়ার কাজটা শিখে গিয়েছিল। তাই স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর সে নিজেই দোকান চালাত!

সেই দোকানটাও এক বছর আগে বিক্রি করে দিয়েছে শুইমুই। বেচে দিয়েছে অনেক কষ্টে তৈরি করা নিজস্ব বসতবাড়িটাও। টাইটানিয়ামের দামি বাঘনখ, কাঁটাওয়ালা আঁটোসাঁটো ট্র্যাপিজ স্যুট বানানোর জন্য সে সমস্ত সঞ্চয় মায় জীবনধারণের একমাত্র রাস্তা এমনকি মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে।

তেজস্বিনী অপলকে দেখছিল। সেও চুপ করে দেখছিল তাকে। বাঘের জ্বলজ্বলে চোখের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। একবারও পলক ফেলছে না! রাগে তার চোয়াল শক্ত! এই তো! এই তার ছেলের খুনি! এই শয়তানির চোয়ালে দশ মিনিট ধরে ঝুলেছিল তার একমাত্র সন্তান। এর তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড়ে অসময়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল তার জীবনের ধন সুবীর! দৃশ্যটা মনে পড়তেই চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে তার। আর কিছু হারানোর নেই! কোনও পিছুটান নেই! এই দিনটার প্রতীক্ষাতেই এতদিন ছিল সে। অধীর আগ্রহে দেড় বছর ধরে অপেক্ষা করছিল, কবে বাঘিনিটা যুবতী হবে! কবে সে মা হবে! ওই তো! তিনটে বাচ্চা মায়ের কাছেই খেলা করে বেড়াচ্ছে! এইবার দ্যাখ শয়তানি, সন্তানের মৃত্যু নিজের চোখের সামনে দেখতে কেমন লাগে! এই বাঘনখ দিয়েই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করব তোর বাচ্চাদের গলার নলি! দ্যাখ রক্তপিপাসু রাক্ষসী!

তেজস্বিনী কিছু বোঝার আগেই দপ করে জ্বলে উঠল একটা মশাল। এতক্ষণ মশালটাকে পিঠে বেঁধে রেখেছিল শুইমুই। এবার জ্বালিয়ে দিয়েছে! চোখের সামনে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল তেজস্বিনী। কী করছে মানুষটা! প্রচণ্ড বিপন্নতায় সে কয়েক পা পিছিয়ে গেছে! বিদ্যুৎগতিতে শিশু বাঘগুলোকে আলতো করে কামড়ে ধরে বাঘিনি প্রাণপণ দৌড় লাগাল একটু নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। এইমুহূর্তে তার নিজের প্রাণের ভয় নেই! কিন্তু বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতেই হবে...বাঁচাতেই হবে...!

...ঠিক এমনই একটা দৃশ্য দেড় বছর আগে অভিনীত হয়েছিল এখানে! এক কিশোর পাঁচিলের ওপরে উঠে বাঘিনিকে ভালো করে দেখতে গিয়ে ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে গিয়েছিল ভিতরে! তখন এই বাঘিনিই এসে দাঁড়িয়েছিল তার মুখোমুখি! সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখে বারবার করজোড়ে প্রাণভিক্ষা করে চলেছিল সুবীর। বাঘিনি তখনও স্থিরচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় তখনও সে বুঝতে পারেনি, সামনের ক্রন্দনরত, ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়া প্রাণীটাকে নিয়ে ঠিক কী করা উচিত!

আর বাইরে সেই হতভাগ্যের মা তখন উন্মাদিনীর মতো কাঁদছে! কাঁদতে কাঁদতেই উপস্থিত জনতার হাতে-পায়ে পড়ছে। পাগলের মতো বলছে, 'আমার ছেলেকে বাঁচাও! যে করেই হোক বাঁচাও! ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই! ওর কিছু হলে আমি আর বাঁচব না।'

'আ-বে হট!' এক মোটাসোটা দর্শক লাথি মেরে সরিয়ে দিল তাকে। উত্তেজিত জনতার রাশ তখন ভেঙে পড়েছে খাঁচার বাইরে। মানুষ আর বাঘের ডুয়েল! এমন বীভৎস ও দুর্লভ মজার দৃশ্য কেউ হাতছাড়া করে! মোটা লোকটা ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল সেদিকেই। হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'ওই দ্যাখ! কী করছে বোকাটা! বাঘের সামনে হাতজোড় করছে! বাঘের সামনে হাতজোড় করে কিছু হয়?'

হতভাগী মায়ের চোখে বসে গিয়েছিল সেই দর্শকের চেহারাটা! লোকটা গ্রহরত্ন ও সোনার ব্যবসায়ী ছিল! নাম শ্রীশ ঘোষ! দেড় বছর পরে যখন তার বুকে বাঘনখ বসাতে যাচ্ছিল শুইমুই, তখনও লোকটা অবিকল সুবীরের মতোই বারবার হাতজোড় করে জীবনভিক্ষা করছিল। তার পায়ে

পড়েছিল। শুইমুই মুচকি হেসে বলেছে; 'ধুর বোকা! বাঘিনির সামনে হাতজোড় করছিস! বাঘিনির সামনে হাতজোড় করে কিছু হয়?'

কথাগুলো মনে পড়তেই হাল্কা মাথা ঝাঁকাল সে। নাঃ, সেসব এখন অতীত। বর্তমান এখন অন্তিম প্রতিশোধ! বাঘিনি তেজস্বিনী! যে এখন আগুন দেখে নিজের সন্তানদের বাঁচানোর জন্য পালাচ্ছে! শুইমুই জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়েই দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল সেদিকেই।

পালা, যতদূর পালাবি পালা! তুই আমার ছেলেটাকে তিন মিনিট সময় দিয়েছিলি। তোকে তিন ঘণ্টা সময় দিলাম। পারলে আরেক বাঘিনির হাত থেকে বাঁচা নিজের বাচ্চাকে।

৪

তেজস্বিনী বুঝতে পারছিল না কী করবে! মানুষটার সঙ্গে লড়াই করতেই পারে। কিন্তু শিশুগুলোকে কীভাবে বাঁচাবে! সে জাতে বাঘিনি। কিন্তু সঙ্গে কোলের শিশু থাকলে মানুষ হোক, কী বাঘ, সব মায়েরাই অসহায়। সে আঁতিপাতি করে শুধু এমন একটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান খুঁজছিল যেখানে ওই কালান্তক বাঘনখ পৌঁছবে না! কিন্তু সে জায়গা কোথায়? ওদিকে মশালটা ক্রমাগতই এগিয়ে আসছে! অথচ এখানে লুকোনোর জন্য একটা গুহাও নেই! খাঁচায় ফেরার উপায়ও নেই। মানুষটা পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চাগুলোকে ওখানে রেখে আসতে পারলে মানুষটাকে দেখে নিত সে!

তেজস্বিনী প্রাচীরের চতুর্দিকে ছোটাছুটি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চতুর্দিকে শুধু উঁচু উঁচু পাথরের দেওয়াল। একদিকে একটা লোহার গরাদ। ওই লোহার গরাদের সামনেই রোজ দর্শকের ভিড় জমে। ওদিকে গিয়ে লাভ নেই! সামনে শুধু একটা বড় পাথর। ওই পাথরের পেছনে বাচ্চাদের রেখে এবার সেও ঘুরে দাঁড়ায়।

শুইমুই ততক্ষণে বাঘিনির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতের মশালে লকলকিয়ে উঠছে আগুন। বাঘ আগুনকে ভয় পায়। তেজস্বিনী তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে। পরক্ষণেই হিংস্র দাঁত বের করে গর্জন করে উঠল! শুইমুই জানে, ও যতই বিক্রম দেখাক, ওর পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। সে বাঘিনির চোখে চোখ রাখে! দেওয়ালের দিকে এক পা এক পা করে পিছোচ্ছে সে। অর্থাৎ এবার নির্ঘাৎ লাফিয়ে পড়বে শুইমুইয়ের ঘাড়ে। বাঘের প্রত্যেকটা মুভমেন্ট, প্রতিটি ভঙ্গি ছেলেবেলা থেকেই তার মুখস্থ। ও এবার তরবারির মতো মশালটাকে তার মুখের কাছে খোঁচা মারার ভঙ্গিতে এগিয়ে দিল, 'এই নে!'

তেজস্বিনী ক্রুদ্ধ গর্জন করে লাফিয়ে পিছিয়ে গেছে! সে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মানুষটা তরোয়ালের মতো মশালটাকে তার নাকের সামনে ক্রমাগত নাড়িয়ে চলেছে। সে বিহ্বল! শরীরটাকে কুঁকড়ে তিন পা পিছিয়ে গেছে। প্রচণ্ড আক্রোশে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করেই লাফিয়ে পড়ল মানুষটার ওপর।

শুইমুই প্রস্তুত ছিল। অদ্ভুত ভঙ্গিতে একটা ভল্ট খেয়ে পিছিয়ে গেল। বাবা বলতেন, বাঘকে জব্দ করতে হলে অসম্ভব ক্ষিপ্রতা, রিফ্লেক্স প্রয়োজন। বাঘ ধারালো জিনিসকেও ভয় পায়। তাই সচরাচর

বাইসন, ইন্ডিয়ান বাইসনের ধারে-কাছে ঘেঁষে না। এমনকি নিতান্ত নিরুপায় না হলে শজারুকেও ধরে না! কারণ শজারু যদি একবার সারা গায়ের কাঁটা পেটে ফুটিয়ে দিতে পারে, তবে বাঘেরও নিস্তার নেই। আর বাঘের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা দু-চোখের মাঝখানের অংশ আর পেট! পিঠ বা কাঁধে মজবুত মাসল থাকলেও ওদের পেটটা তুলনামূলক ভাবে অরক্ষিত।

শুইমুই পিছিয়ে গেলেও বাঘের নখ ছুঁয়ে গেছে তার মুখ। কপাল থেকে গাল পর্যন্ত অংশ চিরে ফালাফালা হয়ে গেছে। যন্ত্রণায়, অসম্ভব আক্রোশে সেও তার বাঘনখ চালিয়ে দিয়েছে শূন্যে লাফিয়ে ওঠা বাঘিনির পেট লক্ষ্য করে। একটা প্রচণ্ড গর্জন! পরক্ষণেই ধপাস করে মাটির ওপরে পড়ে গেল তেজস্বিনী। তার পেট কেটে গেলেও খুব মারাত্মক জখম হয়নি। রক্তাক্ত, আহত, মরিয়া বাঘিনি প্রচণ্ড প্রতিশোধস্পৃহায় সেকেন্ডের ভগ্নাংশে দ্বিতীয় লাফটা দিল। যেন ঝলসে উঠল একটা সোনালি ডোরাকাটা বিদ্যুৎ! শুইমুই দ্বিতীয় আক্রমণটা এত তাড়াতাড়ি আসবে বুঝতে পারেনি। এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি তেজস্বিনী। মানুষটার টুঁটি তার হিংস্র শ্বদন্তে চেপে ধরেছে!

বাঘের চোয়ালে আটকে গেছে ঘাড়! একটু চাপ দিলেই মানুষটা শেষ! কিন্তু তেজস্বিনী পারল না! যন্ত্রণায় কাতরে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছে শুইমুই-এর গলা! শুইমুই জানত, বাঘের সহজাত প্রবৃত্তি শিকারের টুঁটি কামড়ে ধরা। সে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। তার গলা, ঘাড় বেষ্টন করে আছে টাইটানিয়ামের কাঁটা শোভিত মজবুত কলার! তার খোঁচায় বাঘিনির জিভ, গাল কেটে গেছে! তেজস্বিনী আবার প্রচণ্ড গর্জন করে ওঠে! মশালের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় তার জিভ রক্তে ভেসে যাচ্ছে! গর্জনের তেজ অনেকটাই কম। বরং এবার সে অসম্ভব ভয় পাচ্ছে! তার চোখে মৃত্যুভয় স্পষ্ট!

'আয়...!' শুইমুই মশাল হাতে আবার এগোল তার দিকে। সে-ও অক্ষত নেই। তেজস্বিনীর নখ আরেকটু হলেই তার চোখটা খুবলে নিত। একটুর জন্য বেঁচে গেছে। দরদর করে রক্তের ধারা নেমে আসছে চোখে। সে ঝাপসা দেখছে। তবু ফের মশালটাকে উঁচিয়ে ধরে হাতের ইশারায় বাঘিনিকে ডাকে, 'আয়...আয়...!'

আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল তেজস্বিনী। আক্রমণ না করে উপায়ও নেই। তার নির্বোধ সন্তানেরা এই পরিস্থিতিতেও মহানন্দে নিজেদের মধ্যে মারপিট করে খেলা করছে। ওরা এখনও আগুনকে ভয় পেতে শেখেনি! বিপদের গন্ধ কী ওরা বোঝে না!...

সুবীরও জানত না মৃত্যু কাকে বলে! মৃত্যুভয় কী! তাই নির্বোধের মতো পাঁচিলের ওপর উঠে বাঘ দেখতে গিয়েছিল। একবারও মনে হয়নি, পড়ে গেলে কী হবে! যখন বুঝতে পারল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে! নাকের সামনে স্বয়ং মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে!

...তখন প্রায় দু-মিনিট অতিক্রম করে গেছে! খাঁচার ভেতরে সুবীর তখনও জীবিত এবং আশ্চর্যভাবে সম্পূর্ণ অক্ষত! বাইরে লোকের পায়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে শুইমুই। সে জানে, এখনও বাঁচার আশা আছে! তার কান্নায় ঝাপসা অথচ অভিজ্ঞ চোখ বলছে, এই বাঘিনিটা কস্মিনকালেও শিকার করেনি! রেডিমেড মাংস খেয়ে অভ্যস্ত তেজস্বিনী জানেই না, ওর সামনে দুনিয়ার সবচেয়ে

সহজ শিকার বসে আছে। বরং সুবীরকে দেখে সে অবাক হয়ে গেছে! আদুরে গরগর আওয়াজ করে তাকে শুঁকছে। থাবা দিয়ে তাকে স্পর্শ করছে, অর্থাৎ খেলতে চাইছে। সুবীর অসহায়ের মতো কাঁদছে, তাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, হাতজোড় করছে! বাঘ যদি তাকে কিছু নাও করে, শুধু ভয়েই হয়তো মরে যাবে সে।

এক যুবতী তখন ভিড় ঠেলেঠুলে এগিয়ে গেছে মোবাইল হাতে নিয়ে। খুব মন দিয়ে ছবি তুলছে! তার পা জড়িয়ে ধরল শুইমুই, 'কাউকে ডাকুন। আমার ছেলেকে বাঁচান! ও মরে যাবে!'

'আঃ! ডোন্ট ডিস্টার্ব!' যুবতী তখন সেলফোনের ক্যামেরায় ভিডিও তুলতেই ব্যস্ত! বিরক্ত হয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

'দিদি, বাঁচান ওকে...!' কান্নায় বুঁজে এসেছিল তার কণ্ঠস্বর। শিকার করুক বা না করুক, ভেতরের প্রাণীটা বাঘ! তার ওপর মূর্খ জনতা চেঁচামেচি করে তাকে ক্রমাগতই তিতিবিরক্ত করে তুলছে! সিকিউরিটি গার্ডরাই বা কোথায়? এতগুলো লোকের মধ্যে একজনও সিকিউরিটিকে ডাকবার কথা ভাবছে না! উলটে দৃশ্যটা দেখার জন্য হুড়োহুড়ি, হইচই করে সর্বনাশ করছে! মোবাইলে ছবি তুলছে...

সেই যুবতীর নামই কল্পনা বসু! ফুটেজটা বিক্রি করে সে প্রচুর টাকা কামিয়েছিল। তার মৃত্যুর ফুটেজও তাই তুলে সংবাদমাধ্যমকে পাঠিয়ে দিয়েছে শুইমুই। শোধবোধ!

এখন শেষ প্রতিশোধটাই বাকি। কিন্তু বিগত একঘণ্টা ধরে কিছুতেই সুবিধে করতে পারছে না সে। তেজস্বিনী তাকে কিছুতেই বাচ্চাদের কাছে যেতে দিচ্ছে না। বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর! দুজনেই ক্ষতবিক্ষত। দুজনেই ক্লান্ত। কিন্তু কেউ কাউকে একতিল জমিও ছাড়ছে না। টাইটানিয়ামের কাঁটায় রক্তাক্ত হয়ে গেছে বাঘিনি। বারবার নানা কৌশলে প্রতিপক্ষের টুঁটি ছিঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না! মুখ রক্তে লাল হয়ে গেছে, তবু হাল ছাড়ছে না! কাঁটার খোঁচাও তাকে নিরস্ত করতে পারে না! অন্যদিকে বাঘের থাবায় শুইমুইয়ের তলপেট, উরু, কোমর জখম হয়েছে। তবু সেও দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাচ্ছে! দুজনেই হাঁফিয়ে গিয়েছে, তবু তেজ কমছে না! একজন সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর, আরেকজন সন্তানকে রক্ষা করতে মরিয়া! দুজনেই চক্কর কাটছে, একে অপরকে মেপে নিচ্ছে, এগোচ্ছে-পিছোচ্ছে। পরক্ষণেই লাফিয়ে পড়ে, জড়াজড়ি করে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই লড়ছে। আক্রোশে পরস্পরকে আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, রক্তাক্ত হচ্ছে, কিন্তু আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে! তেজস্বিনীর চওড়া পিঠের পেছনে তিন সন্তান এখনও সুরক্ষিত!

কতক্ষণ ধরে এই অদ্ভুত যুদ্ধ চলত কে জানে! আচমকা একটা সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল! এতক্ষণের লড়াইয়ে ক্লান্ত তেজস্বিনী লাফ মারতে গিয়ে হঠাৎই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তাকে কোনওমতে কাটিয়েই শুইমুই দেখল তার সামনে লাফাতে লাফাতে চলে এসেছে একটা বাচ্চা! এতক্ষণ ধরে এখানে যে লঙ্কাকাণ্ড চলছে, সে বিষয়ে তার কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই! সে মহানন্দে তিড়িংবিড়িং নাচছে! শুইমুই আর চিন্তা করল না! তিনটেকে না পারে, অন্তত একটাকে নিকেশ করবেই! বিদ্যুৎগতিতে বাজপাখির ক্ষিপ্রতায় ছোঁ মেরে বাচ্চাটার ঘাড় চেপে ধরে। বাঘিনি দৃশ্যটা দেখেই হিংস্র দাঁত বের করে লাফ

মারতে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে লক্ষ্য করে হাতের জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে দিল শুইমুই! তেজস্বিনী ফের পিছিয়ে গিয়েছে। সে নিজেকে সামলে নেওয়ার আগেই লাফ মেরে গাছে উঠে গেল মানুষটা।

বাঘিনি বুঝতে পারে, এবার আর উপায় নেই। পরিস্থিতি ক্রমশই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। মানুষটার হাতে লম্বা লম্বা ধারালো নখে সে নিজে ক্ষতবিক্ষত! ক্রমাগত রক্তক্ষরণে দুর্বলও লাগছে, হাঁফ ধরেছে! কিন্তু ওর বাচ্চাটার কী হবে? ওর কোমল গলায় বা বুকে যদি ওই কাঁটা বসে যায়...!

আর ভাবতে পারে না সে। না! এত সহজে ছাড়বে না! রক্ত জমল তার চোখে! লাফ মেরে বেশ কয়েকবার হাঁচোড়-পাঁচোড় করে গাছে ওঠার চেষ্টা করল! কিন্তু চিতা আর লেপার্ড ছাড়া অন্য কোনও বাঘ গাছে চড়তে জানে না! ব্যর্থ হয়ে ভয়াল হুংকার ছেড়ে এখন পাগলের মতো, গোঁয়ারের মতো গাছটার গুঁড়িতে ছুটে এসে ধাক্কা মারছে সে! প্রচণ্ড গতির সঙ্গে সাড়ে তিনশো পাউন্ড এসে গায়ে আছড়ে পড়ায় গাছটাও থরথর করে কেঁপে ওঠে!

শুইমুই গাছে উঠে গিয়েছিল! কিন্তু আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে পা ফস্কেছে তার! ওই...পড়ল! পড়ল বুঝি! বাঘিনি আবার হুংকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল! নাঃ, বাচ্চার নাগাল পায়নি! শুইমুই আবার ডাল আঁকড়ে ধরে সামলে নিয়েছে। ব্যালান্সের খেলায় তার সঙ্গে পারা মুশকিল! কিন্তু তার পা ছুঁয়ে গেল বাঘের থাবা!

'আঃ! শয়তানি!' যন্ত্রণায় কাতরে উঠল শুইমুই! কী আশ্চর্য বোকা এই বাঘিনি! ও কি জানে না যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগাররা গাছে উঠতে পারে না! এখনও গাছের গায়ে নখ বিঁধিয়ে প্রাণপণ ওঠার চেষ্টা করে চলেছে! বারবার পিছলে পড়ছে, তবু কী প্রচণ্ড জেদে আবার ছুটে এসে লাফ মারছে। গোঁত্তা মারছে! চেষ্টার অন্ত নেই ওর! শুইমুই দাঁতে দাঁত পিষছে। বেশ হয়েছে! এবার বুঝেছিস, সন্তানের মৃত্যু চোখের সামনে দেখতে কেমন লাগে! তবু তোর আরও দুটো বাচ্চা আছে! কিন্তু আমার তো একটাই ছিল! হারামজাদি! রাক্ষসী! আমার চোখের সামনে তার টুঁটি ছিঁড়েছিস তুই! আমার ছেলেটাকে শেষ করে তুই তিনটে বাচ্চা নিয়ে নিশ্চিন্তে খেলে বেড়াবি! হবে না! হতে দেব না! শোধ নেব! নিয়েই ছাড়ব!

সে আর দাঁড়ায় না! ট্র্যাপিজ প্লেয়ারের দক্ষতায় এ গাছে ও গাছে লাফ মারতে মারতে টপকে গেল পাথুরে প্রাচীর! তেজস্বিনী তাড়া করেছিল তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাচীরের ওপরে দাঁড়িয়ে শেষ হাসিটা হাসল শুইমুই! তার শরীরটা ক্লান্ত হয়ে এসেছে, পেশিগুলোও এতক্ষণের যুদ্ধ, প্রচণ্ড উত্তেজনার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে! তবু সে লাফ মারে প্রাচীরের ওপর থেকে। বাইরে বেরিয়ে এল ঠিকই, কিন্তু জখম পা-টা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! মাটিতে ল্যান্ড করার সময় পা মচকে গেল।

'উঃ! মা!'

৫

যুদ্ধ শেষ! বাঘিনি হেরে গিয়েছে। অবশেষে শুইমুই-এর বাঘনখ এঁটে বসতে চলেছে তার একটা বাচ্চার বুকে। বাচ্চাটাকে মেরে সামনের লোহার গরাদ দিয়ে লাশটা তেজস্বিনীর নাকের সামনে ফেলে

দেবে ও! যে আগুনে দেড় বছর ধরে জ্বলছে সে, সেই আগুনে এবার বাঘিনিও জ্বলবে। ওর নাকের সামনেই বাচ্চাটার গলা কাটবে ও।

শুইমুই উঠে দাঁড়াতে যায়। কিন্তু পারল না। গোড়ালিটা বেশ ভালোই মচকেছে! যন্ত্রণায় এই প্রথম চোখে জল এল তার। হাতের মুঠো আলগা হয়ে যায়। বাঘশিশুটা হাত ফস্কে পড়ে গেল মাটিতে। ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়ে ও বসে পড়েছে!

একটা চুকচুক শব্দ! মচকে যাওয়া পাটায় একটা ভিজে ভিজে ভাব! সে বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখে, ফুলে যাওয়া জখম গোড়ালি পরম মমতায় চেটে দিচ্ছে ব্যাঘ্রশিশু! না, রক্তের স্বাদ নিচ্ছে না! বাচ্চাটা ওর মায়ের কাছ থেকে শিখেছে যে কেউ ব্যথা পেলে সেই আহত জায়গাটা চেটে দিতে হয়। তাই সযত্নে আহত গোড়ালিটা চেটে দিতে দিতে মার্বেলের মতো নিষ্পাপ চোখ দুটো তুলে তাকায় বাচ্চাটা। যেন জানতে চাইছে, 'ব্যথা কমেছে?'

শুইমুই স্তম্ভিত, বিস্ময়াহত হয়ে বসেছিল! কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। কোথায় গেল তার সেই আক্রোশ! কোথায় সেই প্রতিশোধস্পৃহা! কোথায় জ্বালা! বাচ্চাটা কি এতদিনের সেই অনির্বাণ জ্বালার ওপরও মমতা ঢেলে দিয়েছে!

কানের কাছে একটা 'গোঁ গোঁ' শব্দ! তার সঙ্গেই অদ্ভুত একটা জোরালো ধাতব আওয়াজ। ভেতর থেকে বাঘের গর্জন ভেসে আসে। না, ঠিক গর্জন নয়! বাঘের এমন করুণ ডাক সহজে শোনা যায় না! এ বুকফাটা হাহাকার! কান্না! তেজস্বিনী কাঁদছে! বাঘিনি নয়, মানুষও নয়; এক মা নিজের শিশুকে হারিয়ে বুকফাটা কান্না কাঁদছে! আর এই জোরালো ধাতব আওয়াজটাও তার চেনা। বাঘিনি ছুটে এসে মাথা ঠুকছে লোহার গেটে। এখনও চালিয়ে যাচ্ছে শেষ চেষ্টা। ও কি জানে না, এই লোহার মোটা মোটা গরাদে মাথা ঠুকলে ওর মাথা ফাটতে পারে, কিন্তু এ ফাটক ভেঙে বেরোনো যাবে না! নিশ্চয়ই জানে। তবু অন্তিম নিঃশ্বাস অবধি সে এই গরাদে মাথা ঠুকে যাবে। কিছুতেই ওকে বোঝানো যাবে না যে চেষ্টা করে লাভ নেই...! একটা বাঘ হয়তো বুঝবে! কিন্তু মায়ের প্রাণ বুঝবে না।

...তখন তিন মিনিট কেটে গেছে। খাঁচার বাইরে প্রবল হল্লা। ভিতরে তখনও সম্পূর্ণ অক্ষত সুবীর। বাঘিনি তার সঙ্গে খেলা করতে ব্যস্ত। খেলা করতে করতেই মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বাইরে তখন মূর্খ জনতা, 'এই হুশ...হুশ...' করে বাঘ তাড়াতে চাইছে। কেউ কেউ তুলে নিয়েছে পাথরের টুকরো। বাঘিনিকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিচ্ছে! যেন ও আস্ত বাঘ নয়, স্রেফ ডোরাকাটা বড়সড় একটা বেড়াল। পাথর গায়ে পড়লেই পালিয়ে যাবে! একটা-দুটো ছোট ছোট ঢিল গায়ে লাগার ফলে বাঘিনিটা এবার রাগে ফুঁসছে!

সুবীরের হতভাগিনী মা তখন ঠিক এমন করেই লোহার গরাদে পাগলের মতো মাথা ঠুকছিল! উন্মাদিনীর মতো মাথা ঠুকতে ঠুকতে চেঁচাচ্ছে, 'ওগো, তোমরা চুপ করো! ইট ছুড়ে ওকে ক্ষেপিয়ে দিও না! ক্ষেপে গেলে ও প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে! তোমাদের নাগাল পাবে না! কিন্তু হাতের কাছে যাকে পাবে, তাকে শেষ করে দেবে! আর ওর হাতের কাছে এখন আমার ছেলেটা একা...!'

কেউ তার কথায় পাত্তা দেয়নি। ভ্রূক্ষেপও করেনি। শুইমুইয়ের চোখের সামনেই একটা অব্যর্থ পাথরের টুকরো প্রচণ্ড বেগে লাগল বাঘিনির কপালের ঠিক মাঝখানে! 'গাঁক' করে একটা গর্জন করে উঠে পেশি কুঁচকে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে একটু পিছিয়ে গেল প্রাণীটা! বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল শুইমুই, তার আশঙ্কাকে সত্যি করেই এবার প্রচণ্ড হিংস্রতায় সুবীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। বিদ্যুৎগতিতে তার গলা তীক্ষ্ণ দাঁতে কামড়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল অন্যদিকে...!

প্রচণ্ড ধাতব শব্দে সংবিত ফিরল শুইমুইয়ের। আওয়াজটা ক্রমাগতই বাড়ছে! অর্থাৎ জোরে, আরও জোরে, প্রচণ্ড জোরে লোহার গরাদে মাথা ঠুকছে তেজস্বিনী। ও কি নিজের প্রাণটাও দিয়ে দেবে! ওর গোঙানির আওয়াজ এখন আরও স্পষ্ট। এদিকে শিশু বাঘটার কোনও ভয় নেই। সে দিব্যি তিড়িংবিড়িং করে লম্ফঝম্প করে নাচতে শুরু করল। আস্তে আস্তে হাতের বাঘনখটা খুলে ফেলে শুইমুই! দু-হাতে তুলে নিল তার চিরশত্রুর সন্তানটিকে। বাচ্চা বাঘটা তার ছোট্ট ছোট্ট দুটো থাবা রাখল তার দু-গালে! ভীষণ নিশ্চিন্ততায়, আরামে তার কপালে কপাল ঠেকিয়ে জব্বর হাই তুলল। বেচারির ঘুম পেয়েছে!

দেড় বছর ধরে যে কান্না বুকের ভেতরে জমে ছিল, এবার সহ্যের শেষ সীমাটুকুও অতিক্রম করে বেরিয়ে এল বাইরে। ভিতরে এক বাঘিনি বুকফাটা কান্না কাঁদছে। সেই আওয়াজেই শুইমুইয়ের প্রাণ মুচড়ে উঠেছিল। এবার ব্যাঘ্রশিশুকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে সেও 'হা হা' করে বোবাকান্নায় ফেটে পড়ল!

একজন বাঘিনি, অন্যজন মানুষ! কান্নার আওয়াজ কিন্তু দুজনেরই প্রায় একরকম।

সেদিন সকালে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে পশু সংরক্ষণশালার কর্মীরা চমকে গেল! এক মহিলা গরাদের বাইরে টানটান হয়ে পড়ে আছে। মেয়েটি নিজের বুকেই টাইটানিয়ামের বাঘনখ বসিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তার মৃতদেহের পাশে, গরাদের উল্টোদিকে স্থির হয়ে বসে আছে বাঘিনি 'তেজস্বিনী'। দুজনেই সমান ক্ষতবিক্ষত। তেজস্বিনীর চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ছে! তার কোলের কাছে শুয়ে আরাম করে দুধ খাচ্ছে তিন সন্তান! হ্যাঁ, তিন সন্তানই। শুইমুই তার প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছে। তেজস্বিনী বুঝেছে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা কাকে বলে! মায়ের প্রাণের জ্বালা সেও অনুভব করেছে। এক প্রতিশোধকামী নারী তার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল তার সন্তানকে। আর এক মা ফিরিয়ে দিয়ে গেল তাকে...!

একটু পরেই এই অভিনব দৃশ্য দেখার জন্য ভিড় জমে গেল। একের পর এক মিডিয়ার লোক মাইক হাতে নিয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করে বক্তৃতা করছে। 'বাঘনখ' কিলারের পরিচয় ততক্ষণে জানা গেছে। সুতরাং তা নিয়ে সম্ভব-অসম্ভব অনেকরকম গল্প বানিয়ে চলেছে তারা! অনেক সম্ভাবনার কথা উঠে আসছে তাদের কথায়। এক অদ্ভুত নারীর অবিশ্বাস্য প্রতিশোধের গল্প এখন মিডিয়ার কাছে 'হটকেক'।

শুধু একটা প্রশ্ন করা উচিত ছিল। কিন্তু কেউ করল না! খুব স্বাভাবিক এবং মানবিক একটা প্রশ্ন উঠে আসার সম্ভাবনা ছিল; তবু উঠল না!

বাঘিনির চোখ বেয়ে জল পড়ছিল কেন? ও কি কাঁদছিল? কেন?...

—

বিশ্বস্ত সঙ্গী

১

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

তখন সাদা বকের দীঘল ডানার ছন্দে ছন্দে সন্ধ্যা নামছে। সাদা রঙের ডানাগুলো সূর্যাস্তের শেষ রক্তিম আলোটুকু মেখে ছড়িয়ে দিচ্ছে গুঁড়ো গুঁড়ো সিঁদুরে অভ্র। অন্ধকার এখনও গাঢ় হয়ে ওঠেনি। আধা অস্বচ্ছ পর্দার মতো নির্লিপ্ততায় ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। ঝিলের জল থেকে উঠে আসছে বাষ্পীয় ধোঁয়াশা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় কোনও ছায়ামূর্তি বুঝি চুপিচুপি উঠে আসছে জলের বুক থেকে।

এইমুহূর্তে কান পেতে শুনলে দুটি শব্দই শোনা যাবে। শিশিরের অস্ফুট টুপটাপ। আর একটা অত্যন্ত চাপা শিশুকণ্ঠের কান্না! শিশিরের শব্দ যতটা সন্ত্রস্ত, কান্নার শব্দটাও ততটাই সাবধানী। যেন বুকের ওপর এক চরম ভার নিয়ে কাঁদতে চাইছে কেউ। কিন্তু কান্নাটা সেই প্রচণ্ড ভারের তলায় চাপা পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে এক অনাবিল অসহায়তায়।

'জ্যানেট, প্লিজ ডোন্ট ক্রাই বেবি।'

মেয়েটা বড্ড কষ্ট পেয়েছে। কান্নার দমকে তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। দু-হাতে জড়িয়ে ধরে আছে একটি নিথর দেহকে। একটু পরেই কবরস্থ করা হবে মৃতদেহটিকে। তা সত্ত্বেও বুকে আঁকড়ে ধরে আছে। এমনভাবে ফুলে ফুলে কাঁদছে, যেন বুকের শিরা ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারই দেহের অংশকে। কিছুতেই বুঝি যেতে দেবে না তার একমাত্র বন্ধুকে! একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গীকে।

মেয়েটির ঠাকুমার মুখের বলিরেখায় স্পষ্ট সন্ধ্যার আলোর গাঢ় তামাটে আঁকি-বুঁকি। মুখখানা কিছুটা ব্রোঞ্জ মূর্তির মতো। মাথার কাঁচাপাকা চুলগুলো বিস্রস্ত। তিনি নাতনিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'জ্যানেট। কেঁদো না। ও খুব কষ্ট পাচ্ছিল। গড ওর কষ্ট দূর করেছেন। ওকে ছেড়ে দাও।'

জ্যানেট নামের শিশুকন্যা অতিকষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ঠাকুমার দিকে। শিশুর সরল দৃষ্টি সন্ধ্যার নরম আলোয় আরও মায়াবী দেখাচ্ছিল। চোখদুটোয় একরাশ অশ্রু নিয়ে ভীষণ সরলতায় বলল, 'তবে আমার সঙ্গে কে খেলা করবে গ্র্যানি?'

ঠাকুমা, অর্থাৎ গ্র্যানি স্মিত হাসলেন, 'কেন? আমি খেলব তোমার সঙ্গে।'

জ্যানেট বিষণ্ণ মুখে চোখ মুছল। গ্র্যানি কী করে খেলবে ওর সঙ্গে! গ্র্যানির তো পায়ে, কোমরে ব্যথা! সংসারের কাজেই সবসময় ব্যস্ত। তার খেলা করার সময় কই? একমাত্র ও-ই তো ছিল যে সবসময়ই ওর সঙ্গে খেলা করত। এক শিশুর অন্যতম বিশ্বস্ত সঙ্গী!

গ্র্যানি মৃদুকণ্ঠে আবার বললেন; 'জ্যানেট, প্লিজ।'

অবুঝ শিশু মৃতদেহটিকে আরও সজোরে আঁকড়ে ধরে। যারা দেহটিকে কবরস্থ করবে তারাও অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আর কাঁহাতক অপেক্ষা করা যায়! ক্রমাগতই অন্ধকার নেমে আসছে। আর

কিছুক্ষণ পরে নিজের হাত-পাও ঠিকমতো দেখা যাবে না। অথচ মেয়েটি কিছুতেই মরদেহটিকে ছাড়তে চাইছে না। আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চার মতো হলে ধমকধামক দিয়ে হয়তো জোর করে ছাড়ানোও যেত। কিন্তু একেই বাপ-মা মরা শিশু, তার ওপর জন্ম থেকেই পঙ্গু। তার দুনিয়া শুধু হুইলচেয়ারেই সীমাবদ্ধ। হয়তো সেজন্যই একটু বেশি জেদি। লাশটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগতই কেঁদে চলেছে।

বেগতিক বুঝে গ্র্যানিই এবার এগিয়ে এলেন। মেয়েটার মন বড় নরম। ভীষণ মায়াবী মনের শিশু জ্যানেট। মৃত্যুর কঠিন বাস্তবতাকে ঠিকমতো বোঝার বয়েস এখনও ওর হয়নি। তিনি আলতো করে জ্যানেটের কাঁধে হাত রেখে বললেন, ‘বেবি, ডোন্ট ক্রাই। ও তোমার আশেপাশেই আছে। কোথাও যায়নি। কখনও যাবে ও না।’

জ্যানেট ভেজা চোখের পাতা তুলে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়, ‘ও যায়নি?’

‘না!’ গ্র্যানি তার রেশমের মতো চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, ‘ওর শুধু জায়গা বদল হয়েছে। এখন তো ও আমাদের বাড়ির পেছনে, এই বাগানেই শুয়ে থাকবে। আগে তো ছুটে ছুটে এদিকে-ওদিকে চলে যেত। দুষ্টুমি করত। তোমাকে ফেলে দিয়ে নেবারদের সঙ্গে খেলা করত। তুমি ওকে ধরতে পারতে না, কাঁদতে! খুঁজে খুঁজে বেড়াতে। এখন ও পুরোপুরি তোমার ওবিডিয়েন্ট হয়ে এখানেই শুয়ে থাকবে। তোমায় ফেলে ও কোথাও যেতেই পারবে না। তাই না?’

জ্যানেট ফোলা ফোলা রক্তাভ চোখদুটো মুছে নিয়ে বলল, ‘ও আর কখনও আমাকে ফেলে এমিলিদের সঙ্গে খেলা করবে না? কখনও আমাকে একা ফেলে রেখে যাবে না?’

গ্র্যানির মুখের হাসিটা যেন সন্ধ্যার আতুর রশ্মির চেয়েও বেশি রহস্যময় ঠেকল, ‘না। কোথাও যাবে না। যেতেই পারবে না। এখন শুধু ও এখানেই শুয়ে থাকবে। তুমি যা বলবে সব চুপ করে শুনবে। আর কারোর কথা শুনবে না।’

জ্যানেট কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃতদেহটিকে ছেড়ে দিল। গর্ত আগেই খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। সকলে মিলে ধরাধরি করে শবটিকে কবরস্থ করে দিল। যখন সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হল, তখন গ্র্যানি একটা সাদা গোলাপের তোড়া রেখে এল সমাধির বুকে। অন্ধকার গুঁড়ি মেরে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরছিল কবরটিকে। জ্যানেট দেখল গ্র্যানি একটা ধবধবে সাদা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই মোমবাতির ভীরু শিখার স্তিমিত আলো এসে পড়ছিল শিশুকন্যার মুখের একদিকে। আরেকটা দিক অন্ধকার। যেন ওপাশের মুখ আঁধার দিয়েই গড়া। সেখানে কোনওদিন কোনও আলো এসে পড়েনি।

মাঝেমধ্যেই একটা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ বাগানে শুধু একটা-দুটো গাছের পাতা ঝরানোর টুপটাপ শব্দ। আর নারকেল পাতার শিরশিরানি। সবুজ নারকেল পাতাগুলো জ্যোৎস্নায় নীলাভ! সেই নীলচে পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে গোল রুপোর থালার মতো চাঁদ। আশেপাশের ছোট ছোট ফুলের গাছ, ঝোপ থেকে একটা মনকেমন করা গন্ধ ভেসে আসছে। টুপটুপ করে জোনাকিরা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রের মতো জ্বলে উঠছে অদ্ভুত ইশারায়।

জ্যানেট বিষণ্ণ চোখে একবার গ্র্যানির দিকে তাকাল। আরেকবার কবরের দিকে। ওখানেই শুয়ে আছে তার চিরসাথি। বিশ্বস্ত সঙ্গী। যে আগে কখনও কখনও ভুলবশত বিশ্বাসভঙ্গ করেছিল। কিন্তু আজ আর ভুল করেও তার সে উপায় নেই। আজ সে আর কোনও এমিলি বা প্যাট্রিকের কাছে যেতে পারবে না।

এখন সে শুধুমাত্র জ্যানেটের। আর তার ওপরে অন্য কারোর দাবি নেই! এখন সে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ও অনুগত!

২

২১শে জুলাই, ২০১৯

'আমি বুঝতে পারছি না আর্থার, তুমি ওই জ্যানেটের মধ্যে কী দেখেছ!'

একটু অসহিষ্ণুভাবেই কথাটা বলল ক্যারোলিন। সে অত্যন্ত সুন্দরী ও সুতনুকা। কালো জর্জেটের শাড়িতে আরও বেশি আকর্ষণীয়া আর আবেদনময়ী লাগছে তাকে। কিন্তু মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তার মেজাজ মোটেও ভালো নেই। নাকের পাটা রক্তাভ। নীলাভ চোখদুটি উত্তেজনায় ঈষৎ বিস্ফারিত। স্ফুরিত অধরে সে জানায়, 'কী আছে ওর যে তুমি আমায় ছেড়ে ওকে বিয়ে করতে চাইছ? একটা থলথলে মোটা শরীর, গোলগোল চোখ! নিজের পায়ে হাঁটার ক্ষমতাটুকুও নেই! সর্বক্ষণ হুইলচেয়ারে ঘুরে বেড়ায়! এমনকী তোমার চেয়ে বয়েসেও বড়। ওই আধবুড়ি কুচ্ছিত, পঙ্গুটা তোমায় কোনওরকম সুখ দিতে পারবে না! ওর জন্য তুমি আমায় ডাম্প করছ! ড্যা-ম ই-ট!'

শেষ শব্দটা উচ্চারণ করেই সে হাতের টিস্যু পেপারটা এমন ভাবে ছুড়ে দিল, যেন অবিকল সেভাবেই আর্থার তাকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলেছে! তার রাগের বহর দেখে আর্থার মিটিমিটি হাসছে। রেস্টোরেন্টের বাকি লোকেরা সামান্য কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের একবার দেখে নিয়ে পরক্ষণেই নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় ডুবে গেছে। সচরাচর নামী ও অভিজাত রেস্তোরাঁয় দৃশ্যটা এমনই হয়। এখানে কেউ কারোর ব্যাপারে কৌতূহল দেখায় না। প্রত্যেকেই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

আর্থার অত্যন্ত সুদর্শন যুবক। তার ব্যাকব্রাশ করা চুল, টিকোলো নাক, ধারালো চোয়াল, সুগভীর দুটি হাসি মাখা চোখ ও টানটান পুরুষালি দেহ; সব মিলিয়ে আভিজাত্যের প্রতীক। পরনের গাঢ় নীল রঙের স্যুটটা সামান্য ভাঁজও খায়নি। হাবেভাবেই বোঝা যায় যে অত্যন্ত গোছালো স্বভাবের ঠান্ডা মাথার মানুষ। সে টেবিলে রাখা টিস্যু পেপারের প্যাকেট থেকে একটি টিস্যু পেপার তুলে নিয়ে এগিয়ে দেয়। নম্র অথচ গম্ভীর স্বরে বলে, 'হয়েছে? না আরও সিনক্রিয়েট করতে চাও?'

ক্যারোলিন এবার প্রায় কেঁদেই ফেলে, 'কী পেয়েছ তুমি ওই বুড়িটার কাছে যে আমায় ছাড়তে চাইছ? যখন ডিনারে ডাকলে তখন ভেবেছিলাম এবার অফিশিয়ালি প্রপোজ করবে। অথচ তুমি কিনা বলছ; তুমি ওই জ্যানেটকে বিয়ে করছ! এর মানে কী?'

'বিয়ে করছি না। অলরেডি বিয়ে করেছি।' সে স্মিত হাসল, 'আমাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গিয়েছে। শুধু চার্চে গিয়ে আনুষ্ঠানিক বিয়েটাই বাকি আছে। তবে আইনত, আমি এখন জ্যানেটের

স্বামী।'

ক্যারোলিন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর্থারের দিকে। যেন কথাটা বিশ্বাস করতেই পারছে না। এ কি সেই আর্থার যার সঙ্গে এতদিন ধরে ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তগুলোও কাটিয়েছে অবলীলায়! যাকে বিশ্বাস করে দেহ-মন সর্বস্ব দিয়েছে; সেই পুরুষই কি এই মুহূর্তে তার সামনে বসে আছে? নাকি এ অন্য কেউ!

তার চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রুবিন্দু চুঁইয়ে পড়ছে, 'আর্থার! তুমি বোধহয় ঠান্ডা মাথায় মানুষ খুনও করতে পারো!'

আর্থার ফের শান্ত হাসি হাসল। আস্তে আস্তে বলল, 'সরি ক্যারোলিন। জ্যানেটকে তুমি অনেকক্ষণ ধরেই উল্টোপাল্টা বলছ। মানুষের বাহ্যিক রূপটাই সব নয়। মানছি, জ্যানেট ছোটবেলা থেকেই হাঁটতে-চলতে পারে না। ওর পায়ের হাড় সম্পূর্ণভাবে গড়ে না ওঠার কারণেই এই অবস্থা। কিন্তু এটা তো ওর দোষ নয়।'

'কিন্তু ও তোমার থেকে আট বছরের বড়!' ক্যারোলিন ফের উত্তেজিত, 'যখন ওর জন্ম হয়েছিল তখন তোমার মা-বাবার বিয়েও হয়নি!'

'সো হোয়াট!' সে কাঁটা-চামচ দিয়ে রোস্টেড ল্যাম্বের মাংস কাটতে ব্যস্ত, 'এটাও ওর দোষ নয়। আমার থেকে আট বছরের বড় বলে সে আমার যোগ্য নয়! সাউন্ডস ইললজিক্যাল।'

'তাহলে তোমার কাছে লজিকটা কী?' ক্যারোলিনের নাকের পাটা ফুলে ওঠে, 'কেন ওই কুচ্ছিত মেয়েটাকে বিয়ে করলে? আর আমাকে জানানোর প্রয়োজনও বোধ করোনি! তোমার কাছে আমার কোনও মূল্য নেই!'

কথাটা কানে যেতেই চিবোনো বন্ধ করল আর্থার। টিস্যু পেপারে মুখ মুছে বলল, 'মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গোয়েজ ক্যারল। যাকে তুমি বারবার কুচ্ছিত, কদাকার, বুড়ি, এইসব উল্টোপাল্টা বলে যাচ্ছ সে আমার স্ত্রী। সে একজন নামকরা বিজনেস-ওম্যানও বটে। কলকাতার ফুড বিজনেসের আনক্রাউন্ড কুইন। তোমার-আমার মতো একশোটা মানুষকে কলার পরিয়ে পুষতে পারে ও। আমরা ওর সামনে জাস্ট ভিখিরি!'

সযত্নে চোখের জল মুছতে মুছতে ক্যারোলিন বলল, 'ও! তাহলে লজিকটা এই! তুমি সোনার কলার পরতে চাও!'

আর্থার তার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। এর একটা মারাত্মক কঠিন উত্তর দেওয়া যেত। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে নাকে নাক বাজিয়ে ঝগড়া করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। আপাদমস্তক ভদ্রতায় মোড়া মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভবও নয়। সে আলতো করে ওয়াইনের গ্লাসটা এগিয়ে দিল ক্যারোলিনের দিকে। ক্যারোলিন তখন কোনওক্রমে কান্না চাপার চেষ্টা করছে।

মাঝে মাঝে আর্থারের মনে হয় মেয়েরা ভারী অদ্ভুত জীব! কখন কী করে বসবে তার ঠিক নেই। আজকাল এমনও ধারণা হচ্ছে যে নারীরা বোধহয় পুরুষদের চেয়েও কুকুরদের বেশি ভালোবাসে। ঠিক এই মুহূর্তেই ক্যারোলিন তাকে ঘুরিয়ে কুকুর বলে দিল! অন্যদিকে জ্যানেটের কুকুর 'ফেইথ'-

এর গল্প শুনতে শুনতে তার পাগল হওয়ার উপক্রম! জ্যানেট বোধহয় তাকেও এত ভালোবাসে না যতটা ফেইথকে ভালোবাসে। যতক্ষণ তারা দুজনে একসঙ্গে থাকে ততক্ষণ শুধু ফেইথেরই গল্প চলতে থাকে। যদিও আর্থার তাকে এখনও স্বচক্ষে দেখেনি। কিন্তু জ্যানেটের কাছেই শুনেছে যে ফেইথ জাতে ল্যাব্রাডর। সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী। জ্যানেট হাঁটতে-চলতে পারে না বলে ফেইথ নাকি সবসময়ই তাকে চোখে চোখে রাখে। সকালবেলায় খবরের কাগজ মুখে করে নিয়ে ছুটে আসে। টুকিটাকি কাজও করে দেয়। কখনও চশমার বাক্স নিয়ে আসে, কখনও বা জলের বোতল, চিরুনি। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য তার একাগ্র ভালোবাসা! দিন নেই, রাত নেই; সে শুধু জ্যানেটের দিকেই সতর্ক নজর রাখছে। অবসর সময়ে খেলা করে। কিন্তু এমন কিছু করে না যাতে চলৎশক্তিহীন মানুষটার কোনও কষ্ট হয়।

'এরপর তো ফেইথের ছুটি হয়ে যাবে।' আর্থার হেসে জ্যানেটের হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, 'কারণ এরপর তো শুধু আমিই তোমার খেয়াল রাখব। তাই না?'

জ্যানেট স্মিত হেসেছে, 'তুমি ফেইথের মতো পারবে না। ও একদম আলাদা। আমি কিছু বলার আগেই সব বুঝে যায়। তোমার ভালোবাসায় সামান্য খাদ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ফেইথের ভালোবাসা একদম নিখাদ।' বলতে বলতেই তার চোখে কৌতুক নেচে ওঠে, 'তুমি আমায় ছেড়ে যেতেই পারো; কিন্তু ফেইথ যাবে না।'

বোঝো! কথা নেই বার্তা নেই, শেষে কিনা কুকুরের সঙ্গে তুলনা টেনে দিল! আর্থারের এরকম উদ্ভট কথা শুনে রাগ করাই উচিত ছিল। মনে মনে গরগরও করেছিল। কিন্তু মুখে প্রকাশ করেনি। বরং একটু দেঁতো হাসি হেসে বলেছে, 'কিন্তু আমি ফেইথের ভালোবাসায় ভাগ বসালে ওর হিংসে হবে না তো?'

'একদম না।' জ্যানেট ওর আঙুল নিয়ে খেলছে, 'বরং ও তোমাকে আমায় ভালোবাসতে সাহায্য করবে। আমি যাকে ভালোবাসি, তাকে ফেইথও খুব ভালোবাসে।'

'তা তোমার এই বিশ্বস্ত সঙ্গীটির দেখা পাচ্ছি কবে?' সে হাসতে হাসতেই বলে, 'তার গল্প শুনতে শুনতেই যে উইকেন্ডগুলো কেটে যাচ্ছে। এবার তো এই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দেখা করতেই হয়!'

'উঁহু!' জ্যানেট মাথা নাড়ল, 'অপোনেন্ট নয়; শি ইজ ইওর সিস্টার ইন ল।'

আর্থার এসব শুনে মনে মনে হেসেছিল। মেয়েদের যে কত রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা থাকে! একটি কুকুর কি না তার শ্যালিকা! এরকম উদ্ভট কথা জীবনে কেউ শুনেছে? অন্য কেউ একথা বললে হয়তো সজোরে হেসে উঠত আর্থার। কিন্তু যেহেতু কথাটা জ্যানেটের মুখ থেকে বেরিয়েছে, সেহেতু হেসে ওঠার সাহস পায়নি।

এমন নয় যে আর্থার জ্যানেটকে ভয় পায়! কিন্তু জ্যানেটের মধ্যে এমন কিছু একটা রয়েছে যাকে ঠিক অবহেলা করা যায় না। শুধু ব্যক্তিত্ব নয়, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত ঠান্ডা দৃঢ়তা আছে যাকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। হাস্যকর কথাটাও এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলে যে সেটাকেও সত্যি বলেই মনে হয়। তাই ফেইথের ব্যাপারটা একরকম মেনেই নিয়েছে সে।

'তা এই শ্যালিকার সঙ্গে দেখা কবে হচ্ছে?' সে মৃদু হেসে জানতে চায়।

'তুমি আমার ফ্যামিলি মেম্বার হলেই ওকে দেখতে পাবে।' মুচকি হাসল জ্যানেট, 'আফটার অল, শি ইজ মাই ফ্যামিলি। ওর সঙ্গে দেখা তো করতেই হবে তোমাকে।'

এরপর আর কথা বাড়ায়নি আর্থার। কারণ জ্যানেট সেটা আদৌ পছন্দ করবে না। এমনিতেই মেয়েটা ভারী অদ্ভুত। কোন কথায় কীভাবে রি-অ্যাক্ট করবে তা বোঝাই দায়। নিজের বিষয়ে সে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। একেই ছোটবেলাতেই একটি অ্যাক্সিডেন্টের দরুন মা-বাবার স্নেহচ্ছায়া হারিয়েছে। মূলত ঠাকুমা, তথা 'গ্র্যানি'র কাছেই মানুষ। তার ওপর শারীরিক দিক দিয়েও ভগবান মেরে রেখেছেন। চলাফেরার ক্ষমতা না থাকার ফলে এবং খানিকটা ভোজনপ্রিয়তার দরুন অত্যন্ত পৃথুলাও বটে। সে বিষয়ে সে নিজেও যথেষ্টই সচেতন। নিজের রূপ নিয়ে ভীষণ হীনম্মন্যতায় ভোগে। একমাত্র আপনজন গ্র্যানিও কয়েকবছর আগে দেহ রেখেছেন। তবে পৈতৃক সম্পত্তির একচ্ছত্র উত্তরাধিকারসূত্রে তার যত্ন নেওয়ার লোকের অভাব নেই। আর আছে 'ফেইথ'। তার ক্ষুধিত হৃদয় সমস্ত স্নেহ, ভালোবাসা, মায়া, মমতা উজাড় করে দিয়েছে এই প্রাণীটিকেই। এখন 'ফেইথ'ই জ্যানেটের গোটা দুনিয়া। তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ওর পৃথিবী।

প্রায় ছ'মাস হল আর্থার আর জ্যানেটের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একটি পার্টিতে প্রথম দেখা ও প্রেম। কিন্তু জ্যানেট যেন এখনও কিছুতেই নিজের হৃদয় আর্থারের সামনে মেলে ধরতে চায় না। সে অনেকবার অনুনয় করেছে, 'প্লিজ জ্যানেট, ওপেন ইওর হার্ট টু মি! মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমি বোধহয় এখনও তোমার কাছে স্ট্রেঞ্জার!'

জ্যানেট তার স্বয়ংক্রিয় হুইলচেয়ারে এগিয়ে যেতে যেতে বলেছে, 'স্ট্রেঞ্জার নও, কিন্তু ফ্যামিলি মেম্বারও নও।'

আর্থার জ্যানেটের মেদবহুল চেহারা, ড্যাবড্যাবে চোখের দিকে সস্নেহে তাকিয়েছিল। বুঝেছিল, এই নারী আদৌ সহজলভ্যা নয়। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তাকে এক অদ্ভুত স্বতন্ত্র সত্তা দিয়েছে। যা অনেকটা হিমশৈলের মতো! কিছুটা দেখা যায়, কিছুটা যায় না! শীতল অথচ কঠিন। তাকে জয় করা অত সহজ নয়। দুর্বার গতিতে তার দিকে ধেয়ে গেলে শুধু আহতই হতে হবে।

তাই জ্যানেটকে প্রয়োজনীয় সময় দিয়েছিল সে। এই ছ'মাসে একবারও জ্যানেট তাকে নিজের বাড়িতে ডিনারে বা লাঞ্চে ডাকেনি। দুজনের দেখা কখনও চার্চে হয়েছে, কখনও রেস্টোরেন্টে, আবার কখনও বা সিনেমাহলে। সামনে ঈশ্বর থাকুন, সুখাদ্য থাকুক কিংবা কোনও হিরো বা হিরোইন; দুজনের মাঝখানে সবসময়ই এক অদৃশ্য মধ্যবর্তিনীর উপস্থিতি প্রকট! যার নাম 'ফেইথ'। প্রথম প্রথম আর্থার অস্বস্তি বোধ করত। এখন খানিকটা মানিয়ে নিয়েছে। আর ফেইথকে মেনে নিয়েছে বলেই আজ সে জ্যানেটের আইনত জীবনসঙ্গী।

জ্যানেটের কথা ভাবতে ভাবতেই খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল আর্থার। সংবিৎ ফিরল ক্যারোলিনের প্রবল কাশির শব্দে! তার গলায় কিছু একটা আটকে যাওয়ার ফলে প্রবল বিষম খেয়েছে সে। আর্থার তার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চকিতে তাকায়, 'কী হল! আর ইউ অলরাইট ক্যারল!'

বিষম খেয়ে ক্যারোলিনের ফর্সা মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। সুন্দর মুখ বিকৃত। সে কোনওমতে সামলে নিয়ে বলে, 'ওয়াইনের গ্লাসে কিছু একটা ছিল। আরেকটু হলেই গিলে ফেলছিলাম!'

বলতে বলতেই নানারকম মুখভঙ্গি করতে করতে বিষম খাওয়ার এক ও অদ্বিতীয় কারণটিকে মুখ থেকে বের করে আনল সে। তার গোলাপি ঠোঁট বেয়ে জিনিসটা বাইরে বেরিয়ে আসতেই অদ্ভুত এক দ্যুতিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল! রেস্টোরেন্টের মায়াবী আলোয় বাদশাহি জেল্লা নিয়ে ঝিকিয়ে উঠেছে একটা নিটোল হিরের আংটি! পরম উত্তাপে, প্রচণ্ড কামনায় ধিকিধিকি আগুনের মতো জ্বলছে।

'আ-র্থা-র!'

ক্যারোলিন স্তম্ভিত! সে যেন কথা বলতে ভুলে গিয়েছে! কেমন যেন বোকা বোকা ঠেকল তার সুন্দর মুখখানা। ওয়াইনের গ্লাসে হিরের আংটি! এর অর্থ বোঝার জন্য অবশ্য খুব বেশি বুদ্ধির প্রয়োজনও হয় না। বিস্ময়ের অভিঘাতে সে শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করতে পারল।

'ওঃ!'

শব্দটার মধ্যে তার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ঝরে পড়ে। আর্থার তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

'তুমি আমার সঙ্গে প্র্যাঙ্ক করছিলে, তাই না?' ক্যারোলিন উচ্ছ্বসিত, 'ওঃ মাই গড! ইউ আর ডেঞ্জারাস! সত্যি, তুমি বোধহয় হাসতে হাসতেই খুন করতে পারো! আর্থার, আই লাভ ইউ!'

আর্থারের কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল। ক্যারোলিন তো ওয়াইনের গ্লাসে হিরের আংটি পেল। এখন দেখা যাক, আগামীকাল জ্যানেট তার গ্লাসে কী পায়!

৩

২২শে জুলাই, ২০১৯

রুপোর দামি কাটলারি সেটটা টেবিলের ওপরে সাজাতে সাজাতে ঘড়ির দিকে তাকাল জ্যানেট। ঘড়ির কাঁটা প্রায় আটটা ছুঁই ছুঁই। আজ বৃষ্টি আসবে বলেই মনে হয়। বিকেল থেকেই ঈশান কোণে একদল জলভরা কালো মেঘ থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ মহিষের পালের মতো ক্রমাগতই ভয়ংকর রূপ ধরছিল। এখন তো থরে থরে সাজানো কালো মেঘের স্তূপের বুকে রুপোলি চমক ঝলসে ঝলসে উঠছে। তার সঙ্গে ক্রুদ্ধ গর্জন! যেন মহাকালের ডমরু বাজছে। তাণ্ডব শুরু হল বলে।

জ্যানেটের কপালে চিন্তার ভাঁজ। ঝড় আসবে বলেই মনে হয়। কিন্তু আর্থার কখন আসবে? আজই সে প্রথম এ বাড়িতে আসছে। এর আগে কখনও তাকে বাড়িতে ডাকেনি জ্যানেট। অনেকবারই মনে মনে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি। অদ্ভুত একটা ভয়, সঙ্কোচ, একটা লজ্জা তাকে বারবার পেয়ে বসেছে। কিছুতেই সে বাধা অতিক্রম করা যায়নি। কিন্তু আজ সব অপেক্ষার অবসান। এখন আর লজ্জা পাওয়ার কোনও জায়গা নেই। এখন আইনত আর্থার শুধুমাত্র তারই!

'ম্যাডাম?'

এতক্ষণ তার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে টেবিল সাজাচ্ছিল তার বিশ্বস্ত ভৃত্য জর্জ। এবার মুখ তুলে বলল, 'মাইকেলকে ডিনার গরম করতে বলব?'

অনেকদিনের পুরনো মানুষ জর্জ, ড্রাইভার জ্যাক, সেক্রেটারি ক্রিস্টাবেলা, সুদক্ষ বাটলার জেমস আর তুখোড় কুক মাইকেলকে নিয়েই জ্যানেটের সংসার। ওরা প্রত্যেকেই খুব ভালো। কিন্তু কখনও কখনও ওদের যন্ত্র বলে মনে হয় ওর। ওরা বুঝি দম দেওয়া কতগুলো রোবট, যারা এক নির্দেশেই সুসম্পন্ন করে ফেলবে সমস্ত কাজ। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে ওঠে জ্যানেট। ওরা প্রয়োজনের বাইরে একটা কথাও বলে না! শুধু নিশ্চুপে সমস্ত নির্দেশ পালন করে যায়। ওদের কাজে সামান্যতমও ত্রুটি পেলে খুশি হত সে। অন্তত বোঝা যেত, যে ওরা যন্ত্র নয়; দোষগুণসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু এতটাই নিখুঁত ওদের কাজ যে কোনও ভুল ধরাই মুশকিল।

জ্যানেট একটা শ্বাস টেনে নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়ে। ওইটুকু ইশারাতেই জর্জ বুঝে গেল যে মাইকেলকে কী বলতে হবে। ওরা সবাই জানে যে স্যার আজ প্রথম এ বাড়িতে আসছেন। ম্যাডাম যখন খাবার গরম করতে বারণ করছেন, তখন স্যার আসার পরই ও কাজটা করার নির্দেশ স্পষ্ট। সে মাথা ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল, জ্যানেট কী মনে করে যেন ডাকল, 'শোনো, হোয়াইট মিট'।

'ইয়েস ম্যাডাম।' সে কথাটা শেষ করার আগেই জর্জ বলে উঠল, 'মাইকেল জানে যে হোয়াইট মিট স্যার বেশি পছন্দ করেন। তবে ব্ল্যাকও সঙ্গে আছে। আর ভিন্টেজ ওয়াইনও বের করেই রেখেছি।'

এরা তো সবাই সব কিছুই জেনে বসে আছে! মুখ খোলার আগেই হড়হড়িয়ে সব কিছু বলে গেল। অগত্যা মাথা নাড়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সে বিরসবদনে বলল, 'ওকে। থ্যাঙ্কস।'

জর্জ মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল। জ্যানেট চুপচাপ হুইলচেয়ারটা সুদ্ধ নিজেকে টেনে নিয়ে গেল বেডরুমে। আজকাল বড় ক্লান্তি বোধ হয় তার। গ্র্যানির মৃত্যুর পর তার সঙ্গে কথা বলার একটা লোকও নেই! এমন একটা মানুষও নেই যার জ্যানেটকে কিছু বলার থাকতে পারে। সে পঙ্গু হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাথার ওপরে অতবড় বিজনেসটা তো একাই সামলাচ্ছে। গ্র্যানি তাকে সুকৌশলে নিজের কাজ নিজে করতেই শিখিয়েছে। অথচ ক্রিস্টাবেলা তাকে পুতুপুতু করবেই। তাও ভালো আজ তাকে আগেভাগেই ছুটি দিয়ে দিয়েছে। নয়তো এখনও নির্ঘাৎ চশমা আঁটা দিদিমণির মতো ডায়লগবাজি করে বলত, 'ম্যাডাম, আপনার ওয়াইন খাওয়া উচিত নয়! আপনি সহ্য করতে পারেন না।'

বেডরুমের বড় আয়নাটায় নিজেকে ভালোভাবে দেখছিল সে। নিজেকে অত্যন্ত কুৎসিত এক প্রৌঢ়া ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না তার। যদিও বয়েস এমন কিছু বেশি না, তবু এই অপ্রয়োজনীয় চর্বির জন্য তাকে অনেক বেশি বয়স্ক দেখায়। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বই অসহ্য লাগছিল জ্যানেটের। একটা সাদা ময়দার বস্তার মতো চেহারা! গালের পাশের মাংস ঝুলে পড়েছে! গোল গোল চোখদুটো অবিকল প্যাঁচার মতো। দাঁতের সেটিং অবশ্য চমৎকার। কিন্তু দাঁতের সৌন্দর্যে কী আসে যায়!

সে ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই মুখ দেখলে যে কোনও পুরুষের মনের প্রেম ও কামভাব তিরোহিত হতে বাধ্য! অথচ আর্থার যে কী দেখল! অমন সুন্দর তরুণ শেষ পর্যন্ত তার মতো একটা

মেয়ের প্রেমে পড়ল! ভাবলে একদিকে আফসোস হয়, আবার অন্যদিকে রোমাঞ্চও অনুভব করে। তার জীবনে এমন একটা মানুষেরই তো দরকার ছিল। এরকম একটা বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা চিরকালই ছিল। ফেইথ অবশ্য আছে। কিন্তু সে আর কতটুকু শূন্যতা ভরাতে পারে!

জ্যানেট নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। পরক্ষণেই মনে হল প্রতিবিম্বটা ভেংচি কাটছে। সে ফিক করে হেসে বলল, 'তুমি যতই রাগ করো, আমি আজ জীবনের তলানি পর্যন্ত পান করব। ওয়াইন খাব। আই অ্যাম ম্যারেড। চিয়ার্স!'

তার পেছন থেকে একটা ছায়া যেন চকিতে সরে গেল। জ্যানেট অনুভব করল, একটা সদাসতর্ক দৃষ্টি তার ওপর ক্রমাগত লক্ষ রেখে চলেছে। সে এবার সজোরে হেসে ওঠে, 'ওঃ ফেইথ! ইউ জেলাস গার্ল! মাম্মা ইজ কামিং টু ইউ!'

৪

'ফেইথকে দেখছি না তো?'

ডিনার টেবিলে বসে খুব সন্তর্পণে প্রশ্নটা করল আর্থার। অন্যদিনের তুলনায় আজ সে যেন একটু বেশিই সতর্ক। মাঝেমধ্যেই একটা হাত সবার অগোচরে ব্লেজারের পকেটে ঢুকে যাচ্ছে। অন্যান্য দিন সে যতটা হাসিখুশি থাকে, আজ যেন সেই হাস্যময় মুখটা একটা পিঙ্গল মুখোশের পেছনে লুকিয়ে পড়ছে বারবার। জ্যানেট ব্যাপারটা লক্ষ করে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসাও করেছে, 'কী হয়েছে? এনি প্রবলেম আর্থার?' সে মৃদু হেসে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়েছে। উলটে মুখে একটা জোরদার আকর্ণবিস্তৃত প্লাস্টিক হাসি এনে বলেছে, 'নো! নাথিং সিরিয়াস।'

আর্থার সতর্ক দৃষ্টিতে ফেইথকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এই মুহূর্তে তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী সে-ই। এ বাড়ির মালকিন যদি হঠাৎ করে মারা যায়, তবে চাকর-বাকররা বড়জোর কান্নাকাটি করবে। পৃথিবীতে শোকের আয়ু মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা। বাহাত্তর ঘণ্টা পরে ওরা জ্যানেটের শোক ভুলে অন্য চাকরি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। জ্যানেটের জন্য আর কেউ শোকপালন করবে না।

কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু ফেইথ। একেই সে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত। তার ওপর ল্যাব্রাডর অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রজাতি। দক্ষ স্নিফার ডগও বটে। তার ওপর তার যেসব কীর্তিকলাপ শোনা যায়, তাতেই স্পষ্ট, সে ওয়েল ট্রেইন্ড। আর্থার আর কাউকে ভয় পায় না। কিন্তু ফেইথকেও আন্ডার এস্টিমেট করা বোকামি। সায়ানাইডের গন্ধ খুবই ক্ষীণ। কিন্তু যেখানে অপরপক্ষে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন প্রাণীটির উপস্থিতি রয়েছে, সেখানে একটু সমঝে চলাই বাঞ্ছনীয়।

ফেইথের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা আর্থারকে এতটাই বিচলিত করছিল যে বারবার হাতটা পকেটের মধ্যে থাকা সায়ানাইডের অ্যাম্পুলটাকে অজান্তেই স্পর্শ করছে। ফেইথ তাকে আপাদমস্তক একবার শুঁকে দেখলেই সে ধরা পড়ে যাবে। এই ভয়টাই বারবার তাকে তটস্থ করে তুলছিল। এ বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি ঘিরে ধরেছে তাকে। সে অনুভব করছে যে এই বিরাট প্রাসাদের কোনও প্রান্তে, কোনও অলিন্দে একজোড়া আপাত অদৃশ্য চোখ জরিপ করছে

তাকে। আর্থার বেশ কয়েকবার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মালিককে খোঁজার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এখনও তার দেখা পায়নি। ইতমধ্যে বাড়ির ভৃত্যদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আসল বিশ্বস্ত সঙ্গীটির দেখা মেলেনি এখনও। তাই শেষ পর্যন্ত লজ্জার মাথা খেয়ে প্রশ্নটা করেই বসল।

জ্যানেট স্মিত হাসল, 'ফেইথ নিজের মর্জির মালকিন। যখন সময় হবে, তখন ঠিকই দেখা দেবে।' বলতে বলতেই সে হেসে যোগ করল, 'তুমি ওকে এখনও দেখোনি ঠিকই, কিন্তু ও তোমায় দেখেছে।'

কথাটা শুনেই একটা শিরশিরে অনুভূতি আর্থারের পিঠ বেয়ে চলে গেল। সে একটু সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে আশেপাশে তাকায়। কোথায় সেই জ্বলজ্বলে অতিমানবীয় দৃষ্টি! ঠিক কোথায় লুকিয়ে থেকে লক্ষ রাখছে তার ওপর?

'ও একটু লাজুক।' জ্যানেট খাওয়া শেষ করে ওয়াইনের গ্লাস তুলে নিয়েছে, 'এমনিতে ওর সাড়াশব্দ তুমি পাবে না। এতক্ষণ যে এখানে আছ, একবারও ওর ডাক শুনতে পেয়েছ কি?'

সত্যিই! প্রায় দেড়ঘণ্টা হতে চলল আর্থার এ বাড়িতে ঢুকেছে। অথচ একবারও কোনও সারমেয় গর্জন শুনতে পায়নি। এমনিতেই ল্যাব্রাডররা শান্তই হয়। কিন্তু তা বলে এত শান্ত! অদ্ভুত কুকুর তো!

আর্থার আড়চোখে তাকায় জ্যানেটের দিকে। এই নারীকে সহ্য করা যে কী কঠিন, তা শুধু সে-ই জানে। এই কুৎসিত রমণী যখন তার বক্ষলগ্না হয়, তখন রীতিমতো বমি পায়। ঘেন্না করে। তবু মুখে মিষ্টি হাসি রেখে সহ্য করে চলেছে শুধু এই দিনটার জন্য! এখন সে আইনত জ্যানেটের স্বামী। স্বাভাবিকভাবেই জ্যানেটের মৃত্যুর পর এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হবে আর্থার। বিলাস-ব্যসন-আরামের কোনও অভাব থাকবে না। সে তো ইতিমধ্যেই ভেবে রেখেছে যে প্রথমেই জ্যানেটের সব বিশ্বস্ত চাকর-বাকরদের তাড়াবে। তারপর ক্যারোলিন আর ও নিজেদের সংসার পাতবে। জ্যানেটের মৃত্যু নিয়ে তদন্ত অবশ্য একটা হবেই। কিন্তু একটি একা ক্রোড়পতি নারী নতুন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার দরুন অবসাদে আত্মহত্যা করতেই পারে। বাকিটা টাকা থাকলেই ম্যানেজ করা যায়। এখন শুধু একটা সুযোগ পেতে হবে ওয়াইনের গ্লাসে জিনিসটা মিশিয়ে দেওয়ার। তারপর অ্যাম্পুলটা সযত্নে জ্যানেটের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিতে হবে। অ্যাম্পুলের গায়ে ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট একবার বসিয়ে দিলেই—!

'কে—!'

পায়ের কাছে রোমশ কী যেন একটা দ্রুত সরসর করে চলে গেল! আর্থার প্রায় লাফিয়েই ওঠে, 'ক্কে! টেবিলের নীচে কে!'

আতঙ্কে সে তখন প্রায় কাঁটা হয়ে উঠেছে। ফেইথ কি তবে এতক্ষণে চলে এল! সবার অগোচরে টেবিলের তলায় ঢুকে আর্থারকে শোঁকার চেষ্টা করছে নাকি! অ্যাম্পুলটা এখনও পকেটে! তার হাল্কা বাদাম তেলের মতো গন্ধ কোনও মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভবই নয়। কিন্তু ফেইথ! তার ঘ্রাণশক্তির কাছে যে কিছুই লুকোনো থাকে না।

'ভয় পেও না।' জ্যানেট মৃদু হাসল, 'ও হোপ। জর্জের পোষা বিড়াল। কিছু করবে না। জাস্ট ডিনার টেবিলে একটা রাউন্ড দিতে এসেছে।'

একা ফেইথ কি কম ঝামেলা ছিল যে হোপও এসে জুটেছে! আর্থার প্রায় দরদর করে ঘামছে। এ বাড়িতে মানুষ কম, কুকুর-বিড়াল বেশি! এবং সম্ভবত তারা প্রত্যেকেই এইমুহূর্তে বিপজ্জনক। সে কোনওমতে সামলে নেয়, 'সরি। আমার আবার বিড়ালে অ্যালার্জি আছে।'

'ও-হো!'

জ্যানেট একটু আফসোসজনক আওয়াজ করে। তারপর হুইলচেয়ারটাকে একটু পিছিয়ে নিয়ে মিষ্টি সুরে ডাকল, 'হোপ। প্লিজ কাম হিয়ার বেবি।'

সেকেন্ডের ভগ্নাংশ নীরবতা। পরক্ষণেই একটা সাদা ধবধবে তুলোর বল লাফিয়ে উঠে পড়ল জ্যানেটের কোলে। বেশ থাবা গেড়ে বসে, বিরাট মোটা লেজটা তার মুখে অবলীলায় বুলিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, 'মিঁয়াও।'

'এক্সকিউজ মি।' জ্যানেট অটোম্যাটিক হুইলচেয়ারটাকে চালিয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'মহারানিকে একটা রসালো মাছের পিস গিফট করে আসি। ফেইথের মতো ইনিও আবার আমার হাতে খেতেই পছন্দ করেন।'

'নো প্রবলেম।' আর্থার পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'টেক ইওর টাইম।'

'থ্যাঙ্কস।'

জ্যানেট বিড়ালটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যেতেই তড়িৎগতিতে চতুর্পাশটা একবার দেখে নিল আর্থার। না, কোথাও কেউ নেই। এই প্রাসাদের চতুর্দিকে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। কিন্তু ডাইনিং হলে কোনও ক্যামেরা নেই। সম্ভবত খাওয়ার সময় মানুষ একটু প্রাইভেসি চায়। সেজন্যই কোনও ক্যামেরা বসানো হয়নি। এই সুবর্ণ সুযোগ!

আর্থার বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সায়ানাইডের অ্যাম্পুলটা বের করে আনল। মুহূর্তের ভগ্নাংশে সায়ানাইড মিশে গেল জ্যানেটের গ্লাসে! সে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের চেয়ারে বসতেই যাচ্ছিল, তার আগেই ফের একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি! যেন একজোড়া চোখ নিষ্পলকে দেখছে তাকে। সে চোখদুটো তার সমস্ত কীর্তি দেখে নিয়েছে। দপদপিয়ে জ্বলছে সেই চোখ। কিন্তু কোথায়!

আর্থার টের পেল সে প্রচণ্ড ঘামছে! পাগলের মতো একবার এদিক-ওদিক তাকাল। অসহ্য রাগে দাঁতে দাঁত পিষল সে! কোথায় সেই শয়তান! কোথায় বসে নিঃশব্দে ভয় দেখাচ্ছে! হাতের কাছে পেলে ওই নীরব, বিশ্বস্ত দৃষ্টি কেড়ে নিত ও। কিন্তু তার যে দেখাই নেই! কোথায় ফেইথ?

আচমকা একটা অস্ফুট শব্দ পেয়ে পিছনে ফিরল সে! তার হৃৎপিণ্ড তখন বেসামাল হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে বুকে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা। উত্তেজনায় মুখ আরক্তিম।—

'সরি আর্থার! একটু দেরি হল।' জ্যানেট মিষ্টি হেসে হুইলচেয়ার নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। মৃদু হেসে বলল, 'হুইলচেয়ারে আসার একটাই সুবিধা। কোনও শব্দ হয় না। বেশ নিঃশব্দেই চলাফেরা করা যায়।'

আর্থারের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। দরদর করে ঘামছে। বুকের ব্যথাটা আরও প্রবল। সে টের পেল, কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে শরীর। চতুর্দিক যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। শুধু কোনওমতে বলল, 'ফেইথ?'

জ্যানেট ফের হাসল, 'শিগগিরিই দেখা পাবে তার। তাড়া কীসের?'

৫

আবার একটা বিষাদঘন রাত্রি। আবার সেই চাপা কান্নার সুর! সেই ভারাক্রান্ত কান্না! দু-হাতে আপনজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে সেই মানুষটা। চোখ বেয়ে ব্যথা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সে যন্ত্রণাকাতর ক্রন্দন বাগানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে নারকেল গাছের শিরশির শব্দের সঙ্গে। শিগগিরিই ঝড় আসবে। তারই জোরালো হাওয়ায় বাগানের গাছগুলো দুলে দুলে উঠছে।

'আই অ্যাম সরি আর্থার! আই অ্যাম সরি।' নিথর আর্থারকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দনবিকৃত স্বরে বলল জ্যানেট, 'তুমি এত বোকা কী করে হতে পারো? বুঝতে পারলে না যে, যে পঙ্গু মানুষটা এত বড় একটা ব্যবসা চালায়; সে অন্ধ নয়! নিজের প্রেমিকের সব খবরই সে রাখবে! কেন তুমি ক্যারোলিনের কাছে গেলে? কেন সায়ানাইডের অ্যাম্পুল কিনলে? কেন বুঝলে না যে আমি ঠিকই জানতে পারব! সব বুঝতে পারব। কেন বিশ্বাসঘাতকতা করলে? নয়তো আমিও কি তোমার স্যুপের মধ্যে—!'

'ম্যাডাম।'

এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তির মতো জর্জ এসে দাঁড়াল তার সামনে। ওই একটি শব্দ ছাড়া তার মুখে আর কোনও কথা নেই। বাগানের অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও তিনটে ছায়াদেহ। জেমস, জ্যাক আর মাইকেল। ওরা কোনও প্রশ্ন করে না। শুধু যন্ত্রের মতো হুকুম তামিল করে। কোনও কাজে কোনওরকম খুঁত পাওয়া যায় না। আজও যাবে না।

কান্নামাখা গলায় বলল জ্যানেট, 'ও আর কোনওদিন ক্যারোলিনের কাছে যাবে না জর্জ! ও এখন শুধুই আমার! আর কারোর নয়—!'

জর্জ শুধু অস্ফুটে আবার উচ্চারণ করল, 'ম্যাডাম!'

'ওকে ফেইথের কাছেই রাখো।' অশ্রুমাখা সজল চোখ তুলে তাকায় জ্যানেট, 'ও ফেইথের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। এখনই ওদের দেখা হবে। ফেইথ ওকে ভালোবাসতে শেখাবে, বিশ্বস্ত হতে শেখাবে! ফেইথের মতোই ও আর আমায় ছেড়ে কখনও আর কোথাও যাবে না।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেই চারজন মানুষ চৌত্রিশ বছর আগেকার ছোট্ট কবরটা খুঁড়তে শুরু করল। জ্যানেট মরদেহটাকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল নিজের বাহুবন্ধন থেকে।

একটু পরেই কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে কবরের ওপরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল জর্জ। তার আলো জ্যানেটের মুখের একপাশে এসে পড়েছে। আরেক পাশ অন্ধকার।

যেন ওপাশের মুখ আঁধার দিয়েই গড়া। সেখানে কোনওদিন কোনও আলো এসে পড়েনি!

বোমা

আর সাড়ে পাঁচ মিনিট! আর মাত্র সাড়ে পাঁচ মিনিট আছে তাঁর হাতে। তারপরই বিস্ফোরণ! সব শেষ। দীর্ঘদিনের যন্ত্রণার উপশম! যে জ্বালায় এতদিন ধরে ধিকিধিকি জ্বলে এসেছেন; তার পরিসমাপ্তি ঘটবে আজই! ঠিক আর সাড়ে পাঁচ মিনিট পরে!

মেজর রবার্ট ডিমেলো বসেছিলেন তাঁর আরামদায়ক ইম্পোর্টেড সোফায়। উল্টোদিকে স্যাভিয়েল ও শ্যারন। সামনে কাচের সেন্টার টেবিলের ওপরে রাখা আছে ধোঁয়া-ওঠা ফিশফিঙ্গার, রেশমি কাবাব, স্যালাড ও নানারকমের ভাজাভুজি। তার সঙ্গে শোভা পাচ্ছে দামি কাচের গ্লাসে তরল। আজকের প্রস্তুতির সবটা নিজেই করেছে শ্যারন। বড় সযত্নে, নিজের হাতে করেছে। সে একাধারে ভালো প্রেমিকা, ভালো স্ত্রী, ভালো রাঁধুনি, ভালো গৃহিণী, ভালো মা, আবার অন্যদিকে শহরের রীতিমতো নামকরা হেয়ার স্টাইলিস্টও বটে। পার্কস্ট্রিটের এক বিরাট অভিজাত স্যালোঁ-র মালকিন। ব্যবসাটাও খুব ভালো বোঝে। সংসার, সন্তান ও ব্যবসা সে সমান দক্ষতায় দশভূজার মতো সামলায়। কিন্তু আর সাড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার এই দায়িত্বপূর্ণ ব্যস্ত জীবনেও যবনিকা পড়ে যাবে চিরদিনের জন্য! ছুটি পেয়ে যাবে শ্যারন।

'রবার্ট? তুমি আরেকটু স্ন্যাকস নেবে?'

শ্যারনের প্রশ্নে সংবিৎ ফিরে পেলেন মেজর ডিমেলো। তাঁর পিঙ্গল মুখের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'কী হয়েছে রবার্ট? এনি প্রবলেম?'

মুহূর্তের মধ্যে সতর্ক হয়ে গিয়েছেন তিনি। বুঝতে দেওয়া যাবে না! কিছুতেই ওদের বুঝতে দেওয়া যাবে না যে এই মুহূর্তে কী পরিমাণ স্নায়বিক চাপে আছেন রবার্ট। একটু একটু করে ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে, আর প্রহর গুনছেন সেই অন্তিম মুহূর্তের।

'সুন্দরী, তুমি হাতে করে বিষ দিলেও খেতে পারি! এমনকি আমার রাইফেল থেকে গোটা দুয়েক গুলি মেরেও দেখতে পারো। চুপচাপ বিনা প্রতিবাদে খেয়ে নেব!' রবার্ট হেসে উঠলেন, 'স্ন্যাকস তো কোন ছার!'

শ্যারনের আইভরির মতো ফর্সা গালে লজ্জারুণ আভা উঠে এল! মাথা নীচু করে মৃদু স্বরে বলল, 'ফ্লার্টমাস্টার!'

রবার্ট এবার আরও জোরে হেসে উঠেছেন, 'আরে, অমন পরস্ত্রীর মতো লজ্জা পাচ্ছ কেন? আমি তো তোমার হাজব্যান্ড! তোমার সঙ্গে ফ্লার্ট করব না তো কি ও পাড়ার বিশের পিসির সঙ্গে করব?'

বলতে বলতেই রবার্ট ফের অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। পরিকল্পনামাফিক চলছে সবটাই। ওঁদের একমাত্র মেয়ে ন্যান্সি তার এক বন্ধুর বাড়িতে পার্টিতে গিয়েছে। ফিরতে রাত হবে। যদিও রবার্ট জানেন বেশিক্ষণ পার্টি এনজয় করতে পারবে না ন্যান্সি। দুর্ঘটনার খবর শুনে তাকে চলে আসতেই

হবে। তবু প্রাণটা বেঁচে যাবে ওর! একটিও নিরপরাধ প্রাণী এই বিস্ফোরণে মারা যাক, তা চাননি রবার্ট। তাই ন্যান্সি রয়েছে নিরাপদ জায়গায়।

‘থ্যাঙ্কস ফর দ্য নাইস ইভনিং!’ রবার্টের উলটো দিকের সোফায় বসে থাকা আজকের বিশেষ অতিথি, স্যাভিয়েল নেশাজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, ‘ফিশফিঙ্গারটা ভীষণ ভালো হয়েছে। কাবাব তো মাইন্ডব্লোইং! আপনি খুব লাকি স্যার, যে এমন হাতের রান্না রোজই খেয়ে থাকেন! আমাদের তো স্রেফ শুকনো ব্রেড, কিংবা কয়েক টুকরো সসেজ খেয়েই দিন চালাতে হয়! ব্যাচেলর্স ডেন, এ আর কী পাওয়া যাবে?’

রবার্ট মুচকি হাসলেন, ‘তাহলে একটা বিয়ে করে ফেল! দেখবে আর কোনও প্রবলেম থাকছে না! রোজ ভালো-মন্দ খেতে পাচ্ছ!’

‘বিয়ে!’ স্যাভিয়েল চোখ কপালে তুলে ফেলল, ‘পাগল! সবাই কি আর শ্যারনের মতন? আজকালকার মেয়েদের আপনি চেনেন না স্যার! তারপর দেখা যাবে আমাকেই হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হচ্ছে, আর আমার বৌ ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে খাচ্ছে!’

রবার্ট সজোরে হেসে উঠলেন, ‘না না! মেয়েরা অত ভয়ংকর প্রাণীও নয়! অবশ্য একথা মানছি যে শ্যারনের মতোন স্ত্রী লাখে একটা মেলে! কিন্তু তবু বাজি রেখে বলতে পারি, বিবাহিত জীবন অতি মধুর।’

স্যাভিয়েল মিষ্টি হাসে, ‘এই পাইকারি হারে ডিভোর্সের সময় আপনার মুখে ম্যারেড লাইফের প্রশস্তি শুনতে বড় ভালো লাগছে স্যার!’

‘তার কারণ আমি খুব লাকি।’ রবার্ট শ্যারনের হাত ধরলেন, ‘আমার জীবন-সঙ্গিনী আমায় খুব ভালোবাসে। ভালোবাসা যে কী জিনিস, তা শুধু সে-ই জানে, যে পেয়েছে!’

শ্যারন মুখ নীচু করে সলজ্জ হাসল। স্যাভিয়েলের মুখের হাসিটা কেমন যেন ব্যঙ্গ বঙ্কিম ঠেকল রবার্টের! ওর সকৌতুক দৃষ্টি যেন বলতে চায়, ‘তাই বুঝি? সত্যিই কি তুমি ভালোবাসা পেয়েছ? গোটাটাই প্রতারণা নয়তো?’

হ্যাঁ। প্রতারণাই তো! স্যাভিয়েল আর শ্যারন তো মাসের পর মাস ধরে তাঁকে প্রতারণা করে চলেছে! ওরা কী ভাবে! মেজর ডিমেলো একটা আকাট মূর্খ! কিছুই বুঝতে পারবেন না? বিগত ছ’মাস ধরে শ্যারন তাঁকে ঠকাচ্ছে! ওর চলনে, বলনে পরিবর্তন এতটাই সুস্পষ্ট যে একজন অন্ধও বুঝতে পারবে। আর মেজর ডিমেলো তো একজন রীতিমতো চক্ষুষ্মান, সতর্ক ব্যক্তি! শ্যারন কী করে ভাবল যে স্যাভিয়েলের সঙ্গে তার গুপ্ত প্রেম ওঁর চোখে পড়বে না!

মেজর ডিমেলো স্যাভিয়েল আর শ্যারণের দিকে তাকিয়েছিলেন। আজ, এই সন্ধ্যাটা তো ওদের জন্যই বেছে নিয়েছেন তিনি। এই জন্যই তো স্যাভিয়েলকে নিমন্ত্রণ করেছেন। অনেক ভেবে-চিন্তে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। যখন প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন, তখন মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলেন রাইফেলটা বের করে দুজনকেই গুলি করে মারবেন! কিন্তু পারেননি। যতবার ভেবেছিলেন, ততবার তাঁর হাত কেঁপেছিল! শ্যারন! ওঁর দীর্ঘ কুড়ি বছরের সঙ্গিনী! ন্যান্সির মা! ওঁর

জীবনের একমাত্র প্রেম! একটা মানুষ সারাজীবনে যতখানি ভালোবাসতে পারে, তার চেয়েও বেশি ভালোবাসা দিয়েছেন উনি শ্যারনকে! সেই শ্যারনকে কীভাবে নিজের হাতে গুলি করবেন! অসম্ভব! তাছাড়া ন্যান্সি কী জানবে? যে বাবা-মায়ের অতলান্তিক প্রেমের নিদর্শন সে দেখে এসেছে, সেখানে তাকে জানতে হবে যে তার মা একজন বিশ্বাসঘাতিনী! ওর বাবা একজন খুনি!

অগত্যা পরিকল্পনা বাতিল করতে হল। রোজ সকালে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন, শ্যারন সুন্দর করে সেজেগুজে বেরোচ্ছে! রোজ রাতে অস্থির চিত্তে দেখেছেন, একটা গাড়ি চুপিসারে এসে নামিয়ে দিয়ে গেল ওকে। গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল স্যাভিয়েল। নিবিড় আলিঙ্গন করে আলতো চুম্বন এঁকে দিল শ্যারণের কপালে। তারপর গাড়ি নিয়ে হুশ করে চলে গেল!

মেজরের বুকের ভেতর তখন টিপটিপে রক্তক্ষরণ! কে এই স্যাভিয়েল! শ্যারন বলেছিল, স্যাভিয়েল ওর কলেজের বন্ধু। বহুবছরের বন্ধুত্ব ওদের। কিন্তু বিয়ের পরে আর যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ একদিন পার্কস্ট্রিটের স্যালোঁ-তে আবার দুজনের দেখা হয়ে যায়। স্যাভিয়েল চুল স্টাইল করতে এসেছিল। সেখানেই ফের যোগাযোগ। কিন্তু সম্পর্কটা আর ক্লায়েন্টের সীমার মধ্যে রইল না! স্যাভিয়েলের সঙ্গে প্রায়ই কফিশপে যেতে শুরু করল শ্যারন। কখনও রেস্টোরেন্টে, কখনও পাবে! না, এগুলোর কোনওটাই মেজর নেহাতই কল্পনা করেননি। তাঁর পরিচিত দু-একজন ওদের দেখে ফেলেছিল। তারাই এসে বলেছে ওঁকে!

মেজর প্রথমে বিশ্বাস করেননি। কিন্তু এরপর একদিন স্বচক্ষে দেখলেন! শ্যারণের সঙ্গে দেখা করতে স্যালোঁয় গিয়েছিলেন! শ্যারনকে কিছুই বলেননি। ইচ্ছে ছিল ওকে চমকে দেওয়ার!

কিন্তু যা দেখলেন, তাতে নিজেই চমকে গেলেন! ওঁর চোখের সামনে স্যালোঁর গেট খুলে বেরিয়ে এল শ্যারন আর স্যাভিয়েল। হাত ধরাধরি করে! ঠিক যেন সদ্য প্রেমে পড়া দুই যুবক-যুবতী! রাস্তার ওপরে দুজন নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্যারন স্যাভিয়েলের চুল আদর করে ঘেঁটে দিচ্ছে। আর স্যাভিয়েলও ছদ্মরাগে সেটা উপভোগ করছে! মেজরের মনে হচ্ছিল, ওঁর গায়ে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! পড়পড় করে পুড়ে যাচ্ছে হৃদয়! চোখদুটো বুঝি এখনই জ্বলে পুড়ে গলে বেরিয়ে আসবে...! মনে হচ্ছিল, এখনই তিনি একটা বোমার মতোন ফেটে পড়বেন! বিস্ফোরণে উড়ে যাক সবকিছু! সমস্ত দুনিয়া, সমস্ত মানুষ জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাক এই মানববোমায়...!

কিন্তু সেদিন তিনি ফেটে পড়েননি। বরং নিশ্চুপে চলে এসেছিলেন বাড়িতে। কিন্তু আজকে ফাটবেন! মেজর ঘড়ি দেখলেন! আর মাত্র তিন মিনিট! স্যাভিয়েল আর শ্যারন তখন হাসিমুখে নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা চালাচ্ছে। স্যাভিয়েলের নেশা বেশ চড়েছে। দামি হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে ঘনঘন! মেজরের হাসি পেল। ওরা জানেও না যে সামনে বসে থাকা মানুষটির কোটের ভেতরে, বুকের একদম কাছে টিকটিক করছে একটা বম্ব! আর ঠিক তিন মিনিট পরেই বোমাটা ফাটবে! ছাই হয়ে যাবেন মেজর! ছাই হয়ে যাবে শ্যারন এবং স্যাভিয়েলও! ছাই হয়ে যাবে ওদের প্রেম! নিজে তো মরবেনই, ওদেরও মারবেন। মিলিটারিতে থাকাকালীন অনেক জঙ্গিদলের নেতাদের মেরেছেন তিনি। তাই সকলেই ভেবে নেবে যে কোনও জঙ্গি সংগঠনই প্রতিশোধ নিতে এই বিস্ফোরণ

ঘটিয়েছে। ন্যান্সিও তাই ভাববে। স্বপ্নেও সে কল্পনা করতে পারবে না যে এই ষড়যন্ত্র স্বয়ং তার বাবারই করা! কারোর নামে কোনও কলঙ্ক লাগবে না!

পরিকল্পনাটা জবরদস্ত। তবে কঠিন ছিল বোমাটা জোগাড় করা! এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় বোমাবাজ বিল্লার কাছে যেতে হয়েছিল তাঁকে। বিল্লা কয়েকবছর আগেও বম্ব-এক্সপার্ট ছিল। তার তৈরি বম্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডিফিউজ করা যেত না। বম্ব স্কোয়াডকে সে রীতিমতো হিমশিম খাইয়ে ছাড়ত! কিন্তু এরকমই একদিন বম্ব তৈরি করার সময় তার অসতর্কতাবশত একটা বিস্ফোরণ ঘটে। কপালজোরে বিল্লা প্রাণে বেঁচে গেলেও ওর গোটা মুখটা গিয়েছিল পুড়ে। পা দুটোও উড়ে গিয়েছিল বিস্ফোরণে। তারপর থেকে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে আর কখনও বোমা বানাবে না। কিন্তু মেজর অনেক ভেবেচিন্তে তারই শরণাপন্ন হলেন। কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, 'বিল্লা, আমার একটা মারাত্মক টাইমার বম্ব চাই। তুই যত টাকা চাইবি, দেব। কিন্তু বম্বটা ডিফিউজ করার সাধ্য যেন কারোর বাপেরও না থাকে!'

বিল্লার পোড়া মুখে আতঙ্কের ছায়া পড়ে, 'কী বলছেন স্যার! আমি তো বম্ব আর তৈরি করি না। আমার বৌ মাথার দিব্যি দিয়েছে! এ ক'বছর আমি একটা বোমাও তৈরি করিনি!'

'তাহলে দিন কাটে কী করে?' মেজর ডিমেলো জানতে চেয়েছেন, 'খাস কী?'

বিল্লা উদাস দৃষ্টিতে ওর ক্রাচদুটোর দিকে তাকায়, 'কী আর করব স্যার! বলতে লজ্জা করে। তবে এখন আমি ভিক্ষা করি।'

'হুম।' মেজর কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'শোন বিল্লা, আমার জন্য তোকে একটা বম্ব তৈরি করতেই হবে! যদি না করিস তবে আমি মিথ্যে মামলায় তোকে ফাঁসাব। পুলিশের কাছে মিথ্যে বয়ান দেব যে তুই আমার বাড়িতে বম্ব প্ল্যান্ট করে আমায় মারার হুমকি দিয়েছিস। তারপর কী হবে তা তুই ভালোই জানিস।'

বিল্লা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকায়। মেজর স্থির দৃষ্টিতে তাকে কিছুক্ষণ মাপলেন। সে ভয় পেয়েছে বুঝে খানিকটা আশ্বস্তও হলেন। তারপর বললেন, 'আর যদি তুই বম্বটা তৈরি করে দিস, তবে এত টাকা পাবি যে তোকে জীবনেও আর ভিক্ষা করতে হবে না। নিজের গ্রামে ফিরে গিয়ে শান্তিতে, আয়েশ-আরাম করে জীবন কাটাবি।'

বিল্লা শুকনো ঠোঁট চাটল। কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'আমার নাম আসবে না তো?'

'আসবে না।' একতাড়া নোট ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন মেজর, 'এই নে, এতে দশ লাখ টাকা আছে। অ্যাডভান্স। বাকি দশ লাখ মাল ডেলিভারির সময় পাবি।'

বিল্লা আর আপত্তি করেনি। বরং মেজরের কথামতনই সে একটা টাইমার বম্ব তৈরি করে আজ সকালেই টাইমার সেট করে ডেলিভারী দিয়েছে। জিনিসটা দেখে আশ্বস্ত হয়েছেন মেজর। বিল্লার হাতে জাদু আছে! এই চকচকে বম্বটাকে ডিফিউজ করার সাধ্য কারোর নেই। কেউ পারবে না এই ভয়ংকর মারণাস্ত্রকে বিফল করতে!

এই মুহূর্তে মেজরের ঠিক বুকের কাছে উষ্ণ স্পর্শ ছড়াচ্ছে সেই টাইমার বম্ব! তাঁর হৃৎস্পন্দনের তালে তালে টিকটিক করছে! মৃত্যুভয় তাঁর মনের মধ্যে একমুহূর্তের জন্যও থাবা বসাতে পারেনি। তাঁর ইস্পাত-কঠিন সঙ্কল্পে সামান্যতমও দুর্বলতা আনতে পারেনি। যেদিন শ্যারণের সঙ্গে স্যাভিয়েলকে দেখেছিলেন, সেদিনই তো মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল মেজর রবার্ট ডিমেলোর! আজ নেহাতই তাঁর আনুষ্ঠানিক মৃত্যুর দিন! তাই আজ ওঁর মস্তিষ্ক বরফের মতো ঠান্ডা! যা করছেন, তার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ কিংবা অনুতাপ নেই।

'রবার্ট!' শ্যারন ডেকে ওঠে, 'কী ভাবছ তখন থেকে বলো তো? স্যাভি তোমার কানের কাছে বকবক করে মরছে! কিন্তু তুমি শুনছই না!'

মেজর আবার সতর্ক হয়ে ওঠেন। মুচকি হেসে বলেন, 'না তো, সবই তো শুনছি।'

আর মাত্র একমিনিট! স্যাভিয়েলের ততক্ষণে নেশা চড়ে গিয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ও আর হুঁশে নেই। সে স্খলিত স্বরে বকবক করে চলেছিল। এতক্ষণ ধরে কী বলছে তা খেয়াল করেননি মেজর। এবার খেয়াল করলেন। স্যাভিয়েল তখন বলে চলেছে, 'আপনি সত্যিই ভাগ্যবান স্যার। শ্যারণের মতো স্ত্রী পেয়েছেন। ভালোবাসা পেয়েছেন! আমার জীবনে কোনওদিন ভালোবাসা জুটল না। কোনওদিন জুটবেও না! ওহ্ গড! আই অ্যাম সো লোনলি!'

বলতে বলতেই কেঁদে ফেলেছে সে। আড়চোখে ওর দিকে তাকালেন মেজর! ন্যাকা! পরের স্ত্রীকে নিয়ে খেলায় মেতেছ! আমার শ্যারনকে ছিনিয়ে নিয়েছ আমার কাছ থেকে! আর এখন বলছ, তুমি একা! ন্যাকামি হচ্ছে!

'আই অ্যাম কার্সড স্যার! আই অ্যাম কার্সড! আমি অভিশপ্ত!' হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল স্যাভিয়েল, 'আমার সব বয়ফ্রেন্ড আমায় ধোঁকা দিয়ে চলে যায়! সব প্রেমিক আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছে! আই অ্যাম সো লোনলি! সো লোনলি...!'

নেশার ঝোঁকে কী সব যা তা বকছে ছেলেটা! মেজর বিরক্ত হলেন। গার্লফ্রেন্ডকে বয়ফ্রেন্ড বলছে। তিনি শুধরে দিলেন, 'স্যাভিয়েল, বয়ফ্রেন্ড নয়; গার্লফ্রেন্ড! প্রেমিক নয়, প্রেমিকা!'

'নো নো স্যার!' সজোরে চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'অ্যান এম্ফ্যাটিক নো! আমি কোনও মেয়েতে ইন্টারেস্টেড নই! আমি পুরুষে আসক্ত! সেজন্যই তো বলছি; আই অ্যাম কার্সড! আই অ্যাম...আই অ্যাম...আই অ্যাম...!' কোনওমতে তোতলাতে তোতলাতে স্যাভিয়েল শেষ করল বাক্যটা, 'আই অ্যাম আ গে!'

আর কুড়ি সেকেন্ড! বোঁ করে ঘুরে গেল মেজরের মাথাটা! কী বলছে স্যাভিয়েল! ও সমকামী! মেয়েদের প্রতি ওর কোনও আসক্তি নেই! তবে শ্যারন...?

'শ্যারন আমার খুব ভালো বন্ধু স্যার!' স্যাভিয়েল বলল, 'আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। একমাত্র ও-ই জানে যে আমি কী! আমার মা, আমার পরিবার, কেউ কিছু জানে না! তাই সব কিছুই ওর সঙ্গে শেয়ার করি আমি। আমার দুঃখটা একমাত্র ও-ই বোঝে!'

আর দশ সেকেন্ড! তারপরেই হবে বিস্ফোরণ! মেজর হতবুদ্ধির মতো বসে আছেন। কী করবেন বুঝতে পারছেন না! একবার তাকালেন শ্যারণের দিকে। শ্যারণ বিষণ্ণ মুখে মাথা ঝাঁকায়। অর্থাৎ স্যাভিয়েল যা বলছে তা সত্যি! ওদিকে বুকের কাছে টিকটিক করছে টাইমার বম্ব! কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে! দশ...নয়... আট...সাত...ছয়... পাঁচ... চার ...তিন...দুই...! কী মর্মান্তিক ভুল! কী মর্মান্তিক...!

তিনি চোখ বুঁজে ফেললেন! তাঁর বুকের মধ্যে প্রবল আন্দোলন। বুক কাঁপিয়ে একটা অসহ্য ব্যথা টের পেলেন! তার সঙ্গে এও টের পেলেন যে তিনি আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যাচ্ছেন! নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে...!

আর কিছু বোঝার আগেই সোফা থেকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন মেজর ডিমেলো!

এর ঠিক ঘণ্টাখানেক আগের কথা।

বিল্লা বেরোনোর সব প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে। মেজরের দেওয়া টাকার বান্ডিলগুলো ব্যাগে ভরছে দ্রুত। হাতের কাছে যা পেল শশব্যস্তে গুছিয়ে নিল দুটো বাক্সে। তার কাজ করার ধরনেই স্পষ্ট যে সে পালাচ্ছে!

‘গোমতী! তাড়াতাড়ি কর। হাতে একদম সময় নেই!’ সে গলার স্বর চড়িয়ে স্ত্রীকে ডাকে।

তার স্ত্রী গোমতী তৈরি হচ্ছিল। স্বামীর তাড়া খেয়ে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জানতে চাইল, ‘এত তাড়া দিচ্ছ কেন? আর তা ছাড়া আমরা যাচ্ছিই বা কোথায়?’

‘তোর বাপের বাড়িতে।’

‘কিন্তু কেন?’

‘আঃ!’ সে বিরক্ত হয়, ‘অত বলার সময় নেই। পথে যেতে যেতে সব বলব। এখন চল।’

গোমতী তার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘চলো, আমি তৈরি।’

তাড়াতাড়ি ক্রাচদুটো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিল্লা! সঙ্গে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে গোমতী। মেজর ডিমেলো ওর হদিশ আর কখনও পাবেন না! ভাবতেই ভীষণ হাসি পেল তার! মেজর এখনও জানেন না কী নিয়ে গিয়েছেন। তবে অচিরেই জানবেন! গোমতীকে ছুঁয়ে ও প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে আর কোনওদিন বম্ব বানাবে না! কিন্তু মেজরের শাসানিতে ভয় পেয়ে গিয়েছিল! তা ছাড়া অতগুলো টাকার লোভও ছাড়তে পারেনি। তবু গোমতীকে দেওয়া প্রতিজ্ঞার মান রেখেছে! এমন বোমা বানিয়েছে যা দেখতে অবিকল টাইমার বম্বের মতোন। টাইমারও আছে! কিন্তু আর কিছু নেই। ও বোমা জীবনে ফাটবে না! কারণ ওর ভেতরে কিছুই নেই। টাইমার টিকটিকিয়ে একসময় থেমে যাবে। আর কিচ্ছু হবে না!

ভাবতেই একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে! আর কোনওদিন ও শহরে ফিরবে না। ওর কাছে এখন কড়কড়ে কুড়ি লাখ টাকা। তাই দিয়েই গ্রামে জমি কিনবে। চাষবাস করবে।

কিন্তু আর কোনওদিন বোমা তৈরি করবে না! কোনওদিনও না!

—

গোপন দরজা

১

রাইয়ের মৃতদেহটা আমার সামনেই পড়েছিল! পরনে আমারই উপহার দেওয়া লাল বেনারসি শাড়ি। সেই লাল শাড়িতে চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে। পুলিশ অফিসার সন্তর্পণে হত্যার অস্ত্র, তথা প্রমাণ আকৃতির অ্যান্টিক ছুরিটাকে মনোযোগ দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছিলেন। দেখতে দেখতেই বিড়বিড় করে বললেন, 'নো ফিঙ্গারপ্রিন্টস! অথচ এটা দিয়েই একাধিকবার স্ট্যাব করা হয়েছে!'

রাইয়ের গলার হিরের নেকলেসটা এখন মাটিতে অযত্নে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এই নেকলেসটা গতকালই ওকে গিফট করেছিলাম আমাদের তৃতীয় বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। রাই চিরদিনই অসম্ভব সুন্দরী! তার ওপর এই বিশেষ দিনটার জন্যই ও আরও সুন্দর করে সেজেছিল। জমকালো লাল শাড়িতে, চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া ঝলমলে হিরের হারটা পরে যখন সে রুপোলি জ্যোৎস্নার আলোয় আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন মনে হয়েছিল, ও আমার চিরপরিচিত স্ত্রী নয়! হয়তো ও রাই-ই নয়! বরং বহু পুরোনো লোকগাথায় বর্ণিত বিক্রমগড়ের রানি চন্দ্রকলা! সেই রানি চন্দ্রকলা, যাঁর রূপের খ্যাতি আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে। এই রাজবাড়ির দেওয়ালে জ্বলজ্বল করছে যে প্রাচীন সুন্দরীশ্রেষ্ঠার একাধিক তৈলচিত্র, সে যেন জীবন্ত হয়ে এসেছিল রাইয়ের মূর্তি ধরে! সেই দীঘল চোখের কোণে বিনম্র লজ্জার সঙ্গে মিশ্রিত তীর্যক দহনকারী কটাক্ষ। যক্ষিণী সুন্দরীদের মতো গর্বিত, উদ্ধত দেহসৌন্দর্য! অবিকল সেই মোহিনীমূর্তি! আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না! অস্ফুটে নিজের অজান্তেই বলে ফেলেছিলাম, 'চ-ন্দ্র-ক-লা!'

রাই হেসে উঠেছিল। কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরে মুখটা নিয়ে এসেছিল আমার মুখের খুব কাছাকাছি। ফিসফিস করে বলেছিল, 'বলুন রাজা বিক্রমনারায়ণ সিংহ।'

অদ্ভুত একটা সুখে, চরম আশ্লেষে আমার চোখ বুঁজে আসে। মনে হয়, এই মুহূর্তে প্রাচীন রাজবাড়ির বিরাট বিলাসবহুল শয়নকক্ষে কোনও সাধারণ দম্পতি নয়; স্বয়ং রাজা বিক্রমনারায়ণ সিংহ এবং তাঁর প্রিয়তমা পত্নী রানি চন্দ্রকলা বসে আছেন। আমরা কোনও সাধারণ মানব-মানবী নই! বরং এক প্রাচীন কিংবদন্তির দুই পাত্রপাত্রী।

কিন্তু তখন কে জানত যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে! রাইয়ের ভাগ্যরেখা যে রানি চন্দ্রকলার অভিশপ্ত পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করছে তা তখন আমার জানা ছিল না! একটা সুন্দর রাত কাটিয়ে দুজনেই চরম সুখ ও তৃপ্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কোথাও কোনও আশঙ্কা অনুভব করিনি। হঠাৎ আচমকা শেষরাতে রাইয়ের আর্তচিৎকার! আর সেই লোকটা...! এবং ওর হাতের রক্তাক্ত ছুরি...!

বেশ কিছুক্ষণ ঘরটাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখার পর তদন্তকারী অফিসার লাশ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পোস্টমর্টেম হবে। আমি ক্লান্ত, অসহায় চোখে দেখলাম, রাই চলে যাচ্ছে! এই তিন বছরের দাম্পত্যজীবনে কখনও ও আমাকে ছেড়ে যায়নি। কিন্তু আজ ওর মৃত্যুকঠিন, ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ও বোধহয় ভীষণ রাগ করে আমায় ছেড়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য ওর হাত স্পর্শ করেই ছেড়ে দিলাম। এত শীতল ছিল রাই! এত শীতলতা কি ছিল তার মধ্যে? রাই মানে তো ভীষণ আগ্রাসী এক দাবানল! ভীষণ উত্তপ্ত একটা মেয়ে! সে এমন হিমশীতল হয়ে গেল কী করে!

আচমকা আমার সেই গল্পটার কথা মনে পড়ল। 'স্নো কুইন'! রাই আজ সত্যি সত্যিই 'স্নো কুইন' হয়ে গিয়েছে।

'লোকটার চেহারা আপনার স্পষ্ট মনে আছে?' পুলিশ অফিসার গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'প্রয়োজন পড়লে স্কেচ তৈরি করাতে পারবেন?'

আমি স্থির দৃষ্টিতে রাইয়ের চলে যাওয়া দেখছিলাম। অফিসারের প্রশ্নটা শুনেই কেমন যেন গা শিরশিরিয়ে উঠল। মনে আছে! স্পষ্ট মনে আছে। এত সহজে কী করে ভুলে যাব লোকটাকে! ও মুখ সারাজীবনে ভুলতে পারব না। সেই জোড়া ভুরু, সেই কোটরাগত দুটো চোখ! সেই হিসহিসে কণ্ঠস্বর!

আমি মৃদু মাথা নেড়ে সায় দিলাম। লোকটার মুখ এখনও চোখের সামনে ভাসছে। স্মৃতি থেকে হাতে আঁকা ছবি কেন, যদি ফটোগ্রাফও বের করে দেওয়া সম্ভব হত, তবে তাই দিতাম।

তিনি এবার ফিরে দাঁড়ালেন রাঁধুনি পার্বতী, মালি বিরজু ও চাকর রতনের দিকে। ওদের তিনজনের পরিবারই বংশানুক্রমে এ মহলের সেবা করে আসছে। রাজা-রানিদের আমলেও ওদের পূর্বপুরুষরা এ বাড়িতে কাজ করেছে। সময় বদলেছে। কিন্তু ওদের বিশ্বস্ততা বদলায়নি।

অফিসার ভারী গলায় ধমকে বললেন, 'বাড়িতে একটা আস্ত মানুষ খুন হয়ে গেল আর তোমরা কেউ কিছু দেখতে পেলে না! ম্যাডামের চিৎকার শুনতে পাওনি? লোকটাকে এক ঝলকও দেখোনি! বললেই হল!'

তিনজনেই মাথা নীচু করে ভয়ে কাঁপছে। ওদের অবস্থা দেখে খারাপ লাগল। রতনের স্বাভাবিকভাবেই কিছু দেখতে পাওয়ার কথা নয়। তার গঞ্জিকাসেবনের অভ্যেস আছে। রাত হলেই কয়েক ছিলিম টেনে ব্যোম ভোলা হয়ে বসে থাকে। বিরজু বাড়ির বাইরে বাগান সংলগ্ন ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকে। এ মহলে কিছু ঘটলে তারও জানার কথা নয়। আর পার্বতীর ঘুম কুম্ভকর্ণকেও লজ্জা দেবে! কিন্তু ওরা যদি জেগে থাকত, তাহলেও কি দেখতে পেত? আমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অনুরণন করে উঠল সেই হিসহিসে কণ্ঠস্বর :

'গোপন দরজা স্যার! গোপন দরজা দিয়ে খুনি এসেছিল। আবার সেই পথেই পালিয়ে গিয়েছিল। একমাত্র রাজা বিক্রম সিংহ ছাড়া তাকে আর কেউ দেখতে পায়নি। রানি চন্দ্রকলার খুনি তাই কখনও ধরা পড়েনি।'

আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'গোপন দরজা!'

'গোপন দরজা!' অফিসার অবাক হয়ে এবার আমার দিকে তাকান, 'কী বলছেন! কোথায়?'

'এ বাড়িতে একটা গোপন দরজা আছে, যার খবর কেউ জানে না।' একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলি, 'আমি সঠিক জানি না। কিন্তু সেই লোকটা আমায় বলেছিল।'

'ওই লোকটা আপনাকে একটা সিক্রেট ডোরের কথাও বলেছিল! কবে? কখন?' তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! আপনার কিছু সন্দেহ হয়নি?'

'না। আমি ভেবেছিলাম লোকটা হয় পাগল, নয় বাচাল।'

'ইন্টারেস্টিং!' অফিসার আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'আর ঠিক কী কী বলেছিল লোকটা আপনাকে?'

২

'বিক্রমগড়ের রাজা ছিলেন বিক্রমনারায়ণ সিংহ। স্বভাবে চরম শৌখিন। গান-বাজনা ভালোবাসতেন। শিকার করতেন নিয়মিত। আর ভালোবাসতেন নারীর রূপ। লোকে বলে, তাঁর বেশ কয়েকজন রানি ও অঢেল উপপত্নী ছিল। তবে অতগুলো রানি ও উপপত্নী থাকা সত্ত্বেও রাজার মনে সুখ ছিল না! কারণ তাঁর কোনও রানিই তাঁকে ওয়ারিশ দিতে পারেননি। রাজা বিক্রম সিংহের দুশ্চিন্তা আর যায় না! এত বৈভব, এত সম্পদ কার জন্য রেখে যাবেন! অনেক জড়ি-বুটি খেলেন, যাগ-যজ্ঞ করালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না! যখন হতাশ রাজা প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছেন ঠিক তখনই দেখা পেলেন চন্দ্রকলার! রাজার তখন বয়েস হয়েছে। আর চন্দ্রকলা ষোড়শী! চন্দ্রকলা নয়, একেবারে পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ। রাজা একেবারে মজে গেলেন!'

কথাগুলো বলে লোকটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। ওর জোড়া ভুরু দুটো যেন আরও ঘন হয়ে এসেছে! লোকটাকে দেখতে ভারী অদ্ভুত। কপালের ওপর ভুরুদুটো দেখলে মনে হয়, কোনও শিশু বোধহয় আঁকার খাতায় সমুদ্রের ঢেউ আঁকতে গিয়ে ভুল করে ওর কপালে এঁকে দিয়েছে! চোখদুটো বসা। নাকটা খাড়া। ঠোঁটজোড়া এমনই বিপজ্জনক রকমের চওড়া যে ভয় হয়, একটু হাসলেই বুঝি মুখ ছাড়িয়ে কান পর্যন্ত চলে যাবে! এমন মুখ কার্টুন ক্যারেক্টারে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু বাস্তবে এই প্রথম দেখলাম!

'চন্দ্রকলা এতটাই সুন্দরী ছিলেন যে রাজার তাঁকে দু-চোখ ভরে দেখেও মন ভরত না। রাজা বিক্রমনারায়ণ একটু খ্যাপাটে স্বভাবের ছিলেন। তিনি প্রথমে চিত্রশিল্পী ডেকে চন্দ্রকলার ছবি আঁকালেন। নানা বিভঙ্গে আঁকা সেই সব ছবি রাজবাড়ির দেওয়ালে টাঙালেন। কিন্তু তাতেও রাজার পাগলামি গেল না। এরপর তিনি সারা বাড়িতে, ছাতে, দেওয়ালে দামি কাচের আয়না বসালেন। ফলস্বরূপ রানি চন্দ্রকলা যখন হেঁটে যেতেন, চতুর্দিকে তাঁর প্রতিবিম্ব পড়ত। এমনকি দরবারেও এমন কৌশলে আয়না বসানো হয়েছিল যে চন্দ্রকলা অন্দরমহলে থাকলেও রাজা দরবারে বসে তাঁকে দেখতে পেতেন!'

আমি মনে মনে একটু বিরক্ত হচ্ছিলাম। লোকটার ঘ্যানঘ্যান শুনতে মোটেই ভালো লাগছে না। এই মুহূর্তে একটু একা থাকতে চাইছিলাম। রাজবাড়ির সামনে চমৎকার একটা বাগান আছে। সেখানে বসে থাকতে খুব ভালো লাগছিল। শহরের কান ঝালাপালা করা যান্ত্রিক চিৎকারে অতিষ্ঠ কান এখানে বড় শান্তি খুঁজে পেয়েছে। চতুর্দিকে ফুলের মিষ্টি সুবাস এবং অনাহত নিস্তব্ধতা! এই নীরবতাকে আপ্রাণ উপভোগ করতে চাইছি। অথচ এই লোকটা কোথা থেকে হঠাৎ এসে উদয় হল। কথা নেই বার্তা নেই, দুম করে আমার পাশের চেয়ারে বসে প্রথমে খেজুরে আলাপ শুরু করল। কিছুক্ষণ এটা-সেটা বলার পর বলল, 'বিক্রমগড়ে নতুন বুঝি?'

আমি তখন নিবিষ্টমনে পাখিদের ঘরে ফিরে আসা দেখছিলাম। তারা এখন আকাশে দীঘল ডানার ছায়া বিস্তার করে দিয়েছে। সূর্যাস্তের সিঁদুরে-সোনালি আলোয় স্নান করছে গোটা প্রকৃতি। এই মুহূর্তে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিই, 'হুঁ।'

'তা কদ্দিন থাকা হবে?'

খ্যানখ্যানে গলার প্রশ্নটা ভালো লাগল না। তবু ভদ্রতাবশত বলি, 'আপাতত দিন পনেরো। তবে মাঝেমাঝে সময় পেলেই আসব।'

'অ!' স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষরটা উচ্চারণ করে ও একটু থামল। তারপর বলল, 'তার মানে ঠিকই শুনেছি। এ বাড়িটা বিক্রি হয়েছে। নিশ্চয়ই আপনিই কিনেছেন। তাই না?'

আমি ওর দিকে তাকালাম। বলা ভালো, মাপলাম। লোকটা পাজি না পাগল বোঝা মুশকিল। তবু সংক্ষেপে জানাই, 'হ্যাঁ।'

তারপর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ওর গল্প। সে গল্প আর থামেই না! অদ্ভুত লোক। শ্রোতা আদৌ শুনছে কি না সে খেয়ালও নেই। আপনমনেই ক্রমাগত বকবক করে চলেছে! যদিও ওর কাছে নতুন কিছু জানার নেই। এই রাজবাড়িতে রানি চন্দ্রকলার ছবিগুলো আর আয়নার বহর আমরা প্রথমদিনই দেখেছি। রাই কৌতূহলী হয়ে জানতে চেয়েছিল, 'এত আয়না কেন এখানে?'

রাজবাড়ির বহুবছরের বিশ্বস্ত চাকর রতন মৃদু হেসে জানিয়েছিল রাজা বিক্রমনারায়ণ সিংহ এবং রানি চন্দ্রকলার ইতিহাস! সব শুনে রাইয়ের সপাট মন্তব্য, 'রাজামশাই মোটেই পাগল ছিলেন না। বরং বহুত চালু মাল! নির্ঘাত বৌকে সন্দেহ করতেন। নিজে বুড়ো বয়েসে একটা ছুঁড়িকে বিয়ে করেছেন কি না! তার ওপর আবার ওরকম মার্ভেলাস রূপসি! সে আমলে তো সিসিটিভি ছিল না। তাই এমন করে আয়না বসিয়েছিলেন যাতে বৌয়ের ওপর প্রতিমুহূর্তে নজরদারি করা যায়।'

রতন হেসে ফেলল। তারপর জানাল, 'কী জানি ম্যাডাম। আমরা তো ছোটবেলা থেকেই বাপ-দাদার মুখে রাজা-রানির পাগলামির গল্প শুনে আসছি। এভাবে তো কোনওদিন কেউ বলেনি!'

'রাজার পাগলামি তো শুনলাম। রানির পাগলামিটা আবার কীরকম?' রাই কৌতূহলী।

'রানি চন্দ্রকলা নিজের নিখুঁত রূপ রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে দেখতে দেখতে এত বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে নিজের সুন্দর চেহারার ওপরই তাঁর ঘেন্না ধরে গেল। শেষমেশ বিরক্ত হয়ে এমন একটা আয়নার আবদার করে বসলেন যাতে তাঁকে মোটেই সুন্দর না দেখায়!'

রাই অবাক হয়েছিল। ওর সঙ্গে আমিও! অবাক হয়ে বললাম, 'এরকম আবার হয় নাকি! এ কী জাতীয় অসম্ভব আবদার!'

'রাজা-রানির ব্যাপার স্যাপার স্যার।' রতন মৃদু হাসে, 'ওঁরা কি আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষ? ওঁদের কাছে কিছুই অসম্ভব ছিল না।'

'তারপর?'

'রাজা বিক্রমনারায়ণ আর কী করেন! প্রিয় রানির আবদার বলে কথা। ফেলতে তো পারেন না। তিনি তখন অনেক খুঁজে-পেতে, প্রচুর টাকা খরচ করে একখানা অদ্ভুত আয়না আমদানি করলেন! সে আয়না এমনই যে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর জিনিসটাকেও সে আয়নায় সবচেয়ে বিচ্ছিরি দেখাবে।'

রাই প্রায় লাফিয়ে ওঠে, 'সে আয়নাটা কি এখনও আছে?'

'আছে ম্যাডাম।' সে জানায়, 'রানিমা'র মহলেই আছে। বিশ্বাস না হলে নিজেই দেখে নিতে পারেন।'

রাই তখনই আয়নাটাকে দেখার জন্য দৌড়ল। আমিও পেছন পেছন গেলাম। আয়নাটাকে দেখার কৌতূহল আমারও ছিল। শৈশব থেকে আয়না সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি। স্নো-হোয়াইটের 'ইভিল কুইন'-এর সত্যবাদী আয়না, 'স্নো কুইনে'র শয়তানি দর্পণ থেকে 'ব্লাডি মেরি', 'ব্লু বেবি' ; সব মিথই জানা ছিল। তাই এরকম একটা অদ্ভুত আয়নার কথা শুনে সেটাকে দেখার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারলাম না।

রানি চন্দ্রকলার সেই অদ্ভুতুড়ে আয়নাটাকে খুঁজে পেতে অবশ্য আমাদের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। ওটা রাজা-রানির শয়নকক্ষেই সগৌরবে বিরাজমান। দেখতে এমন কিছু নয়। আয়নাটার চতুর্দিকে রুপোর কারুকার্যমণ্ডিত ফ্রেমটা এখনও চকচকে! দেখলেই বোঝা যায় যে ওটাকে রীতিমতো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এমনিতে আর কোনও বিশেষত্ব নেই। নেহাতই আর পাঁচটা সাধারণ আয়নার মতোই। কিন্তু রাই যখন ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন আয়নায় ওর প্রতিফলন দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ! অমন সুন্দরী মেয়েটাকে কী ভয়ংকর লাগছে! কোথায় তার অগাধ সৌন্দর্য! একঝলক দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিই! কী কুৎসিত আয়নাটা! কী কদাকার তার প্রতিবিম্ব!

অদ্ভুত ব্যাপার! রাই কিন্তু তার কুৎসিত প্রতিবিম্ব দেখে একটুও ঘাবড়াল না! বরং হেসেই কুটোপাটি! হাসতে হাসতেই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখো, দেখো, আমাকে কেমন লাগছে!'

রাইকে অবিকল একটা রাগি ভামবিড়ালের মতো লাগছিল। একটা বিশ্রী রসিকতার মতো ওর প্রতিবিম্ব যেন আমায় ভেংচি কাটছে। বিরক্ত হয়ে বলি, 'রানি চন্দ্রকলার রুচির প্রশংসা করা যাচ্ছে না। এত টাকা দিয়ে এরকম কুৎসিত জিনিস আমদানি করার কোনও মানে হয়!'

'রিল্যাক্স সোনা।' রাই নরম হাসল, 'এটা জাস্ট একটা রিফ্লেকশন। আসলে কাচটায় কিছু কারিকুরি আছে। দেখোনি, উত্তল, অবতল আয়নায় মানুষের মুখের ধরন কেমন পালটে যায়? কখনও মুখটা হাঁড়ির মতো দেখায়, কখনও বাঁশের মতো লম্বাটে। এটাও সেরকমই কিছু। জাস্ট সায়েন্স।'

'যাই হোক!' আমি আস্তে আস্তে বলি, 'তুমি এটার সামনে আর দাঁড়িও না রাই। আমার ভালো লাগছে না।'

'আমার তো ভারী মজা লাগছে।' ও ওর চিরপরিচিত ছেলেমানুষি ঢঙে ঘাড় কাত করে বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা বলো। আমি যদি সত্যিই ওই রিফ্লেকশনটার মতো দেখতে হতাম, তবে কি তুমি আমায় এমন করে ভালোবাসতে?'

ওর প্রশ্নটা আমায় আঘাত করল! এই তিন বছরের দাম্পত্যজীবনে আমাদের দুজনকেই অনেক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু এরকম মোক্ষম প্রশ্নের সামনে কখনও দাঁড়াতে হয়নি! টের পেলাম, মনের মধ্যে একটা অশুভ আশঙ্কা ফণা বিস্তার করছে। মনে পড়ে যাচ্ছিল 'স্নো কুইন' গল্পের সেই আয়নাটার কথা! সেই আয়নাটাও সব সুন্দরকে কুৎসিত করে দিত! সেই আয়নার কাচের টুকরো যার চোখে বা হৃদয়ে প্রবেশ করত, তার হৃদয় হয়ে যেত বরফের মতো শীতল। কঠিন, প্রেমহীন ও নিষ্ঠুর! তার চোখ দুনিয়ার কোনও সৌন্দর্য আর দেখতে পেত না! সব সুন্দরকেই সে কুৎসিত দেখত!

আমার ভয় হল, রাইয়ের সঙ্গেও তেমন কিছু ঘটবে না তো! তাকিয়ে দেখলাম ওর চোখে ইতিমধ্যেই একটা নিষ্ঠুর কৌতুক ঝিকমিক করছে। ও জানে, এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না।...

'কী ভাবছেন স্যার?'

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। লোকটার কথায় সংবিৎ ফিরল। তাকিয়ে দেখি, সে অদ্ভুত ভাবে হাসছে। হাসতে হাসতেই বলল, 'আপনার স্ত্রীর খুব পছন্দ না আয়নাটা? প্রায়ই ওটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন; তাই না?'

আমি চমকে উঠলাম! লোকটা একথাটা জানল কী করে! সত্যিই রাই সময় পেলেই ওই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আজকাল এটা ওকে প্রায় নেশার মতো আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! এমনকি গভীর রাতেও অনেক সময় ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করেছি যে রাই আয়নাটায় ওর প্রতিফলন দেখছে। আমার ভয় হয়...! খুব ভয় হয়...!

'ওই আয়নার সামনেই রানি চন্দ্রকলার মৃতদেহটা পড়ে ছিল!' লোকটা বিড়বিড় করে বলে, 'চন্দ্রকলা তখন গর্ভবতী ছিলেন। অবশেষে রাজা বিক্রম সিংহের এতদিনের আশা পূর্ণ হতে চলেছিল! সেই আনন্দে মহাভোজ হল! গোটা বিক্রমগড় উপস্থিত ছিল সেই অনুষ্ঠানে। রানি চন্দ্রকলাকে সেদিন স্বর্গের দেবীর মতো দেখাচ্ছিল। তিনি পরিপূর্ণ নারীত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। মা হতে চলেছিলেন। অথচ...!'

সে একটু থেমে যোগ করল, 'আপনার স্ত্রীও তো...!'

আবার চমক! কে এই লোকটা! অন্তর্যামী? রাই যে অন্তঃসত্ত্বা এ খবরটা আমরা এখনও পর্যন্ত আমাদের পরিবারের কাউকে বলিনি। অথচ এই লোকটা ওই গোপনতম কথাটাও জানে! তা ছাড়া ও কী বলতে চায়! আমার মনের মধ্যে আবার সেই অশুভ আশঙ্কা জাঁকিয়ে বসল। কোনওমতে বললাম, 'কী বলতে চাইছেন?'

'একটা গোপন দরজার কথা।' সে মুচকি হাসল, ''গোপন দরজা স্যার! সেই গোপন দরজা দিয়ে খুনি মহলের ভেতরে এসেছিল। আবার সেই পথেই পালিয়ে গিয়েছিল। একমাত্র রাজা বিক্রম সিংহ ছাড়া তাকে আর কেউ দেখতে পায়নি। রানি চন্দ্রকলার খুনি তাই কখনও ধরা পড়েনি।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। লোকটা কি সত্যিই খাপছাড়া কথা বলছে? না কি...!

৩

'ওই একবারই দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে?' অফিসার কৌতূহলী স্বরে জানতে চান, 'নাকি পরে আবার দেখেছিলেন?'

আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। রাইয়ের মৃত্যুটা আমাকে বিধ্বস্ত, বিপন্ন করে দিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, একটা জোরদার ভূমিকম্প এসে আমার স্বপ্নের বাড়িটাকে দুমড়ে মুচড়ে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে! সেই কম্পন এখনও বুকের ভেতরে টের পাচ্ছি। কোনও রিখটারস্কেলে সেই কম্পনকে মাপা যায় না। শুধু বুঝতে পারছি, অভ্যন্তরে কিছু ভেঙে যাচ্ছে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে!

আমি ক্লান্ত চোখ তুলে তাকালাম ওঁর দিকে। কিন্তু জবাব দেওয়ার আগেই এবার রতন কুণ্ঠিত স্বরে বলল, 'স্যার...!'

অফিসারের দৃষ্টি রতনের দিকে নিবদ্ধ হয়, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ স্যার।' সে ঢোঁক গিলে বলে, 'খুনের সময়ে আমি কাউকে দেখতে পাইনি ঠিকই। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই একটা বিটকেল দেখতে লোক বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল। সাহেব যেমন বলছেন, অবিকল তেমনই! আমি তো প্রথমে দেখেই আঁতকে উঠেছিলাম! ভেবেছিলাম, বোধহয় কোনও ভয় দেখানো মুখোশ পরেছে!'

'আই সি!' অফিসারের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'লোকটাকে এর আগে কখনও দেখেছ? ও কি বিক্রমগড়ের লোক?'

'বিক্রমগড় খুব ছোট জায়গা স্যার। এখানে সবাই সবাইকে চেনে। আমি জন্ম থেকে এখানেই আছি।' রতন বলল, 'কিন্তু এই লোকটাকে কখনও দেখিনি। সত্যি কথা বলতে ওরকম ভয়ংকর মুখ আমি জন্মেও দেখিনি। আর যাই হোক, ও বিক্রমগড়ের লোক নয়।'

'হুঁ।' তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তবে তুমি লোকটাকে চেপে ধরলে না কেন? জানতে চাইলে না কেন যে এই বাড়ির চতুর্দিকে ওর ঘুরঘুর করার উদ্দেশ্য কী?'

রতন একটু থেমে সসঙ্কোচে বলে, 'আমি ওকে বিরজুর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম ও হয়তো বিরজুর চেনা কেউ হবে। তাই আর কিছু বলিনি।'

অফিসারের সপ্রশ্ন দৃষ্টি এবার বিরজুকে স্পর্শ করেছে। তিনি কিছু বলার আগেই বিরজু হাঁউমাউ করে উঠল, 'মাইরি বলছি হুজুর! আমি ওই লোকটাকে আগে কখনও দেখিনি। কিছুদিন আগে ওঁকে সাহেবের সঙ্গে বাগানের চেয়ারে বসে থাকতে লক্ষ করেছিলাম। তাই ভেবেছি হয়তো উনি সাহেবের বন্ধু হবেন। ভদ্রলোক নিজেও তাই বলেছিলেন'।

'ইন্টারেস্টিং! কী বলেছিলেন উনি তোমাকে?'

বিরজু একটু ভেবে বলে, 'বলেছিলেন যে উনি সাহেবের পরিচিত। আমার কাছে এই মহলের ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে চাইছিলেন। আর জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে গোপন দরজাটা ঠিক কোথায়!'

'আবার সেই গোপন দরজা!' তিনি মাথা ঝাঁকালেন, 'তুমি কী বললে? সত্যিই কি এখানে কোনও গোপন দরজা আছে?'

সে দু-হাত জোড় করে গড়রুপক্ষীর মতো ভঙ্গি করে বলল, 'হুজুর, আমি এখানে মালির কাজ করি। বাইরে, বাগানে থাকি। বাড়ির ভেতরে আসা-যাওয়া নেই। মহলের ভেতরের খবর রাখব কী করে? তবে এরকম পুরোনো রাজবাড়িতে শুনেছি গুপ্ত কুঠুরি, দরজা, গুম ঘর-টর থাকে! এখানে থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু থাকলেও সেটা আমার জানার কথা নয়। ওই বাবুকেও আমি একই কথা বলেছিলাম। উনি আমাকে দরজার খোঁজ করার জন্য জোরাজুরিও করেন। এমনকি দরজাটা খুঁজে দিতে পারলে অনেক টাকাও দেবেন বলেছিলেন।'

'তুমি দরজাটা খুঁজে বের করেছিলে?' অফিসারের কণ্ঠস্বরে সন্দেহের ছায়া প্রকট।

বিরজু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'বিশ্বাস করুন হুজুর। মা কালীর দিব্যি, আমি ওসব পারি না। ছাপোষা মানুষ। বাগানের দেখভাল করি। ওসব দরজা-টরজা খুঁজে বেড়ানো আমার কাজ নয়! তার ওপর এই এতবড় মহলে দরজা-জানলার কোনও শেষ নেই! এর মধ্যে কোথায় কোন দরজা লুকিয়ে আছে তা খুঁজে বের করা কি আমার সাধ্যি?'

অফিসারের মুখ দেখে মনে হল রতন আর বিরজুর কথা তাঁর আদৌ বিশ্বাস হয়নি। তিনি হয়তো ওদের দুজনকেই সন্দেহ করছেন। আমার মনেও একটা প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা উঁকি মারল। ওদের কারোর সঙ্গে লোকটার যোগসাজশ নেই তো! ওরা দুজনেই বহুবছর ধরে এ মহলে আছে। ওদের বাপ-দাদারাও এ বাড়িতে চাকরি করেছে। তাই গুপ্ত কুঠুরি, বা গোপন দরজার খবর জানা ওদের পক্ষে অসম্ভব নয়! টাকার লোভে ওরাই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তো?

'আপনাদের একবার আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।' শীতল স্বরে বললেন অফিসার; 'লোকটার স্কেচ করানো জরুরি। আপনারা তিনজনেই ওই লোকটিকে দেখেছেন। তাই...।' একটু থেমে আমার কাছে এসে যোগ করলেন, 'আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদেরও তো তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। এটা একটা মার্ডার কেস।'

'ইটস ওকে অফিসার।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই। ব্যাপারটা তিক্ত হলেও সত্য যে, এই মুহূর্তে ওঁর চোখে রতন এবং বিরজুর চেয়েও বেশি সন্দেহভাজন স্বয়ং আমি! স্ত্রী মারা গেলে প্রাথমিক সন্দেহটা চিরদিনই স্বামীর ওপর পড়ে। আমি বুঝতে পারছিলাম, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

৪

'রানি চন্দ্রকলা কেন ওই কুৎসিত আয়নাটাকে আমদানি করেছিলেন বলুন তো?'

লোকটার প্রশ্নে আমি বিরক্ত হলাম। তার সঙ্গে একটু সতর্কতাও অবলম্বন করতে হল। কারণ আমি কিছু বললেই ও ফের গ্রামাফোন রেকর্ডের মতো বাজতে শুরু করবে। সত্যি কথা বলতে কী, রানি চন্দ্রকলাকে নিয়ে আমার বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই! ওসব রাজা-রানিদের কিসসা ঢের শুনেছি। এ লোকটা কি আমায় বাচ্চা পেয়েছে যে রূপকথার গপ্পো শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখবে! আর ওর মতো বে-আক্কেলে লোক আমি আর দেখিনি। যখনই বাগানে বসে সন্ধ্যার সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাই, তখনই ব্যাটা যেন মাটি ফুঁড়ে এসে হাজির হয়! এবং যথারীতি জ্বালাতে শুরু করে!

আমি স্বাভাবিকভাবেই নিরুত্তর হয়ে বসে রইলাম। লোকটা চোখ পিটপিট করে আমাকে ভালো করে জরিপ করে নিয়ে বলল, 'আপনার কী মনে হয়? এটা নেহাতই একটা খেয়াল?'

এবার একটু কঠিন স্বরে বললাম, 'আমার কিছুই মনে হয় না। ওসব নিয়ে আমি ভাবি না।'

ও একটু অর্থপূর্ণ হাসল। তারপর বলল, 'আপনি দেখতে ভারী সুন্দর। যদি একটু কুৎসিত হতেন, এই আমার মতো দেখতে হতেন, তবে নিশ্চয়ই ভাবতেন।'

'মানে?' ওর কথাটা শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। ইচ্ছে করছিল ব্যাটাকে এখনই অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করি। কিন্তু সে ইচ্ছে মনের মধ্যেই চেপে রাখলাম।

'মানে চন্দ্রকলা কুৎসিত জিনিস পছন্দ করতেন! সেই জন্যই আয়নাটাকে আনিয়েছিলেন। কুৎসিতের প্রতি সব সুন্দরী নারীরই একটা অমোঘ আকর্ষণ থাকে। সব সুন্দরীই আসলে মনে মনে একজন কুদর্শন পুরুষকে কামনা করে। ওদের একটা অদ্ভুত মোহ থাকে। চতুর্দিকে অঢেল সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে যায়। বুঝলেন...?' লোকটা বলেই চলল, 'সৌন্দর্য যখন কমন জিনিস হয়ে দাঁড়ায়, তখন কদাকারকেই আনকমন মনে হয়! আর মেয়েরা সবসময়ই আনকমনের পূজারি!'

কী অদ্ভুত থিওরি! আমার রীতিমতো হাসি পেল! যদি সত্যিই তাই হত, তবে রাই আমাকে বিয়ে করত না। আমি এবং আমার বহুদিনের বন্ধু কাম বিজনেস পার্টনার প্রণব একসঙ্গে রাইয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। কিন্তু প্রণব দেখতে সত্যিই কুদর্শন ছিল! লোমশ গরিলার মতো দানবীয় চেহারা, কুচকুচে কালো রং, মাথার টাকটা কালাহারি মরুভূমির মতো সর্বগ্রাসী ভঙ্গিতে ক্রমাগতই এগিয়ে চলেছে! ওর পাশে স্মার্ট ঝকঝকে চেহারার আমি তো রীতিমতো রাজপুত্রের সামিল! স্বাভাবিকভাবেই রাই আমাকেই বেছে নেয়। অবশ্য তাতে আমার আর প্রণবের সম্পর্কে ভাঙন ধরেনি। ও ব্যাপারটাকে খুব স্পোর্টিংলি নিয়েছিল। আমার বিয়েতে সবচেয়ে বেশি লম্ফঝম্ফ ও-ই করেছিল। এমনকি আজও আমার বাড়িতে প্রণবের অবাধ আসা-যাওয়া।

'আপনি ওথেলোর গল্প শোনেননি? সুন্দরী ডেসডিমোনা কেন তাঁর প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছিল বলুন তো?' লোকটার বকবক আর থামে না, 'কিংবা 'দ্য হাঞ্চব্যাক অফ নোতরদামের' কুঁজো, কুদর্শন কুয়াসিমোডোকে মনে আছে? সুন্দরী এসমারেলডা আর তার প্রেমকাহিনি? 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট' পড়েছেন নিশ্চয়ই। অথবা 'শ্রেক' দেখেছেন? রাজকুমারী ফিওনা এক বিতিকিচ্ছিরি রাক্ষসকে ভালোবেসেছিলেন! কেন বলুন তো?'

'জানি না।' একটু কঠোর স্বরে বললাম, 'জানতেও চাই না।'

লোকটা কেমন অদ্ভুত ভাবে খিঁক খিঁক করে হাসল, 'তার কারণ নায়কেরা সবাই হতকুচ্ছিত ছিলেন। আর সুন্দরী মেয়েরা অসুন্দরকেই বেশি পছন্দ করে। এটাই নিয়ম!'

নিকুচি করেছে নিয়মের! আমি এবার বিরক্তি প্রকাশ না করে আর পারলাম না। তিতো গলায় বললাম, 'যদি কিছু মনে না করেন, এই মুহূর্তে আমি একটু একা থাকতে চাইছি।'

'অবশ্যই একা থাকবেন।' বলতে বলতেই সে উঠে দাঁড়াল। কান এঁটো করা হাসি হেসে বলল, 'রাজা বিক্রমনারায়ণ সিংহ রীতিমতো সুদর্শন পুরুষ ছিলেন! আর আপনিও...!'

কথাটা শেষ করেই লোকটা যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল!

ততক্ষণে চারপাশে ছায়াঘেরা আঁধার নেমে এসেছে। পাখিরা ফিরে গিয়েছে নীড়ে। আশেপাশে ঝিঁঝির ডাকও শুনতে পাচ্ছি। শান্ত, স্তিমিত স্ফুলিঙ্গ নিয়ে জোনাকিরা টুপটুপ করে জ্বলছে-নিভছে। কোথা থেকে যেন সন্ধ্যারতির সুমধুর শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল! এখন চতুর্দিকে জমাট অন্ধকার। বাগানে বসে থাকলে মশা কিংবা অন্যান্য কীট-পতঙ্গের কামড় খাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। তাই বাধ্য হয়েই উঠে পড়লাম।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে বেডরুমের দিকে যেতে যেতেই একটা অদ্ভুত গন্ধ নাকে এসে ঝাপ্টা মারল। পাখির দানা, শুকনো ফুল আর সুগন্ধী মোমবাতির মিশ্রিত সুবাস! সারা মহলে জ্বলজ্বল করছে বিজলিবাতি। অর্থাৎ কারেন্ট আছে। তবে মোমবাতি কে জ্বালল! অবাক হয়ে বেডরুমের দিকে তাকাই। একমাত্র সেখানেই ইলেক্ট্রিকের তীব্র আলো নেই। বরং অদ্ভুত স্নিগ্ধ আলোয় ঘরটা ভরে আছে। রাই মোমবাতি জ্বেলেছে নাকি! কেন? ফিউজ উড়ে যায়নি তো!

ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলাম বেডরুমের দিকে। রাইয়ের আবার লোডশেডিং বা অন্ধকার বিশেষ পছন্দ নয়। যদি ফিউজ উড়ে গিয়ে থাকে তবে এখনই রতনকে বলতে হবে। কে জানে, ইলেক্ট্রিসিটির অভাবে আবার আমার মহিষী গোঁসায় নাকের পাটা ফুলিয়ে বসে আছেন কি না!

নাঃ, রাই রাগ করেনি। ফিউজও যায়নি। ঘরে ঢুকে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমারই ফিউজ উড়ে যাওয়ার উপক্রম!

রাই ঘরে প্রচুর মোমবাতি জ্বেলে রেখেছে! নানা রঙের মোমগুলোর আলো একসঙ্গে মিলেমিশে সোনালি প্রভা তৈরি করেছে! সেই অপূর্ব বিচ্ছুরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ও। মনে হচ্ছে গুঁড়ো গুঁড়ো সোনালি অভ্র চিকমিক করছে ওর মুখে, দুই বাহুতে, সারা গায়ে। রাইয়ের চোখে অদ্ভুত মোহ-মদির দৃষ্টি! ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেই আয়নাটার দিকে! দু-চোখে পরম ভালোবাসা নিয়ে দেখছে ওর বিকৃত প্রতিবিম্বকে!

আমি স্তম্ভিত!

৫

'তাহলে পুলিশকে আমার স্কেচ দিয়েই এলেন শেষ পর্যন্ত!'

এই মুহূর্তে আমি আবার সেই লোকটার মুখোমুখি! সেই লোকটা! সেই খুনি! আমার রাইয়ের হত্যাকারী! একদম আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইচ্ছে করলেই ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। কেটে-ছিঁড়ে কুচি কুচি করতে পারি। নিষ্ঠুর হাতে কেটে দিতে পারি শয়তানটার গলার নলি...!

একটু আগেই পুলিশ স্টেশন থেকে ফিরেছি। অফিসার আর্টিস্টকে দিয়ে স্কেচ তৈরি করিয়েছেন। আমি দেখলাম এক অদ্ভুত ম্যাজিকে সাদা পাতায় অবিকল ফুটে উঠেছে সেই মুখ! সেই জোড়া ভুরু, কোটরাগত চোখ, প্রসারিত ঠোঁট! সেই শয়তানটা...!

তিনি ছবিটা রতন আর বিরজুকে দেখালেন, 'এই লোকটাকেই তোমরা দেখেছিলে? শিওর?'

ওরা দুজনেই সম্মতি জানাল। অফিসার আরেকবার স্কেচটার দিকে তাকিয়ে কনস্টেবলকে ছবিটা দিয়ে দিলেন, 'এটা ইমিডিয়েটলি গোটা বিক্রমগড় আর আশেপাশের সমস্ত এলাকায় সার্কুলেট করাও।'

'ওকে স্যার।' একটা স্যালুট ঠুকে কনস্টেবল ছবিটা নিয়ে হুকুম তামিল করতে চলে গেল। অফিসার এবার আমার দিকে ফিরলেন, 'আপনার বাড়িটা আমরা কাল খুঁজে দেখব। সিক্রেট ডোরটা যদি থেকে থাকে তবে সেটা খুঁজে পাওয়া জরুরি। আশা করি আমাদের সার্চ করতে দিতে আপনার কোনও আপত্তি নেই।'

'নো অফিসার।' আমি সম্মতি জানালাম।

'ঠিক আছে।' তিনি একটু ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'এখন আপনারা যেতে পারেন। বডি পোস্টমর্টেমের পর পেয়ে যাবেন। তবে যতক্ষণ না তদন্ত শেষ হচ্ছে, শহর ছেড়ে যাবেন না।'

এই সব নিয়মকানুন আমি খুব ভালো করেই জানি। তাই পুলিশকে সবরকম সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ফিরে এলাম রাজমহলে।

কিন্তু তখন কে জানত যে পুলিশ যাকে তন্নতন্ন করে চতুর্দিকে খুঁজছে, যার নামে হুলিয়া জারি করেছে, সে স্বয়ং আমার শয়নকক্ষেই অপেক্ষা করছে আমার জন্য! খুনি আর কোথাও নয়, একদম মার্ডার স্পটেই উপস্থিত। ও ফিরে এসেছে এখানেই! কী করতে এসেছে?...

'ওরা বিশ্বস্ত। তাই না?' লোকটা হাসল। মনে হল ওর ঠোঁটদুটো মুখের বেড় ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাবে। মৃদু হাসতে হাসতে বলল, 'ওদের পূর্বপুরুষরাও এমনই বিশ্বস্ত ছিল।'

আমি ওর দিকে অনির্বাণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। এই আমার রাইয়ের খুনি! ও আমার প্রেমের বুকে ছুরি বসিয়েছে। অথচ আশ্চর্য! আমার মধ্যে কোনও রাগ নেই! কোনও প্রতিশোধস্পৃহা নেই! সমস্ত অনুভব যেন বরফের মতো শীতল! হৃৎপিণ্ডটা বুঝি বরফ হয়ে গিয়েছে।

'রাজা বিক্রম সিংহ জানতেন যে তিনি কখনও সন্তানের জনক হতে পারবেন না'। লোকটার মুখের প্রত্যেকটা শব্দ যেন ছুরির মতো বারবার আমার বুকে কোপ বসাচ্ছে, 'আর আপনি?'

আমি যথারীতি নিরুত্তর। কিছু কিছু কথা প্রকাশ্যে না আনাই ভালো। সেগুলোকে সবসময় গোপন দরজার পেছনেই রাখতে হয়!

আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইয়ের খুনি। অবিকল সেই মুখ! সেই ভয়ংকর জোড়া ভুরু, সেই বসা চোখ! একটু আগেই পুলিশ স্টেশনের আর্টিস্টকে ওর বর্ণনা দিয়ে এসেছি আমি। এই মুহূর্তে ও

দাঁড়িয়ে রয়েছে একদম মুখোমুখি। আমাদের বেডরুমের আয়নার ভেতরে। সেই আয়না, যাতে সবকিছুই কুৎসিত দেখায়। ওই আয়নায় দাঁড়িয়েই এখন হাসছে আমার বিকৃত প্রতিবিম্ব! মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে শুনতে পেলাম তার হিসহিসে কণ্ঠস্বর :

'এবার বুঝেছেন কি যে গোপন দরজাটা ঠিক কোথায়?'

—

গুংগার গাছ

১

হঠাৎ একদিন বাজ পড়ে গাছটা পুড়ে গেল!

কয়েকদিন ধরেই তুমুল ঝড়বৃষ্টি চলছিল। খ্যাপা হাতির দঙ্গলের মতো হাওয়া তছনছ করে বেড়িয়েছে গোটা গ্রাম। উড়ে গেছে খড়ের চালা! দরমার বেড়া ভেঙে গেছে! ঘরবাড়ি বিপর্যস্ত!

এ গ্রামে শিবু মহাজন ছাড়া আর কারুর পাকা বাড়ি নেই। ভয়ার্ত বিপন্ন মানুষগুলো প্রথমে সেখানেই আশ্রয় চাইল। সেখান থেকে গলাধাক্কা খেয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিল মহাকালীর মন্দিরে। বহুদিনের পুরোনো মন্দির। একসময়ে হয়তো শক্তপোক্তই ছিল। এখন তার অবস্থাও নড়বড়ে। ইঁট কাঠ পাথর সর্বস্ব শুধু প্রাচীন ফসিলটাই পড়ে আছে। থাকার মধ্যে রয়েছে মহাকালীর ভাঙাচোরা একটি বিগ্রহ আর একটা জংধরা ত্রিশূল।

গ্রামের অসহায়, ঘরছাড়া মানুষগুলো সেই জরাজীর্ণ কঙ্কালকেই আঁকড়ে ধরে অনাহারে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিল। পেটে ভাতের এক কণাও নেই, তেষ্টা পেলে খাবার জল নেই, তবু মাথার উপরে একটা ছাত তো আছে! যদিও তার তলার মানুষগুলো মুহুর্মুহু ঝড়ের প্রচণ্ড দাপটে থরথর করে কেঁপে ওঠা ছাতের শব্দ শোনে। আর প্রমাদ গোনে, এই বুঝি ছাতটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তাদের উপরে!

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল দেবী মহাকালী এখনও মহাজনদের দলে ভেড়েননি। তাঁর দয়ায় মানুষগুলোর প্রাণ বাঁচল। চার দিন, চার রাত্তির বজ্রবিদ্যুতে সবাইকে ধমকে চমকে দিয়ে, গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবন ছারখার করে অবশেষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিদায় নিল। কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে দিয়ে গেল শেষ কামড়! মধ্যরাত্রে আধোতন্দ্রায় থাকা মানুষগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে গ্রামের প্রান্তসীমায় সেদিন একটা পেল্লায় বাজ পড়েছিল। লোকগুলো তার বিকট আওয়াজে ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে মনে মনে ইষ্টনাম জপ করতে শুরু করে। অমন একটা বাজ যদি মন্দিরের উপরও পড়ে তাহলে আর রক্ষে নেই!

শেষ পর্যন্ত দেবীর অসীম কৃপায় কোনও অনর্থ হয়নি। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল। পরের দিন সকাল থেকে আবার সব স্বাভাবিক। মেঘ কেটে গিয়ে সোনালি রোদ্দুর উঠেছে। গ্রামবাসীরা আশ্বস্ত হয়ে নিজের নিজের ঘরের দিকে ফিরতে শুরু করে। ঘর তো তখন আর ঘর নেই! সব ধ্বংসস্তূপ! অবস্থা দেখে সবার মাথায় হাত! আপাতত প্রাণ বাঁচলেও মাথা গুঁজবে কোথায়, খাবে কী তার ঠিক নেই! মুখে শত দুশ্চিন্তার কাটাকুটি নিয়ে নীরবে, পরিশ্রান্ত দেহে ফিরে আসছিল তারা।

এমন সময়েই পরিষ্কার আকাশ থেকে যেন আচমকা ফের একটা বাজ এসে পড়ল তাদের মাথায়! এ কী! এমন সম্ভাবনার কথা তো দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি! গ্রামের প্রান্তসীমায় ডালপালা মেলে এতদিন

দাঁড়িয়েছিল গুংগার গাছ! সেটা কোথায়! কী সর্বনাশ!

তারা হাঁ করে দেখল গাছটা যেন ন্যাড়া হয়ে গেছে! তার মস্ত বড় বহর, বিস্তৃত ডালপালা শুকিয়ে এইটুকু! আগের রাতে যে মোক্ষম বাজটা পড়েছিল তার ধাক্কাতেই অতবড় বটগাছটা পুড়ে ছারখার!

দৃশ্যটা দেখে সবাই থ! কারুর মুখে কোনও কথা নেই। শুধু গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি, নারায়ণ দাদু বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'সর্বনাশ! মহা সর্বনাশ!'

ছোট্ট পাঁচু নারায়ণ দাদুর কথা বুঝতে পারেনি, 'কী হয়েছে দাদু?'

দাদু গাছটার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'সনাতন গুণিন ওই গাছটার সাথে গুংগাকে বেঁধে রেখেছিল। এখন গাছটাও পুড়ে গেল! গুংগা ছাড়া পেয়ে গেছে। সারা গ্রামের উপর এবার মহা সর্বনাশ আসতে চলেছে!...মহা সর্বনাশ!'

—'গুংগা কে?'

চতুর্দিক থেকে 'চুপ চুপ' ধ্বনি উঠল। নারায়ণ দাদু বললেন, 'নাম নিস না পাঁচু। নাম নিলে ওদের শক্তি আরো বাড়ে।'

—'কার শক্তি বাড়ে?'

দাদু কোনও কথা না বলে তাঁর নীলাভ ধূসর চোখদুটো রেখেছিলেন পাঁচুর চোখের উপরে। সেই দৃষ্টিতেই পাঁচুর বুকের ভিতরটা শিমশিম করে উঠেছিল! অভুক্ত, অবসন্ন ছেলেটার মনে হয়, নিশ্চয়ই গুংগা কোনও ভয়ংকর কিছু। জন্ম থেকেই সে গুংগার গাছটাকে দেখে আসছে। কিন্তু কেন ওটার নাম 'গুংগার গাছ' তা তাকে কেউ বলেনি। যখনই জিজ্ঞাসা করেছে তখনই সবাই মিলে সভয়ে 'চুপ চুপ' করে উঠেছে। কৌতূহলী চোখে সে লক্ষ করেছে, একটা মোটা লাল রঙের দড়ি দিয়ে বটগাছটা বাঁধা! এমন ভাবে দড়িটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে আটকানো যে দেখলেই সন্দেহ হয়, শুধু গাছ নয়; গাছের সাথে আরও কাউকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

এতদিনে জানল যে গুংগাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল গাছটার সঙ্গে। কিন্তু গুংগা কে? কোনও বদমায়েশ লোক?

সে কথা জিজ্ঞাসা করতেই নারায়ণ দাদু ফের ফিসফিস করে উঠলেন, 'চুপ কর পাঁচু। ওদের বদমায়েশ বলতে নেই। এতদিন বাঁধা ছিল। এখন ছাড়া পেয়ে কী করবে ঠিক নেই। ওরা সব জায়গায় থাকতে পারে। হয়তো তোর পেছনে দাঁড়িয়েই সব শুনছে। যদি শোনে তুই ওকে 'বদমায়েশ' বলছিস...!' বলতে বলতেই ডানহাতটা কপালে ছোঁয়ালেন, 'দুগ্গা...দুগ্গা...।'

তাঁর আশঙ্কা যেন আতঙ্ক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। শীর্ণ মানুষগুলোর মুখ ভয়ে চুপসে গেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে যদিও বা রক্ষা পাওয়া গেল, গুংগার হাত থেকে বুঝি আর রক্ষা নেই!

২

গ্রামের নাম শিবনারায়ণপুর।

এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই আরেক পশ্চিমবঙ্গ আছে যার খোঁজ খুব কম লোকেই রাখে। বেশির ভাগ লোকই সেই পশ্চিমবঙ্গকে চেনে না। শুধু কোনও কারণে সেখানে সাঙ্ঘাতিক কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তবেই খবরের কাগজের পাতায় তার নাম জানা যায়। শহরের মানুষ গরম গরম চায়ের সাথে খবরের কাগজে সেই অঞ্চলের কথা পড়ে আর ভাবে, ‘আরে, এমন জায়গাও পৃথিবীতে আছে নাকি!’ তারপর অবশ্যম্ভাবী ভাবেই তার কথা ভুলে যায়।

শিবনারায়ণপুর তেমনই অচেনা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ছোট্ট একটা গ্রাম। দশ বছর আগে দুর্ভাগ্যবশত খবরের কাগজে তার নাম দু-একবার এসেছিল। কলকাতায় যখন নানারকমের দেশি-বিদেশি খাবারের ভান্ডার উপছে পড়ছে, ঠিক তখনই শিবনারায়ণপুরে দুর্ভিক্ষ তার মরণখেলা দেখাচ্ছিল। না খেতে পেয়ে এ গ্রামের মানুষেরা মারা পড়ছিল। আঞ্চলিক অথবা ‘ম্যান মেড’ দুর্ভিক্ষে ঘর কে ঘর উজাড় হয়ে গিয়েছিল তখন।

গুংগার কাহিনি তখনকারই। জ্যান্ত অবস্থায় সে এক বোবা-কালা নিরীহ মানুষ ছিল। তার ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ওই বটগাছটায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল সে। বেঁচে থাকতে তাকে কেউ চিনত না। কিন্তু মৃত্যুর পর সে নিজেকে চেনাতে শুরু করল।

সরকারি সাহায্য যতক্ষণে এসে পৌঁছল, ততক্ষণে না খেতে পেয়ে প্রায় অর্ধেক গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছে। যারা বেঁচেছিল তারা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল। সে অত্যাচারও অনেকের সহ্য হল না। বিষাক্ত খাবারের বিষক্রিয়ায় মারা গেল আরও অনেকেই। কেউ কেউ পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল, কেউ ভিটেমাটির মায়ায় গ্রাম ছেড়ে পালাতে পারল না। শেষ পর্যন্ত মাত্র কয়েকঘর মানুষ দুর্ভোগ ও রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে টিঁকে থাকল ওখানেই। আস্তে আস্তে খানিকটা স্বাভাবিক হল জনজীবন।

কিন্তু এই ঘটনার বছরখানেক পর থেকেই শুরু হল আরেক উপদ্রব!

গুংগা, তথা বোবা লোকটার আসল নাম কেউ জানত না। বেশির ভাগ লোকই তাকে গুংগা নামে চিনত। আর যারা ওর আসল নাম জানত, তারা সকলেই দুর্ভিক্ষে ফৌত হয়ে গেছে। লোকটা না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরও ওর অনির্বাণ খিদের জ্বালা শান্ত হয়নি। বিন্দিপিসির বুড়ো মোরগটা প্রথমে নিখোঁজ হয়েছিল, না রাসুখুড়োর কচি পাঁঠাটা; তা নিয়ে অনেক মতান্তর আছে। যাই হোক, দুটোকেই শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল ওই বটগাছটার নীচে। বলাই বাহুল্য আস্ত অবস্থায় নয়। মোরগটার ঝুঁটি, পালক আর কিছু হাড়গোড় এবং পাঁঠাটার স্রেফ মুন্ডু আর ল্যাজই বাকি ছিল! বাদবাকিটা যে কোথায় গেল কে জানে।

সেই শুরু। তারপর ক্রমান্বয়ে একে একে লোপাট হতে শুরু করল নানারকমের খাদ্যবস্তু। নারায়ণ দাদুর হাঁস, পান্তজেঠুর মাচার আস্ত কুমড়ো, শিবু মহাজনের রান্নাঘর থেকে একটা আস্ত তাজা রুই হাওয়া হল! শুধু তাই নয়, সুবল চাষি সারাদিন মাঠে খেটে দুপুরবেলায় ওই বটগাছের ছায়াতেই বসে দুপুরের ভাত খাচ্ছিল। খাওয়া বলতে দু-মুঠো ভাত, নুন আর কাঁচালঙ্কা। সবে এক গরাস ভাত মুখে তুলতে যাবে, এমন সময় মাথার উপরে কী যেন অদ্ভুত একটা শব্দ! মুখ তুলে যা দেখল, তাতে তার

রক্তহিম! হাতের ভাত ফেলে সেই যে দৌড় মারল, থামল গিয়ে সোজা পাঁচক্রোশ দূরে তার শ্বশুরবাড়িতে! উঠোনে দড়াম করে পড়ে শুধু একটা কথাই বলতে পেরেছিল, 'গুংগা...গুংগা...!' এর বেশি কিছু বলার আগেই মুখে ফেনা তুলতে তুলতে স্থির হয়ে গিয়েছিল সে।

সুবল কী দেখেছিল তা কোনওদিনই জানা যায়নি। কিন্তু এসব যে গুংগার কাণ্ড তা বুঝতে কারুর বাকি রইল না! গ্রামের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গেই ভূতের নামজাদা ওঝা সনাতন গুনিনকে ডেকে আনল। সনাতন রক্ষাকালীর মন্ত্রঃপূত জল ছিটিয়ে গ্রামবন্ধন করে ভৈরবকবচ সহযোগে গুংগার ক্ষুধিত প্রেতাত্মাকে লাল দড়ি দিয়ে আটকে ফেলল ওই গাছেই! তারপর থেকে সে ওই গাছে বন্দি হয়ে আছে। কারুর অনিষ্ট করার সুযোগ এখন তার নেই। তবে এখনও, বিশেষ করে অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় তাকে গাছ থেকে ঝুলতে দেখা যায়। গ্রামের লোকেরা পারতপক্ষে ও রাস্তা মাড়ায় না। কিন্তু লোকমুখে শোনা যায় গুংগার ভীষণ প্রেতাকৃতির বর্ণনা! চোখ দুটো টকটকে লাল। কষ থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছে! ভীষণ খিদেয়, অথবা শ্বাসকষ্টে তার জিভ ঝুলে আছে। আর সেই জিভ দিয়ে টপটপ করে চুঁইয়ে পড়ছে তাজা রক্ত!

সেই গুংগা এতদিন বাদে ছাড়া পেয়েছে। দশ বছর ধরে তার লালায়িত জিভ কোনও খাদ্যবস্তুর স্বাদ পায়নি। এখন সে তার ক্ষুধিত অন্তঃকরণ নিয়ে কী অনিষ্ট করবে কে জানে!

নারায়ণ দাদুর সমস্ত স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে। তিনি বিড়বিড় করে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করতে শুরু করেন।

৩

—'সব্বোনাশ হয়ে গেছে গো দাদু!'

বিজু নাপিতের ছেলে সুখু কোনমতে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে ভগ্নদূতের মতো সংবাদ দিল, 'সনাতন গুণিন মরে গেছে।'

রাসুখুড়ো বিস্মিত, 'সেকী! কবে মরে গেল!'

—'পরশু'। সুখু কোনমতে জবাব দেয়, 'ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়েছিল। মাথায় গাছ পড়ে মরে গেছে।'

খবরটা শুনে সকলেরই মুখে ভয়ের ছাপ পড়ে। এ কী দুর্ভোগ! একেই ঝড়বৃষ্টির দরুন লোকগুলো সব হাঘরে-হাভাতে হয়েছে। কোথায় থাকবে, কী খাবে তার ঠিক নেই। তার উপর ভূতের ভয়! আর এরমধ্যেই সনাতনের মৃত্যুসংবাদ!

নারায়ণ দাদুর বলিরেখা কুঞ্চিত মুখে আরও কয়েকটা ভাঁজ চিড়বিড় করে উঠল। পুরোনো লোক হওয়ার দরুন অনেক খারাপ দিন দেখেছেন। সহজে বিচলিত হন না। কিন্তু দুঃসময় যেন এবার পিছু ছাড়তেই চাইছে না! একেই এ গ্রামে তেমন ভালো ফসল ফলে না। মাটি তেমন উর্বর নয়। তার উপর মহাজনের ধার! লোকটা একেবারে চশমখোর। পারলে বুকে পা দিয়ে টাকা আদায় করে।

ওদিকে খেতে ধানের গোড়ায় জল জমে গেছে। বর্ষায় আশেপাশের পুকুরগুলো সব ভেসে যাওয়ার দরুন খেত থেকে জল নামছেই না। বাঁধ কেটেও জল নামানো যাচ্ছে না। পুকুর ভেঙে জল ক্রমাগতই ঢুকছে খেতের মধ্যে। নারায়ণ দাদু অভিজ্ঞ লোক। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন খুব তাড়াতাড়িই আরেকটা দুর্ভিক্ষ আসতে চলেছে। ধান পচবে। ফসল হবে না। মহাজনের ধার শোধ তো দূরের কথা, নিজের ঘরে দু-মুঠো ভাতও জুটবে না।

এর মধ্যেই মূর্তিমান কালান্তক গুংগা জিভ লকলকাচ্ছে। তিনি আর ভাবতে পারলেন না। রাসুখুড়ো তাঁর হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তবে উপায়?'

উপায় অবশ্য করতে হল না। তার আগেই বিপদ এসে হাজির!

পেটে অন্নের দানা নেই। মাথা গোঁজবার জায়গা নেই। অবসন্ন, ক্ষুধার্ত মানুষগুলো ভূত তাড়ানোর আগে প্রাণধারণের কাজেই মন দিয়েছিল। কোনওমতে মাথার উপরে খড় দিয়ে একফালি চাল তৈরি করে মাটির উপরে খড় বিছিয়ে থাকছিল তারা। ছেলেমেয়েদের দু-বেলা খাওয়ানোর চিন্তা নেই। দশ বছরে শিবনারায়ণপুরে দুটো পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমত, একটা সরকারি প্রাইমারি স্কুল। দ্বিতীয়ত, একটু দূরেই একটা দাতব্য হাসপাতালও তৈরি হয়েছে। প্রাইমারি স্কুলেই মিড ডে মিলের কৃপায় দুপুরের খাবারটা পাওয়া যায়। আর রাতে আলুসেদ্ধ, কলমিশাক সেদ্ধ দিয়ে কোনওমতে চালিয়ে দেওয়া যায়। ছোটদের একবেলা খিচুড়ি, ভাত-ডাল জুটলেও বড়দের কচু, ঘেঁচু, শাপলাই সম্বল। তাও না জুটলে পেয়ারাপাতা, তেঁতুলপাতা ভিজিয়ে কোনওমতে দিন গুজরান।

ছোট্ট শিশুরা এ দুর্যোগের দিনেও বায়না করে, 'মা, ভাত খাব। ভাত দে।'

মা চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাদের মুখে শাকসেদ্ধ তুলে দিয়ে বলে, 'আজ এই খা বাপ। কাল ভাত দেব।'

এভাবেই কেটে গেল কিছুদিন। দিনের পিছনে হপ্তা। তার পিছনে মাস। যতদিন যায় লোকগুলো ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়তে থাকে। এভাবে আর কতদিন? দশ বছর আগের দুর্ভিক্ষ কি তবে আবার ফিরে আসছে?

দুর্ভিক্ষ আসত কি না কে জানে। কিন্তু তার আগেই দশ বছর আগের আরেক আতঙ্ক ফিরে এল।

সেদিন রাতে সুখুর ঘুম আসছিল না। পেটে খিদের লকলকে আগুন। এ-পাশ ও-পাশ করতে করতেই সে উঠে পড়ল।

তখন মধ্যরাত্রি। সুখু চুপচাপ চালা থেকে বেরিয়ে গেল। একরকম হারা-উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিল। চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার। আধফালি নীলাভ চাঁদ কেমন যেন নির্লজ্জ ক্রুর হাসি হাসছে। বট-পাকুড়ের পাতায় অদ্ভুত একটা খসখস শব্দ। ঝিঁঝিঁ পোকা কেমন যেন করুণ সুরে তান ধরেছে।

কী মনে হতেই সে শিবু মহাজনের বাড়ির পথ ধরল। শিবুর পুকুরে অনেক মাছ আছে। তার খলবল শব্দ দূর থেকে শুনেছে। কিন্তু চতুর্দিকে কাঁটাতার থাকার দরুন মাছ চুরি করা অসম্ভব। তার উপর শিবু আবার একটা কুকুর পুষেছে। কুকুরটাও তার মালিকের মতোই হোঁৎকা। স্বভাবও তেমন। দেখলেই খ্যাঁকখ্যাঁক করে কামড়াতে আসে। সুখুর সন্দেহ হয় কুকুরটা আসলে শিবুরই যমজ ভাই।

কুম্ভের মেলায় হারিয়ে গিয়েছিল। কোনও সাধু-সন্নিসির পিছনে কাঠি দিতে গিয়ে ব্রহ্ম-অভিশাপে কুকুর হয়ে গেছে। তাই সে কামড়াতে পারে। শিবু এখনও সে বিদ্যেটা রপ্ত করতে পারেনি।

শিবুর বাড়ির কাছাকাছি আসতেই অদ্ভুত একটা খলখলাৎ শব্দ শুনতে পেল সে। দু-পা এগোতেই পায়ে জলের শীতল স্পর্শ! আর তার মধ্যেই যেন কী একটা আন্দোলন চলছে! হঠাৎ পায়ের কাছে মসৃণ কী যেন হুড়মুড় করে এসে পড়ল! ওরে বাবা! সাপ নাকি! সুখু তিন লাফ মেরে পিছিয়ে আসে। পরক্ষণেই চাঁদের আলোয় দেখতে পেয়েছে জিনিসটাকে। সাপ নয়, মাগুরমাছ! বেশ বড়সড়, হৃষ্টপুষ্ট। শিবুর পুকুর ভেসে যাওয়ায় মাছটা ডাঙায় এসে পড়েছে। ওঃ ভগবান!

সুখু একবারের চেষ্টাতেই খপাৎ করে ধরে ফেলল মাছটাকে। শক্ত করে ধরে পিছনে ফিরতে যাবে এমন সময়ই বিপদ! কে যেন তার হাত সবলে চেপে ধরল!

কী সর্বনাশ! শিবু মহাজন নাকি! সুখু ভয়ে ভয়ে সেদিকেই তাকায়। কিন্তু তাকিয়ে যা দেখল তাতে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া! শিবু নয়, একটা লম্বা কালো সিড়িঙ্গে লোক! লাল চোখদুটো অন্ধকারেও দপদপ করে জ্বলছে। ঘাড়টা দুমড়ে-মুচড়ে গেছে! আধহাত জিভ বের করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সামনে!

গুংগা!

পরদিন সকালে সুখুকে ওখানেই পাওয়া গেল। তখন সে অজ্ঞান! সারা গা ক্ষতবিক্ষত। কে যেন তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঁচড়ে-কামড়ে দিয়েছে। অচেতন অবস্থায় সুখু প্রলাপ বকছিল, 'ওই...গুংগা আসছে!...আমায় মেরে ফেলবে...খেয়ে ফেলবে...।'

গ্রামের লোকেরা বুঝল গুংগা ফিরে এসেছে। শুধু ফিরেই আসেনি, কালান্তক মূর্তিতে এসেছে।

৪

গুংগার আতঙ্কে কয়েকদিনের মধ্যেই শিবনারায়ণপুর কাঁপতে শুরু করল। দশ বছর বাঁধা থেকে তার খিদে আগ্রাসী মূর্তি ধরেছে। প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছে সহিংস।

সুখুকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দাতব্য হাসপাতালে। তার ক্ষত দেখে দাতব্য হাসপাতালের প্রবীণ ডাক্তার অবনীবাবু আঁতকে উঠলেন, 'একী! এভাবে আঁচড়াল কে?'

সুখুর বাবা বিজু নাপিত হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'গুংগা।'

বলাই বাহুল্য গুংগার তত্ত্ব অবনী ডাক্তারের মাথায় ঢুকল না। তিনি বারবার মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, 'নাঃ, এমন ভাবে আঁচড়ানো কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়...আশ্চর্য!'

সুখুর ফ্যাকাশে মুখ দেখে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন ছেলেটার শরীরে রক্ত প্রায় নেই!

খবরটা শুনে গোটা শিবনারায়ণপুর কেঁপে উঠল! কী সর্বনাশ! অতবড় জোয়ান ছেলেটার শরীরে রক্ত নেই! গুংগা আঁচড়াতে কামড়াতে শিখেছে সেটা জানা কথা। কিন্তু সে যে রক্ত চুষতেও পারে তা

জানা ছিল না! দশ বছরে তার খিদে এমন প্রলয়ংকর মূর্তি ধরেছে! এখন সে খাদ্যবস্তুতেও সন্তুষ্ট নয়। মানুষের রক্তও খেতে শুরু করেছে।

সুখুর ঘটনার পর কয়েকটা দিন কেটে গেল। সারা গ্রাম আশঙ্কায় থমথমে। এবার কার পালা কে জানে! সবারই বুকের ভিতরে আতঙ্কের ঢিপঢিপ! গুংগা এবার সরাসরি আক্রমণ না করলেও চতুর্দিকে দেখা দিতে লাগল। বিন্দিপিসি একবার ভোর রাতে পুকুর থেকে জল আনতে গিয়ে দেখলেন একটা লম্বা সিড়িঙ্গে মূর্তি নিঃশব্দে গাছের মাথায় মাথায় লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। রতন সর্দার মাটির ভিতর থেকে একটা বড়সড় রাঙা আলু টেনে তুলছিল। রাতে রাঙা আলু সেদ্ধ খেয়ে কয়েকটা দিন চলে যাবে তার। কিন্তু যেই মুহূর্তে আলুটাকে টেনেটুনে মাটির উপরে তুলেছে, তখনই চোখে পড়ল একটা বিরাটাকৃতি পাখি তার মাথার উপরে চক্কর কেটে বেড়াচ্ছে। পাখিটা ঠিক পাখি নয়। বরং একটা মানুষের মতো দেখতে তাকে! লম্বা কালো চেহারা, জিভ বের করা, ঘাড় মচকানো একটা মানুষ! তার জিভ দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়ছে!

'আই বাপ' বলে রাঙা আলু ফেলে সেই যে সে দৌড় মারল, বাড়ি না পৌঁছে থামল না।

শিবনারায়ণপুর আতঙ্কে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো পড়ে রইল। খরা, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়তে পারে। কিন্তু যে মানুষ নয়, অভদ্রের মতো আঁচড়ে-কামড়ে দেয়, গাছের মাথায় লাফ মেরে মেরে বেড়ায়, এমনকি উড়তেও পারে, এমন বিভীষিকার সাথে কী করে লড়বে!

এর ঠিক কয়েকদিন পরেই ঘটল তার দ্বিতীয় আক্রমণ!

আশেপাশের ডোবায় কিছু শাপলা-শালুক হয়েছিল। রাসুখুড়ো জলে নেমে রাতের খাবারের জন্য তাই সংগ্রহ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল ডোবার ভিতরে একটা ভীষণ কিছু কাণ্ড ঘটছে! জলের ভিতর অদ্ভুত আলোড়ন। খলবল খলবল করে জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে। ভয় পেয়ে শাপলা সুদ্ধু তিনি জল থেকে উঠে আসতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই জলের ভিতর থেকে দুটো কালো কুচকুচে হাত বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এসেছে। কথা নেই বার্তা নেই, হাত দুটো তাঁর গলা টিপে ধরল। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে রাসুখুড়ো দেখতে পেলেন জলের তলায় একটা বীভৎস মুখ! লাল টকটকে চোখ, রক্তাক্ত জিভ। আর আগে যা কেউ কোনওদিন লক্ষ করেনি তাও নজরে পড়ল তাঁর। দেখলেন মুখটার কষ বেয়ে বেরিয়ে এসেছে দুটো তীক্ষ্ণ সুঁচলো শ্বদন্ত!

রাসুখুড়োও মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। দাতব্য হাসপাতালের অবনী ডাক্তার তাঁকে দেখেও অবাক হলেন। আশ্চর্য! এই মানুষটির দেহেও রক্ত প্রায় নেই বললেই চলে! এইবার তাঁকে চিন্তিত লাগল।

শিবনারায়ণপুরের লোকেরাও জানল যে গুংগার তীক্ষ্ণ দাঁতও আছে। সেই দাঁত দিয়ে ফুটো করে সে শরীরের রক্ত চুষে নেয়।

এমন খবর খুব বেশিদিন চাপা থাকে না। গুংগার আতঙ্ক শিবনারায়ণপুর থেকে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। কলকাতা থেকে খবরের কাগজের লোক এল। পিছন পিছন এল টেলিভিশন চ্যানেল। গুংগার খবর কভার করার জন্য তারা দিনের পর দিন ওখানেই পড়ে থাকল। কয়েকদিনের মধ্যে এসে পড়লেন প্যারাসাইকোলজিস্ট, স্পিরিচুয়ালিস্টরা। তাঁরা ভূত দেখার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

যুক্তিবাদী, নাস্তিকরাই বা বাদ থাকেন কেন? তারাও হাজির। ভূত আছে কি নেই; সেই নিয়ে লাগল জব্বর তর্ক। যুক্তিবাদীদের মধ্যে প্রধান ডঃ বিশ্বাস বললেন, 'কোথায় ভূত? ওসব স্রেফ গাঁজাখুরি কথা।'

প্যারাসাইকোলজিস্ট ডঃ দেবরায় বললেন, 'ভূত যদি না থাকে তবে এখানে কী হচ্ছে? গুংগার কীর্তি তো নিজের কানেই শুনছেন।'

—'শুনতে তো অনেক কিছুই পাই। লোকে বলছে সে নাকি উড়ে বেড়ায়, জলে ডুবে থাকে, গাছের মাথায় লাফিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এরমধ্যে একটাও তো চোখে দেখলাম না।'

বেশ কিছুক্ষণ চাপান-উতোর চলল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে সামনের অমাবস্যায় প্ল্যানচেট করে গুংগাকে ডাকা হবে। অবিশ্বাসীদের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে।

ডঃ বিশ্বাস হেসে বললেন, 'প্ল্যানচেট করে কোন হাতির মাথা হবে? মিডিয়াম তো হবে আপনার লোক। সে তো আপনার কথা মতোই চলবে।'

ডঃ দেবরায় বাকবিতণ্ডায় না গিয়ে গ্রামের প্রাচীন বাসিন্দা নারায়ণ দাদুকেই নিরপেক্ষ মিডিয়াম হিসাবে বেছে নিলেন। ঠিক হল তিনদিন পরে, অমাবস্যায় প্ল্যানচেট হবে। দাদু প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত নগদ পাঁচহাজার টাকার বিনিময়ে রাজি হলেন।

অন্যদিকে টিভি চ্যানেলের লোকেরা রাত দুপুরে ক্যামেরা নিয়ে শিবনারায়ণপুর টহল দিতে শুরু করল। সেই পোড়া গাছটাকে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখুন সেই গাছ। এখানেই কালান্তক গুংগাকে এতদিন বেঁধে রাখা হয়েছিল। বেঁধেছিলেন সনাতন গুণিন। আজ সেই গুংগা তার অসীম খিদে নিয়ে এখানেই কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে...রক্ত চুষে বেড়াচ্ছে...'

টেলিভিশনের টি আর পি ধরধর করে বাড়তে লাগল। রিপোর্টাররা গুংগার ইতিহাস এবং তার বর্ণনা এমনভাবে জানাতে লাগল যেন স্বচক্ষেই তাকে দেখেছে। আসলে গোটাটাই গ্রামের মানুষের কাছে শোনা কথা। যথারীতি মাগনায় নয়। রীতিমতো কাঞ্চনমূল্যে! ছোট্ট পাঁচুর আঁকা গুংগার ছবি, গুংগার মুখোশ দেখিয়ে তারা দর্শককে ভয় দেখাতে শুরু করল। আর দর্শকরা গভীর রাতে একা হলঘরে বসে ভয় পেতে পেতেও গোগ্রাসে গিলতে লাগল প্রত্যেকটা বুলেটিন!

৫

—'খুড়ো, কী মনে হয়?'

হাসপাতালের বেডে শুয়ে সুখু গভীর রাতে রাসুখুড়োর সাথে কথা বলছিল।

—'কীসে কী মনে হয়?' হাই তুলে রাসুখুড়ো বললেন।

—'নারাণ দাদু ঠিকমতো গুংগার অ্যাক্টো করতে পারবে? লোকগুলোকে ভয় দেখাতে পারবে?'

—'সে আর বলতে?' রাসুখুড়োর নির্লিপ্ত উত্তর, 'এ মতোলব তো তারই। তুই বাপের খুর দিয়ে হাত-পা কাটলি। আমি ডুবে ডুবে একপেট জল খেলাম তো তার কথাতেই। বুড়ো ঠিক উতরে দেবে। ভাবিস না।'

সুখু বিড়বিড় করে বলে, 'যখন দুর্ভিক্ষে লোক মরছিল, তখন কাকপক্ষীতেও আসেনি। আর এখন দেখো, ভূত দেখার জন্য কড়কড়ে নোট দিয়ে কতলোক চালা ভাড়া করছে। পয়সা দিয়ে মুখোশ কিনছে। গপ্পো শোনার জন্য টাকা দিচ্ছে। আরও কত কী! ডাক্তার বলে গায়ে রক্ত নেই। আলু, কচুসেদ্ধ, শাপলা খেয়ে কি কারও শরীরে রক্ত হয়?'

রাসুখুড়ো মৃদু হাসলেন, 'শিবনারায়ণপুর তীত্থ হয়ে গেল; বুঝলি? এখন দু-বেলা দু-মুঠো ভাত জুটবে অন্তত।'

—'হয়তো। বুঝলে খুড়ো, কাল ডাক্তারকে বলব দু-মুঠো ভাত দিতে। এই লাপসি খেতে আর ভালো লাগে না। তার সাথে একটু ডাল কি দেবে না বলো?'

রাসুখুড়ো কোনও উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরলেন। হোক লাপসি। তবু ঢঙের খাবার তো বটে। ভাতের কথা মনে পড়তেই মন হু হু করে উঠল। কতদিন ভাতের গন্ধ পাননি। নারায়ণ বলেছিলেন, 'কটা দিন হাসপাতালে থাক। অন্তত দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাবি। শোওয়ার বিছানা পাবি।'

এইটুকুর জন্যই এত নাটক!

—'আচ্ছা খুড়ো...।' সুখু ফের বলল, 'সত্যিই কি গুংগা বলে কেউ ছিল?'

—'জানি না।' খুড়ো বলেন, 'যদি থাকেও তবু তাকে ভয় নেই। দুনিয়ায় খিদের চেয়ে বেশি ভয়ংকর আর কিছু নেই। বুঝলি?'

বলতে বলতেই কপালে হাত ঠেকান তিনি। যে লোকটা দশ বছর আগে না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল, আজ তার জন্যই হয়তো গোটা গ্রাম বাঁচবে। এখন ভালোয় ভালোয় নারায়ণবুড়ো শেষটুকু সামলে নিলেই হয়। দুগ্গা...দুগ্গা...!

—

যে ফিরে এসেছিল

১

'আপনি কখনও মৃত্যুকে দেখেছেন?'

নাতালিয়ার এই আকস্মিক প্রশ্নে একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন জর্জ উইলিয়ামস। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন নাতালিয়ার দিকে। বিকেলের পড়ন্ত রোদ নাতালিয়ার সাদা আইভরির মতো মুখে একচিলতে রক্তিম আলো এঁকে দিয়েছে। বাদামি চুল সমুদ্রের হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ছে। উজ্জ্বল সবুজাভ চোখদুটোয় সন্ধ্যাকালীন ছায়ামাখা রহস্য। গোলাপি ঠোঁটদুটো স্মিত হাস্যে ভরপুর। যেন ভারী কৌতুকময় এক প্রশ্ন করেছেন তিনি!

'মৃত্যু!' জর্জ একটু ইতস্তত করে বলেন, 'শুধু আমি কেন, এ দুনিয়ার কোনও জীবিত মানুষ তাকে দেখেছে বলে মনে হয় না!'

'যদি বলি আপনার ধারণা ভুল?' হাসিটা এবার নাতালিয়ার চোখ উপচে পড়ে, 'যদি বলি আমি তাকে দেখেছি এবং একাধিকবার দেখেছি, তবে কি আপনি আমায় পাগল ভাববেন?'

'ওঃ!' তিনি একটু দুঃখিত স্বরে বলেন, 'আই অ্যাম সরি। হ্যাঁ, আমি শুনেছি যে আপনি জীবনে অনেকগুলো মৃত্যুই প্রত্যক্ষ করেছেন। আপনার মা শৈশবেই মারা যান। আপনার বাবাও একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন...তারপর আপনার স্বামী...!'

'না না! তেমনভাবে নয়!' নাতালিয়া মাথা নাড়েন, 'সেরকম মৃত্যু সবাই দেখেছে। কিন্তু স্বয়ং মৃত্যুকে কেউ দেখেছে কি? আমি কিন্তু তাকে দেখেছি। একদম সেইভাবে যেমন এখন আপনাকে দেখছি।'

এ কী অসম্ভব কথা! নাতালিয়া গোমসকে আর যাই হোক, পাগল ভাবা অসম্ভব! বরং এমন ধীর, স্থির, অসম্ভব বুদ্ধিমতী নারী খুব কমই দেখা যায়। তাঁর স্বামী রবার্ট গোমস গোয়ার নামকরা বিত্তবানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। রবার্টের প্রয়াণের পর এই নারী একাই সামলেছেন গোটা ব্যবসা। তিলে তিলে প্রায় দ্বিগুণ করেছেন স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ। যাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি এমন তীক্ষ্ণ, তাঁকে কিছুতেই পাগল বলা চলে না! অথচ তিনি যা দাবি করছেন, এককথায় তা অসম্ভব!

জর্জ কী বলবেন ভেবে পেলেন না। তিনি নাতালিয়া গোমসের একটি সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য কিছুদিন ধরেই চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু গোয়ার 'হোটেল বিজনেসের' মুকুটহীন সম্রাজ্ঞীর কাছে পৌঁছনো খুব সহজ ছিল না। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর শেষ পর্যন্ত একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন। কিন্তু নাতালিয়া সম্পর্কে তাঁর যে ধ্যান-ধারণা ছিল, প্রথম সাক্ষাতেই তা আমূল পালটে গেল। ভেবেছিলেন, অত্যন্ত উন্নাসিক, আপাদমস্তক অলঙ্কারে সজ্জিতা কোনও জটিল চরিত্রের মহিলাকে দেখবেন। অথচ নাতালিয়া তার একদম বিপরীত! তাঁর বয়েস ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু মুখে

এখনও কোনও বলিরেখা পড়েনি। কানে দুটি বড় বড় হিরের দুল এবং গলায় একটি মিনে করা ক্রুশের লকেট যুক্ত সোনার চেন ছাড়া আর কোনও অলঙ্কার পরেননি তিনি। তাঁর বিরাট প্রাসাদের সামনের লনেই বসার ব্যবস্থা হয়েছিল। একটি সাদা রঙের গাউন পরে, মুখে শিশুর মতো সরল হাসি নিয়ে যখন নাতালিয়া দেখা দিলেন, তখন রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলেন জর্জ। কারণ তথাকথিত 'সম্রাজ্ঞী'র হাতে একটি চায়ের ট্রে! কোনও চাকর বা দাস-দাসী বৈকালিক চায়ের ট্রে-টা বয়ে নিয়ে আসছে না! টেবিলের ওপরে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ট্রে নামিয়ে রেখে নাতালিয়া হেসে বললেন, 'স্যান্ডুইচ আর কেকটা কিন্তু আমিই বানিয়েছি। আশা করি খারাপ লাগবে না।'

ব্যস, তারপর থেকেই জর্জ অনেকটাই সহজ হয়ে গিয়েছিলেন। নাতালিয়ার সঙ্গে কথোপকথনও চলছিল পুরোদমে। নাতালিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। জর্জ এই প্রৌঢ়ার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। শেষমেশ সাহস করে বলেই ফেললেন, 'আচ্ছা নাতালিয়া, আপনার জীবনে এমন কোনও ঘটনা আছে কি, যা আজ পর্যন্ত আপনি কাউকে কখনও বলেননি?'

কথাটা শুনতেই নাতালিয়ার মুখে অদ্ভুত একটা রহস্যময় হাসি ভেসে উঠল। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'এক্সক্লুসিভ কিছু খুঁজছেন?'

এবার একটু বিব্রত বোধ করলেন জর্জ। অপ্রস্তুত হেসে কিছু একটা বলতেই যাচ্ছিলেন, তার আগেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মাথায় এসে পড়ল সেই অদ্ভুত প্রশ্ন, 'আপনি কখনও মৃত্যুকে দেখেছেন?...'

জর্জ পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেবেন বুঝতে পারছিলেন না। নাতালিয়া দাবি করছেন যে তিনি স্বয়ং মৃত্যুকে দেখেছেন! যা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার! অথচ মুখের ওপর কিছু বলার সাহসও নেই। ভদ্রমহিলা কি সামান্য ছিটগ্রস্তা! অথচ এতক্ষণের কথোপকথনে তো তেমন কিছুই মনে হল না! বরং তাঁর স্বভাবটি বড়ই মধুর। একবারের জন্যও মনে হয়নি যে তাঁর মধ্যে কোনওরকম অস্বাভাবিকতা আছে! অথচ...!

'জানি, আপনার বিশ্বাস হবে না।' নাতালিয়া দূরের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক স্বরে বললেন, 'আপনি কেন, কেউই একথা বিশ্বাস করবে না। আপনি কী ভাবছেন তাও বুঝতে পারছি। ভাবছেন, আমার মাথায় কোনও গোলমাল আছে। তাই না?'

জর্জ আমতা আমতা করেন, 'না...না! কী বলছেন...!'

'আপনার দোষ নেই মিঃ উইলিয়ামস। যে কোনও মানুষই তাই ভাববে।' তাঁর কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা রহস্য ঘনিয়ে এসেছে, 'কিন্তু এটাই ফ্যাক্ট। স্বয়ং মৃত্যুকে আমি দেখেছি। আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি সেকথা। রবার্টকে বলিনি। ছেলে ফ্রান্সিসকেও না। আপনি এক্সক্লুসিভ স্টোরি চাইছিলেন না? এই হল সেই এক্সক্লুসিভ স্টোরি যা হয়তো একদিন আমার কবরের সঙ্গেই মাটিচাপা পড়ে যাবে। আমার জীবনের গোপনতম সত্য, যা আর কেউ জানে না। আপনি যদি শুনতে চান, তবে বলতে পারি। ছাপবেন কি ছাপবেন না, সেটা আপনার ব্যাপার।'

জর্জের মনেও একটা অদ্ভুত কৌতূহল একটু একটু করে শিকড় ছড়াচ্ছিল। ঠিক কী বলতে চাইছেন ভদ্রমহিলা! আর যা-ই হোক, গল্পটা শুনতে তো বাধা নেই। তিনি দৃঢ় স্বরে বললেন, 'অবশ্যই শুনব। বলুন।'

'এক মিনিট।' নাতালিয়া তাঁকে আরও অবাক করে দিয়ে আকস্মিকভাবে উঠে চলে গেলেন। মিনিটখানেক পরেই অবশ্য ফিরে এসেছেন। তাঁর হাতে একটা বহু পুরোনো অ্যালবাম।

'এটা দেখুন। এর মধ্যে আমার বাবার ছবি আছে।' তিনি জর্জের হাতে অ্যালবামটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার বাবার নাম স্টিভ গঞ্জালভেস! সারা গোয়ায় তাঁর মতো আর্টিস্ট খুব কমই ছিল। আর তাঁর মতো বাবা গোটা বিশ্বেও ছিল না, নেই, থাকবেও না! হি ওয়াজ দ্য বেস্ট ফাদার অফ দ্য ইউনিভার্স!'

বলতে বলতেই নাতালিয়ার কণ্ঠস্বর ভিজে এল। তিনি কোনওমতে নিজের আবেগকে সংবরণ করলেন। জর্জ তখন অ্যালবামের ছবিগুলো মন দিয়ে দেখছিলেন। ছবিতে শিশু নাতালিয়াকে চিনতে একটুও অসুবিধে হল না। তাঁকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে হাস্যমুখ যুবক, সম্ভবত তিনিই নাতালিয়ার বাবা স্টিভ গঞ্জালভেস। হাসলে গালে চমৎকার একটি টোল পড়ে। লম্বা ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, কাটাকাটা মুখ! প্রশস্ত কপালের নীচে শান্ত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। থুতনিতে একটা কাটা দাগ। আর ডানহাতের কব্জিতে কালো রঙের ট্যাটুতে লেখা আছে, 'নাতালিয়া'।

জর্জ পরম কৌতূহলে এবার নাতালিয়ার দিকে তাকান। নাতালিয়া একটু সময় নিলেন। যেন নিজেকে প্রস্তুত করছেন গল্পটা বলার জন্য।

সন্ধ্যার রহস্যময় আলো তখন চতুর্দিকে আলোছায়া মাখা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সেই আলো-আঁধারিতেই শুরু হল এক অদ্ভুত গল্প!

মৃত্যুর গল্প!

২

'যখন আমার বয়েস প্রায় দু-বছর, তখনই আমার মা মারা গেলেন। মৃত্যু কী জিনিস তা বোঝার মতো জ্ঞান তখন ছিল না। শোক অনুভব করার মতো বিচার-বুদ্ধি তখনও ঈশ্বর আমায় দেননি। তাই মায়ের চলে যাওয়াটা আমার জীবনে তেমন দাগ কাটেনি। দাগ কাটার উপায়ও ছিল না! একটি মানুষ চলে গেলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা আমার বাবা নিজের সবটুকু দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। মাতৃহীন শিশুটিকে সেই যে তিনি বুকে আগলে নিলেন, দুনিয়ার কোনও শোক-তাপ সেই স্নেহের বন্ধনকে ভেঙে আঁচড়টুকুও কাটতে পারেনি তাঁর সন্তানের গায়ে। স্নেহে-মমতায় একাধারে তিনিই আমার মায়ের জায়গা দখল করলেন, অন্যদিকে দায়িত্ব-কর্তব্যে একজন আদর্শ পিতার ভূমিকাও নিঃশব্দে পালন করে গেলেন।

আমরা গরিব ছিলাম। কিন্তু আমি নিজে কখনও দারিদ্রকে অনুভব করতে পারিনি। আমার বাবা চিত্রকর ছিলেন। অপূর্ব ছবি আঁকতেন। সেইসব ছবি বিদেশি টুরিস্টরা 'আহা...আহা' করে কিনে

নিয়েও যেত। কিন্তু সে উপার্জন একটি পরিবার চালানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। অথচ কী যেন এক অদ্ভুত ম্যাজিকে বাবা আমাকে রাজকুমারীর মতো আদরে বড় করতে লাগলেন। আমাকে ডাকতেন, 'প্রিন্সেস' বলে। অভাবের ছায়াও কোনওদিন আমার গায়ে পড়েনি। দামি দামি জামা, পুতুল কিনে দিতেন। আমি যা যা খেতে ভালোবাসতাম নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতেন। আমি নাচতাম, উনি পিয়ানো বাজাতেন। রাত্রে যখন ঘুম আসত না তখন গান গেয়ে ঘুম পাড়াতেন, 'ফর ইওর গ্রেস ইজ এনাফ!' লোকে প্রিয় মানুষের নাম হাতে খোদাই করে! বাবা নিজের 'প্রিন্সেসে'র নাম হাতে খোদাই করেছিলেন। আমরা দুজন ছাড়া দুনিয়ায় আমাদের আর কেউ ছিল না!

আমি গোয়ার সবচেয়ে বড় মিশনারি স্কুলে ভর্তি হলাম যেখানে পড়াশোনা চালানো যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য! একজন দরিদ্র শিল্পীর পক্ষে সে ব্যয়ভার বহন করা সহজ নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, কোনওদিন আমার স্কুলের ফিজ বাকি পড়েনি। স্কুলড্রেস, বই, খাতা-পত্র সবই সময়মতন চলে আসত।

আমি দেখতাম, তাঁর পায়ের শতচ্ছিন্ন জুতোজোড়ার একপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে বুড়ো আঙুল! কিন্তু নতুন জুতো কিছুতেই কিনবেন না! ক্রিসমাসে, বার্থডেতে কেক আনতে কোনওদিন ভোলেননি। বাবা সে কেক নিজে কোনওদিন খাননি। ওই ছোট্ট কেকটা শুধু আমার জন্যই আসত। তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব বিক্রি করে আমাকে পড়িয়েছিলেন। মাঝেমধ্যেই আমাদের বাড়িতে কিছু লোক এসে হল্লা করত। তারা কারা সে কথা বাবা কোনওদিন বলেননি। এখন বুঝি, ওরা পাওনাদার ছিল।'

বলতে বলতেই নাতালিয়ার কণ্ঠস্বর বুঁজে আসছিল। জর্জ নীরব শ্রোতা। নাতালিয়ার মুখের দিকে গভীর কৌতূহলে তাকিয়ে রয়েছেন। একটু বিরতি দিয়েই ফের বলতে শুরু করলেন তিনি :

'আস্তে আস্তে বড় হলাম। কলেজের পড়া শেষ হল। দুর্দান্ত রেজাল্ট করলাম। কিন্তু আমার আনন্দের থেকেও বাবার গর্ব ছিল অনেক বেশি। তিনি পাড়ার সবাইকে ডেকে ডেকে বললেন, 'দেখো, আমার মেয়ে কত মেধাবী!' তাতেও তাঁর শান্তি হল না। তিনি ফের ধারদেনা করে এক জোড়া বড় বড় মুক্তোর দামি দুল কিনলেন আমাকে গিফট দেবেন বলে। মুক্তোর দুল পরার যে আমার খুব সাধ ছিল তা বাবা জানতেন। কীভাবে আমাকে চমকে দেবেন, দুলদুটো দেখে আমি কতটা খুশি হব; সেই কল্পনা করতে করতেই তিনি প্রায় হাওয়ায় উড়তে উড়তে বাড়িতে ফিরছিলেন। আর এই উত্তেজনা ও আনন্দের ফল হল মর্মান্তিক! বাবা অন্যমনস্ক ছিলেন। দুর্দান্ত বেগে ছুটে আসা গাড়ির হর্ন শুনতেই পাননি! যখন টের পেলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। গাড়িটা তাঁকে প্রায় পিষে দিয়ে চলে গেল!

জীবনে এই প্রথম বুঝলাম, শোক কাকে বলে! শূন্যতার জ্বালা কী! অ্যাক্সিডেন্ট কেস বলে বাবার দেহটার পোস্টমর্টেম হয়েছিল। সেই কাটাছেঁড়া করা শরীরটাকে যখন সমাধিস্থ করে ফিরে এলাম, তখন শূন্য ঘর যেন আমায় তেড়ে গিলতে এল! তিনদিন, তিনরাত বাইরে বেরোইনি। রাতের বেলা সারা ঘরে খুঁজে খুঁজে ফিরতাম বাবাকে। কান্নাজড়ানো স্বরে ডাকতাম! বিশ্বাস ছিল, আমার কান্না শুনে যে মানুষটা অস্থির হয়ে পড়ত, সে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। নিজের প্রিন্সেসের চোখের জল কোনওদিন

বাবার সহ্য হয়নি। কিন্তু জীবনে এই প্রথম ব্যথিত সন্তানের কান্নায় বাবা সাড়া দিলেন না। বুঝতে পারলাম, বাবা ফিরবেন না। এবং তাঁকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তিনি ছাড়া আমার কেউ ছিল না, কেউ নেই! তবে এই শূন্য জীবনের মানে কী! তাই একরাতে ছুরি দিয়ে নিজের কবজি কেটে ফেললাম! আর ঠিক তখনই দেখলাম ওকে...!'

'কাকে?' জর্জ ঝুঁকে পড়েন নাতালিয়ার দিকে।

'মৃত্যুকে! হ্যাঁ, সে মৃত্যু ছাড়া আর কেউ নয়! হতেই পারে না! যখন আমার শরীর থেকে সমস্ত রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমি আস্তে আস্তে হাল্কা হয়ে যাচ্ছি,...দেহটা যেন শূন্যে তুলোর মতো ভাসছে; একটা ভীষণ আরামের ঘুম এসে আমায় গ্রাস করছে; ঠিক তখনই সে সামনে এসে দাঁড়াল! ধবধবে সাদা গায়ের রং, অপূর্ব মুখশ্রী, দেখলে তাকে তরুণ বলেই মনে হয়—অথচ উজ্জ্বল নীল চোখদুটোয় যেন কয়েক হাজার বছরের প্রজ্ঞা! পরনে সাদা রেশমি পোশাক, উজ্জ্বল জ্যোতির্বলয় তাকে ঘিরে আছে। কী শান্ত! কী সৌম্য! সে আমায় হাত তুলে বারণ করল। তার ঠোঁট নড়ল না, কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম সে বলছে, 'না! না! ফিরে যাও! এখনও তোমার সময় হয়নি! শিগগিরই ফিরে যাও।'

আমি বললাম, 'না। বাবাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। ওই একটি মানুষ ছাড়া আমার আর কেউ নেই! তুমি তাকে কেড়ে নিয়েছ। এখন আমাকেও নাও।'

সে মাথা নাড়ল। উজ্জ্বল চোখদুটো যেন নীলাভ বরফের মতো শীতল। তার মোলায়েম কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলাম, 'আমি কাউকে কেড়ে নিইনি। তোমার বাবার যতটুকু আয়ু ছিল, তিনি ঠিক ততটুকুই বেঁচেছেন। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। নিয়তির ওপর কারোর হাত নেই।'

'আমি অত বুঝি না!' আমি এবার কেঁদে ফেললাম, 'আমি মরতে চাই। বাবা না থাকলে আমার কাছে এ জীবন অর্থহীন! তুমি তো মৃত্যু! তুমি আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো।'

'তা হয় না।' সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, 'তোমার আয়ুষ্কাল এখনও অনেক বাকি। আমি নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করতে পারি না।'

আমিও নাছোড়বান্দা। বললাম, 'যদি তাই হয়, তবে আমার বাবাকেও ফিরিয়ে দাও। তুমি সব পারো।'

'অসম্ভব!' সে জানায়, 'তা হয় না। বোঝার চেষ্টা করো! ওঁর নিয়তিতে যা লেখা ছিল, তা হয়েছে। যার জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। কথা শোনো, তুমি ফিরে যাও। বাবার মায়া কোর না। তিনি যেখানে আছেন, শান্তিতেই আছেন।'

বলাই বাহুল্য যে আমি তার কথা শোনার পাত্রী ছিলাম না। সে যতবার আমায় ফিরে যেতে বলে, আমি ততবার বাবাকে ফেরত চাই। তার পায়ে পড়ি, কাকুতি-মিনতি করি, তর্ক করে যাই। সে আমায় বোঝায়, বারবার বলে, 'মৃত্যুর কাছ থেকে কেউ কোনওদিন ফেরেনি। তুমি যা চাইছ, আসলে সত্যিই তুমি তা চাও না। আমায় বিশ্বাস করো। আবেগপ্রবণ হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট কোর না। ফিরে যাও।'

আমিও নিজের সিদ্ধান্তে অটল, 'হয় তুমি আমাকেও বাবার কাছে নিয়ে চলো। নয়তো তাঁকে ফেরত দাও।'

মৃত্যু কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এই তোমার শেষ কথা? বাবাকে না নিয়ে তুমি যাবে না?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো করে ভেবে বলছ তো?'

তার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। চোখদুটো যেন ঝিলিক মেরে উঠল। আমি নিদ্বিধায় জানালাম, 'ইয়েস।'

সে একটু হাসল, 'ঠিক আছে। তবে তাই হবে। আগামী শুক্রবার রাত এগারোটায় তুমি তোমার বাবাকে ফেরত পাবে।' তারপর একটু থেমেই যোগ করল, 'মনে রেখো, মৃত্যু কখনও কথার খেলাপ করে না। জীবন বিশ্বাসঘাতকতা করে। মৃত্যু করে না। তাই আমার কথা সত্যি হবেই। কিন্তু তুমি কাজটা ঠিক করলে না, পুয়োর চাইল্ড!'

বলতে বলতেই সে মিলিয়ে গেল। এতক্ষণ আমার শরীরটা খুব হাল্কা মনে হচ্ছিল। এবার সেই তুলোর মতো দেহই যেন লোহার মতো ভারী ঠেকল। আমি আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালাম! প্রথমেই একটা প্রচণ্ড চোখ ধাঁধানো আলো! পরক্ষণেই চোখে পড়ল স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তার ডঃ হ্যারল্ড ডি'মেলোর মুখ! তিনি আমার হাতের ক্ষত সেলাই করে দিয়েছিলেন। কয়েক বোতল ব্লাডও দিতে হয়েছিল। আমার প্রতিবেশী রোজি আন্টি যখন আমাকে ওই অবস্থায় আবিষ্কার করেন, ততক্ষণে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে গিয়েছিল। বাঁচার আশা কম ছিল। কিন্তু মৃত্যুর কথা মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি জীবনে ফিরলাম...।'

এই অবধি বলেই নাতালিয়া থামলেন। গভীর কৌতূহলে জর্জ তখনও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন, 'কিন্তু আপনার বাবা? তিনি কি ফিরেছিলেন?'

নাতালিয়া মৃদু হাসলেন, 'আগেই তো বলেছি, মৃত্যু কখনও কথার খেলাপ করে না!'

৩

সেদিনটার কথা আমি কোনওদিন ভুলব না।

সদ্য হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি। কিন্তু সেদিন একটুও ক্লান্তি বোধ করিনি। বরং আনন্দে, উৎসাহে টগবগ করে ফুটছিলাম। কারণ দিনটা ছিল শুক্রবার। সেদিনই বাবার ফিরে আসার কথা। বাবা ফিরবেন ভেবেই মনের মধ্যে জলতরঙ্গ বাজছিল। বাবা তাঁর প্রিন্সেসের কাছে ফিরে আসবেন! আবার আমরা একসঙ্গে আনন্দে জীবন কাটাব। বাবা পিয়ানো বাজাবেন, আমি নাচব। সুখে, দুঃখে ফের তাঁর সস্নেহ স্পর্শ অনুভব করব। তিনিই আমার জীবন, আমার পৃথিবী। আমরা দুজনে মিলে গাইব, 'ফর ইওর গ্রেস ইজ এনাফ...!'

সকাল থেকেই তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য নানা তোড়জোড়ে মেতে ছিলাম। তিনি অর্কিড পছন্দ করতেন বলে তাঁর ঘরটা অর্কিড দিয়ে সাজিয়েছি। ফুলদানিতে লাল গোলাপ ঝলমল করছে। তাঁর

ইজেল, তুলি, রং; সব গুছিয়ে রাখা আছে। আমি সারাদিন ধরে তাঁর ফেভারিট ডিশ বানিয়েছি। চিকেন ক্যাফ্রিল, প্রন কারি আর তাঁর পছন্দের ফ্রুট কাস্টার্ড! যেন বাবা মারা যাননি! কোনও দূর বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। আজ ফিরবেন।

আস্তে আস্তে ঘড়ির কাঁটা রাত এগারোটার দিকে চলল। ততক্ষণে গোয়ার পল্লি নির্জন হয়ে গিয়েছে। এখানে সবাই আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যেই ডিনারের পাট চুকিয়ে ফেলে। রাত ন'টা নাগাদ সব বাড়ির আলো নিভে যায়। সেদিনও তাই হয়েছিল। চতুর্দিকে তখন শুধু অন্ধকার। শুধু আমি ঘরে আলো জ্বেলে নিজের ঈপ্সিত মানুষটির প্রতীক্ষা করছি। বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে। সত্যিই বাবা ফিরবেন তো! নাকি পুরোটাই মৃত্যুর মিথ্যে আশ্বাস! কিন্তু সে যে বলেছিল, তার কথার খেলাপ হয় না!...

'ঠক ঠক ঠক!'

ঘড়িতে ঠিক এগারোটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় করাঘাতের শব্দ! পরক্ষণেই রাস্তার কুকুরগুলো যেন প্রবল আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছে! এমন পরিত্রাহি চিৎকার করছে যেন তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কোনও বিভীষিকা! আমি লাফ মেরে উঠে দরজার দিকে ছুটে যাই। বাবা এসেছেন...! বাবা ফিরে এসেছেন! মৃত্যু তার কথা রেখেছে!

কিন্তু দরজা খুলে যা দেখলাম তাতে ভয়ে রক্ত হিম হয়ে গেল!

হ্যাঁ, কোনও সন্দেহই নেই যে বাইরে যে লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে আমার বাবাই। কিন্তু এ কোন বাবা! এখন তো তাঁর বুকে আমার ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা! অথচ আমি এক পাও এগোতে পারছি না! পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছি! এই কি আমি চেয়েছিলাম!

বাবার সমস্ত দেহ কাদায় আর রক্তে মাখামাখি! সদ্য কবর থেকে বেরিয়ে এসেছেন! চোখদুটো যেন হিংস্র জন্তুর মতো জ্বলছে! তাঁর দৃষ্টিতে কোনও স্নেহ, কোনও মায়া-মমতা নেই। মাথার একদিকটা গাড়ির তলায় পিষে গিয়েছিল। সেই দিকটা থেঁতলানো! মুখের কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। ডান হাতটা ঝুলঝুল করছে। সে হাতের একটিও হাড় অবশিষ্ট নেই। পোস্টমর্টেমের ফলে যে সেলাই পড়েছিল, সেই সেলাইগুলো থেকেও টপটপ করে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে! একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছে তাঁর মুখ থেকে। যেন তাঁর সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে!

আমি কোনওমতে বললাম, 'বা-বা!'

'কেন ডেকেছিস!' বাবা উন্মত্ত আক্রোশে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাঁ হাতে আমার গলা টিপে ধরে বললেন, 'কেন ফিরিয়ে এনেছিস আমায়? এতদিন আমি শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিলাম! কোনও যন্ত্রণা ছিল না, কোনও কষ্ট ছিল না! আর এখন যন্ত্রণায় আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে! সারা গায়ে সেলাই! একটা হাত অকেজো! মাথায় অসহ্য ব্যথা! ওঃ ঈশ্বর! আমি মরে যাচ্ছি...!'

আমার দমবন্ধ হয়ে আসছিল। তবু কোনওমতে বললাম, 'তোমার সমস্ত ব্যথা ডাক্তারেরা নিশ্চয়ই কমিয়ে দেবেন বাবা...।'

বাবা দাঁতে দাঁত পিষে গর্জন করে উঠলেন, 'কে কমাবে? ডাক্তারেরা আমার এই রূপ দেখলেই ভয়ে পালিয়ে যাবে! একদিকের মাথাটা থেঁতলে গিয়েছে। দুনিয়ার কোন ডাক্তার এটা ঠিক করবে? একটা হাতের সব হাড় ভেঙে গিয়েছে, আমি আর কখনও রং, তুলি ধরতে পারব না! যারা এতদিন আমায় ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত; তারা আমার ধারে-কাছে ঘেঁষবে না! সারাজীবন এই বীভৎস দেহ নিয়ে আমায় ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হবে। সারাজীবন এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সবাই আমায় পিশাচ ভাববে; সেই পিশাচ, যে নারকীয় রূপ নিয়ে কবর থেকে উঠে এসেছে! ওঃ...ওঃ...কী অসহ্য যন্ত্রণা! আর এসব হয়েছে তোর জন্য! হোয়াই! হোয়াই...!'

বাবা কিছুক্ষণ কথা বলেই যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগলেন! বাঁ হাতে তখনও চেপে ধরে রেখেছেন আমার গলা। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে! স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই মানুষটি আর যাই হোক, আমার পরিচিত বাবা নয়। তাঁর দেহটা ফিরে এসেছে ঠিকই; কিন্তু তিনি ফেরেননি! আমি যাঁকে চেয়েছিলাম, এ মানুষ সে নয়!

'কিন্তু বাবা...!' তবু কোনওমতে অতিকষ্টে বলি, 'আমি যে তোমায় ছাড়া বাঁচব না! তুমি ছাড়া এই দুনিয়ায় আমার কেউ নেই।'

'নিজের স্বার্থে তুই আমার শান্তিভঙ্গ করলি!' বাবার চোখদুটো তখন রক্তপিপাসু বাঘের মতো ক্রুর! তিনি প্রচণ্ড শক্তিতে আমার গলা পিষতে পিষতে বললেন। 'তুই আমায় ছাড়া বাঁচবি না? তবে মর...!'

বাবার হাতে তখন কী প্রচণ্ড শক্তি! যিনি কখনও আমাকে একটা কড়া কথাও বলেননি, আজ তিনিই পাশবিক শক্তিতে আমার টুঁটি টিপে ধরেছেন। আমি আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে যাচ্ছিলাম। দম নিতে না পারার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ক্রমশ নেতিয়ে পড়ছি। চোখদুটো বুঁজে আসছে। আর পারছি না...আর পারছি না...!

তখনই ফের দেখা দিল সে! সেই অপূর্ব মুখ, সেই নীল চোখদুটোয় অপার শান্তিময়তা, সেই প্রাজ্ঞ দৃষ্টি! তার আলোকিত মূর্তি আমার বন্ধ চোখের ভেতরে ভেসে উঠল। সে ফের বলল, 'তুমি আবার এসেছ! বললাম যে তোমার সময় হয়নি। তোমাকে দেওয়া কথা তো রেখেছি আমি। তবে আবার এলে কেন?'

আমি অতিকষ্টে বললাম, 'আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। ক্ষমা করো। নিজের স্বার্থপরতায় আমি বাবার কথা একবারও ভাবিনি।'

তার দু-চোখে রহস্যময় হাসির ঝিলিক, 'আমি তো তোমাকে আগেই বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম যে তিনি যেখানে আছেন, শান্তিতেই আছেন। তুমি আমার কথা শুনলে না!'

আমি দু-হাত জোড় করে বলি, 'আমি নিজের মূর্খামির জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। তুমি বাবাকে ফিরিয়ে নাও। তাঁকে সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও।'

'কিন্তু আগেই তো তোমায় বলেছি, মৃত্যু কথার খেলাপ করে না। একবার কথা যখন দিয়ে ফেলেছি, তখন প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করি কী করে?'

তার ঠোঁটে সুমধুর হাসি। নীল চোখদুটো যেন ক্রমাগত আমায় আবিষ্ট করে ফেলছে। আমার সারা দেহ, সারা মন আকস্মিকভাবে শান্ত হয়ে গেল। একটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে আসছে চোখের সামনে। তবে কি আমি মারা যাচ্ছি...?

কথাটা ভাবতেই কানের কাছে শুনলাম তার কণ্ঠস্বর, 'না। তুমি মারা যাচ্ছ না। তুমি ফিরে যাচ্ছ। আমি আমার কথা রেখেছি; আজ পর্যন্ত কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। তোমার সঙ্গেও করব না। এখন তুমি জীবনের দিকে যাও। নির্দিষ্ট আয়ু সানন্দে অতিবাহিত করো...। যাও...ফিরে যাও...ফিরে যাও...!'

আমি সেই কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

৪

'তারপর?'

জর্জ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। নাতালিয়া থেমে যেতেই প্রশ্ন করলেন, 'তারপর কী হল?'

নাতালিয়া ঠোঁট টিপে হাসলেন, 'সেই তার সঙ্গে শেষ দেখা। তারপর যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম আমি নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছি। সম্পূর্ণ একা! চারিদিকে কেউ নেই! বিশ্বাস করুন জর্জ, আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম! বুঝলাম, মৃত্যু বাবাকে সমস্ত কষ্ট, সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। তাঁকে ফিরিয়ে নিয়েছে।'

'কিন্তু তাহলে তো মৃত্যুর দেওয়া প্রতিশ্রুতি আর রইল না।' জর্জ অধীর কণ্ঠে বললেন, 'কথার খেলাপ হয়ে গেল যে!'

'নাঃ!' নাতালিয়া মৃদু অথচ আত্মমগ্ন স্বরে জানান, 'সে নিজের কথা রেখেছিল। শুধু যেমনভাবে আমি চেয়েছিলাম, তেমনভাবে নয়।'

'তবে?...' তিনি আরও কিছু বলার আগেই পেছন থেকে আওয়াজ এল :

'হাই প্রিন্সেস!'

জর্জ অবাক হয়ে পেছনের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন। এ কী! এ কে! কে হাসতে হাসতে নাতালিয়ার দিকে হেঁটে আসছে! তাঁর হাতের অ্যালবামের ছবি থেকে যেন উঠে এসেছে এই যুবক! সেই লম্বা ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, কাটাকাটা মুখ! প্রশস্ত কপালের নীচে শান্ত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। থুতনিতে একটা কাটা দাগ। অবিকল ছবির মতোই! এ কি তবে নাতালিয়ার বাবা! স্টিভ গঞ্জালভেস! অসম্ভব...!

যুবকটি নাতালিয়াকে সস্নেহ ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি আজকে আবার ওষুধ স্কিপ করেছ প্রিন্সেস! এ কীরকম কথা! আমি গুনে না দেখলে তো বুঝতেই পারতাম না যে ওষুধটা তুমি খাওনি! আমি না থাকলে যে তোমার কী হবে...!'

নাতালিয়া একেবারে বাধ্য মেয়ের মতো মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, ‘সরি বাবা! এক্সট্রিমলি সরি!’ বলতে বলতেই তিনি যুবকটির সঙ্গে জর্জের আলাপ করিয়ে দিলেন, ‘মিঃ জর্জ উইলিয়ামস, ইনি আমার সেকেন্ড ফাদার ফ্রান্সিস গোমস!’

জর্জ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন! ফ্রান্সিস নাতালিয়া ও রবার্টের সুপুত্র! তাকে দেখে আঁতকে উঠেছিলেন ভেবে এখন হাসিই পেল! তাই তো! নাতি কি দাদুর মতো দেখতে হতে পারে না! তিনিও সত্যি! নাতালিয়ার অলৌকিক গল্প শুনে নিজেই ভুলভাল কল্পনা করছিলেন।

ফ্রান্সিস মৃদু হেসে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোতেও তার হাতের দিকে তাকিয়েই ফের চমকে উঠলেন জর্জ! ও কী! ওর হাতে এমন সাদা সাদা আঁচড়ের দাগ কীসের? দেখলে মনে হয় যেন কোনও সময়ে হাতে ট্যাটু করা হয়েছিল! এখন ঘষে কালিটা শুধু মুছে দেওয়া হয়েছে! কিন্তু অক্ষরগুলো এখনও পড়া যায়।

নাতালিয়া বোধহয় তাঁর বিস্ময় বুঝতে পেরে হেসে বললেন, ‘ওটা ওর জন্মদাগ। বার্থ সাইন! ওই দাগ নিয়েই ও জন্মেছে।’

জর্জ বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলেন আঁচড়ের দাগগুলো যেন কিছু ইংরেজি হরফের অস্পষ্ট রূপ। পড়তে বেশি কষ্ট হয় না। তিনি স্পষ্ট দেখলেন ফ্রান্সিসের জন্মদাগে লেখা আছে, ‘নাতালিয়া’!

মৃত্যু সত্যিই কথার খেলাপ করেনি। সে কথা রেখেছিল! শুধু যেমনভাবে নাতালিয়া ভেবেছিলেন, তেমনভাবে নয়! জর্জ শুনলেন ফ্রান্সিস আর নাতালিয়া একসঙ্গে গেয়ে উঠলেন :

‘ফর ইওর গ্রেস ইজ এনাফ...’

—

জলের দাগ

শেষ রাতের আকাশটায় তখন নীলচে আভা। নীলাভ ধোঁয়ার পাতলা চাদর অবিন্যস্তভাবে ঘুরে ঘুরে উড়ে চলেছিল আকাশের দিকে। সারারাত জ্বলে জ্বলে ক্লান্ত চাঁদ ঠাঁই নিয়েছে আকাশের এককোণে। জ্যোৎস্নায় ধোঁয়ার শরীর মাঝে মাঝে বড় অলৌকিক বলে মনে হয়। যেন একরাশ অপূর্ণ ইচ্ছের ছায়ামূর্তি চাঁদের আলোয় ভিজে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে; নিঃসঙ্গ, কায়াহীন ও অসহায়!

বড় বড় নিষ্প্রভ চোখদুটো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল! দেখার বিষয় বলতে তেমন কিছু নেই। কলকাতার একটা পুরোনো বাড়ির ঘর আর আশেপাশের উদ্বিগ্ন মুখগুলো ছাড়া। একেবারে বিছানায় মিশে যাওয়া কঙ্কালসার মানুষটার আত্মীয়স্বজন অমোঘ উদ্বেগে দেখছিল পাঁজরসর্বস্ব বুকের ওঠাপড়া আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসছে। জীর্ণ ফুসফুস হাতড় হাতড়ে খুঁজছে অক্সিজেন। এমন বাতাসে ভরা পৃথিবীতে আজ শুধু এই একটি মানুষের জন্য এক ফোঁটা অক্সিজেনও বরাদ্দ নেই।

বড় কষ্টকর এই দৃশ্য! তবু দেখতেই হয়!

ডাক্তার একটু আগেই দিয়ে গেছেন শেষ জবানবন্দি—

—'অবস্থা খুবই খারাপ। আমি ইঞ্জেকশন দিয়ে গেলাম। কিন্তু কাজ কতদূর হবে......' তারপরই অনিশ্চিত অথচ বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'আর হয়তো ঘণ্টাখানেক সময়......'

ঘণ্টাখানেক সময়! ঘণ্টাখানেক সময় কি আদৌ যথেষ্ট? একটি মানুষের দীর্ঘ পঁচাশি বছরের সমস্ত সাধ, সমস্ত আকাঙ্ক্ষার গায়ে দাঁড়ি টেনে দেওয়ার জন্য এক ঘণ্টা সময় কতটুকু! একদিকে পঁচাশি বছর; অন্যদিকে একঘণ্টা! তবু আজ বোধহয় সেই একঘণ্টাই পঁচাশি বছরকে মাত দেয়!

ফ্যালফ্যালে চোখদুটো ফের ঘুরল উপস্থিত সকলের দিকে। চোখের সামনে সবটাই আবছা। তবু দৃষ্টি বারবার খুঁজে বেড়াচ্ছিল কিছু নির্দিষ্ট মুখ। কার মুখ কে জানে! মানুষটার জীবনে যে মুখগুলো বারবার উঠে এসেছে সেই মুখের সারি তার চারিদিকে মজুত। অথচ এই মুহূর্তে তাদের কাউকেই মনে পড়ল না। বরং মনে পড়ে গেল এক বিরাট মাঠের কথা!......

সেই মাঠের বুকে কাশবন হাওয়ার সাথে খেলা করত। মাঠের একপাশে ছিল স্বচ্ছ টলটলে বিরাট ঝিল। ঝিলের বুক থেকে উঠে আসা দামাল হাওয়ায় ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়াত এক দুষ্টু কিশোর। কচি কচি ঘাসের উপর দিয়ে খালি পায়ে দৌড়ে যেত এক অদ্ভুত খেয়ালে। কখনও নারকেলবাগানে, কখনও আমবাগানে দস্যিপনা করে কেটে যেত দিন......।

—'বাবা...বাবা...!'

মস্তিষ্ক যেন সামান্য সাড়া দিয়ে উঠল। ইতস্তত এদিক-ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে চোখ। এবার সামনে ঝুঁকে পড়া মুখটার দিকে ন্যস্ত হল।

—'বাবা?'

—'উঁ?'

—'কী খোঁজো? কাকে খোঁজো?'

ফের উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি চতুর্দিকটা অদ্ভুত ঘোর নিয়ে জরিপ করতে শুরু করল।

—'কী খুঁজছ বাবা?'

ঘড়ঘড় একটা শব্দ। অতিকষ্টে গলা দিয়ে বেরোল প্রশ্নের উত্তর—

—'আমার দ্যাশ!'

গল্প—১

মাঠের ওপ্রান্তে ছিল করিমচাচাদের বাড়ি। ছোট্ট একফালি সবুজ দিয়ে ঘেরা একটা অনাড়ম্বর মাটির ঘর। মাচায় লাউ, কুমড়ো লতায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ফলে থাকত। সামনের ছোট্ট সবজি বাগানটা করিমচাচা বড় সযত্নে গড়ে তুলেছিলেন। যখনই এক ছোট্ট বালক সেখানে গিয়ে হানা দিত, তখনই তার হাত ধরে আদর করে দেখাতেন—

—'মনু, দেখছ নি? কেমন কাঁচালঙ্কা হৈছে গাছডায়?'

উত্তরে আসত একটা ছোট্ট সবিস্ময় প্রশ্ন, 'এইডা কাঁচালঙ্কার গাছ চাচা?'

—'হঃ।' তিনি সগর্বে মাথা নাড়তেন, 'এইবার ভালা ফলছে। দেখছ কেমনি লাল, সইবজা; টোপা টোপা হইছে। সোন্দর না?'

মনু কোনওদিন বেশি প্রশ্ন করত না। অবাক হয়ে দেখত করিমচাচার মুখে শরতের আলো! মা বলত, করিমচাচারা নাকি বড় গরিব, অন্যের খেতে ভাগচাষি হয়ে খাটে। দু-বেলা নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। অথচ ওই মুহূর্তে মানুষটা যেন ঐশ্বরিক আনন্দে দেখিয়ে যেত একের পর এক তার সৃষ্টি।

—'মাচায় কুমড়াখান কেমন হইছে কও দেহি!' তিনি সগর্বে ঘোষণা করলেন, 'লতিফের আম্মায় কইতাছিল; লতাখান বাঁচব না! আমি কই, চাষার হাতে পড়লে ধানের তুষও কথা কয়! আর এ তো হইল গিয়া একখান কুমড়ার লতা! বাঁচব না মানে! বাঁচাইয়াই তয় ছাড়ুম!'

করিমচাচার কথায় ছোট্ট মনু ফিক করে হেসে ফেলে। সরল অনাড়ম্বর আন্তরিকতায় তার ক্ষুদ্র হৃদয়ও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। করিমচাচার মাটির বাড়িটাই যে কখন নন্দনকাননে পরিণত হয়, সে টেরও পায় না।

—'সোন্দর হইছে না মনু? নিবা নাকি?'

সে দেশে কেউ কোনওদিন শিখিয়ে দেয় না যে অন্যের জিনিস কখনও নিতে নেই। কারুর অযাচিত স্নেহের দানের পিছনে সন্দেহতীক্ষ্ণ ভ্রূকুটির কথাও মনে পড়ে না। শুধু মায়ের সামান্য বকুনিটুকুর ভয়ে সে মিনমিন করে বলে, 'থাউক চাচা, মায় রাগ করব। কইব, হ্যাংলাপানা.........!'

—'মা জননীরে আমি কইয়া দিমু সনা। মায় কিস্যু কইব না'। করিমচাচা তার মাথার চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলেন, 'তাইলে নিবা তো?'

মনু হেসে ঘাড় কাত করে দেয়। তিনি যেন স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেন। যেন তাঁর সোনার ফসলের প্রথম ভাগটা কোনও দেবতার হাতে সমর্পণ করছেন। স্বার্থহীন দেওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ তা বোধহয় করিমচাচার কাছেই শিখেছিল তাঁর স্নেহের 'মনু'।

এমনই ছিলেন করিমচাচা। হঠাৎ হঠাৎই কথা নেই বার্তা নেই এসে পড়তেন বাড়িতে। কখনও ঘাড় থেকে নামত কলার কাঁদি, কখনও রাঙা আলু, কখনও বা লাউ, কুমড়ো। কখনও আবার হাঁকডাক করে বলতেন, 'অ-মা জননী। মনু আইজ আমাগো ঘর খাইবে। ইদের নিওতা দিলাম।'

মা আশ্চর্য হয়ে যেতেন। আশ্চর্য হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। যে মানুষটার নিজেরই অন্ন সংস্থান নেই সে যখন হাসিমুখে এসে খাওয়ার নিমন্ত্রণ দেয় তখন অবাক লাগেই বটে। কখনও কখনও জানাতেন মৃদু প্রতিবাদও :

—'না করিম, এইবার থাউক গা।'

—'না মা, এইডা তুমি কি কইলা? থাকব না।' করিমচাচা জোরালো গলায় বলতেন, 'মনুরে পাঠায়া দিও। কোনও কথা শুনুম না।'

অগত্যা। মা একটু দ্বিধা করতেন বটে। কিন্তু মনুর কোনও দ্বিধা ছিল না। সময় হলেই সে নাচতে নাচতে বাবার হাত ধরে পরমোৎসাহে গিয়ে হাজির হত করিমচাচার বাড়ি। ডাল, ভাত, ভাজাভুজি, ঝাল ঝাল মাংসের ঝোল আর সিমুইয়ের পায়েস প্রায় অমৃতজ্ঞানে খেত। করিমচাচার মুখে শুনত পদ্মাগাঙের ডাকাতদের গল্প। যারা বহু বছর আগে নৌকো করে নদীর বুকে ভেসে বেড়াত, আর বড়লোকদের বজরা দেখলেই লুটে নিত। একেকজনের ইয়া মস্ত বড় গোঁফ ছিল। ভাঁটার মতো লাল চোখ আর বুক প্রায় পিপের মতো চওড়া!

—'চাচা, তুমি ডাকাইত দেখো নাই?'

—'খুব দেখছি মনু।'

—'আমারে দ্যাখাবা?'

—'দেখামু হ'নে।'

—'কবে দ্যাখাবা?'

করিমচাচা একটু ভেবে উত্তর দিতেন, 'ডাকাইত দ্যাখলে তুমি ডর খাবা না তো মনু?'

মনু বুক ফুলিয়ে বলত, 'ভয় পামু ক্যান? উল্টা দিমু একখান চোপাড়!'

তিনি হো হো করে হেসে উঠতেন। মনুর বাবাকে উদ্দেশ করে বলতেন, 'শোনছেন নি কত্তা? কী কয় আপনের পোলায়! বড় হইয়া আমাগো মনু দারোগা হইবো হ'নে।'

এরপর থেকে করিমচাচার সাথে প্রায়ই গোপনে গজল্লা হত। কোথায় ডাকাত দেখতে যাবে, কেমন করে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি...।

আর সাথে সাথেই উঠে আসত একটাই প্রশ্ন, 'ডাকাইত কবে দ্যাখাবা আমারে...ও চাচা!'

সহাস্য উত্তর, 'এই তো, দেখামু।'

শেষ পর্যন্ত আর ডাকাত দেখা হয়নি মনুর। পরের বর্ষাতেই কী এক অজানা জ্বরে তিনদিন ভুগে সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন করিমচাচা। এক অদৃশ্য ডাকাত তাঁকেই ছিনিয়ে নিয়ে গেল সবার কাছ থেকে।

শেষের দিকে করিমচাচাকে কেমন যেন ফ্যাকাশে সাদা ঘুড়ির মতো লাগছিল। এক্ষুনি যেন উড়তে উড়তে কোথায় হারিয়ে যাবে।

করিমচাচার বৌ, ছেলে লতিফ খুব কাঁদছিল। মনু বুঝতে পারেনি কীজন্য সবার এত মন খারাপ। সে প্রশ্ন করেছিল—

—'চাচা, তোমার কী হইছে?'

ক্লিষ্ট হেসে উত্তর দিয়েছিলেন চাচা, 'কিছু হয় নাই বাপ।'

—'তয় চাচি কাঁদে ক্যান?'

—'আমার তবিয়ৎ খারাপ, তাই কাঁদে।'

একটু আশ্বস্ত হয়ে ফের সেই প্রশ্নটা করল সে, 'আমারে ডাকাইত দ্যাখাবা না?'

অদ্ভুত অর্থপূর্ণ হাসি হেসেছিলেন করিমচাচা। তখন সে হাসির অর্থ বোঝেনি। পরে বুঝেছিল ওটা ফাঁকি দিতে পারার আনন্দের হাসি।

করিমচাচা ফাঁকি দিয়েছিল। কথা রাখেনি।

গল্প—২

সে দেশে আকাশটা বিরাট বড় ছিল। তেমন আকাশ বোধহয় আর কোথাও দেখা যায় না। শান্ত আকাশের গায়ে রোদের ঝিকিমিকি হাসি। নীচে কলকল ছলছল করে তরঙ্গে তরঙ্গে বয়ে চলেছে পদ্মা নদী। আকাশের সাথে এমন ভাবে দিগন্তে মিশেছে যে দেখলে চমকে যেতে হয়। মনে হয় আকাশটাই যেন চঞ্চল হয়ে নেমে এসেছে পদ্মার গা বেয়ে। দুই বিশালত্ব একাকার হয়ে মিলে গেছে অসীমে!

বিকেলের আলো পদ্মায় চুঁইয়ে পড়ত। পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি তখন পড়ন্ত রোদের আদরে চিকমিক করে উঠত। আদুরে স্রোতে অভ্রমাখা আঁচল উড়িয়ে কখনও ঘূর্ণনে, কখনও সরলরেখায় ছপছপ করে নেচে চলে সে।

তার পাড়ে বসে মুগ্ধ চোখে সেদিকেই তাকিয়ে থাকত দুই কিশোর। আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে আসে। জেলেদের নৌকোর বাতিগুলো মিটমিট করে জোনাকির মতো জ্বলে ওঠে। মাঝেমধ্যে নদীর বুক থেকে উঠে আসা কুয়াশা ম্লান করে দিত সে দ্যুতি। কিন্তু সে অস্পষ্টতা ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ পরেই ধোঁয়াশা কেটে প্রকট হয়ে ওঠে টিমটিমে আলোর বিন্দু। মনে হত আকাশের তারাগুলো আকাশ বেয়ে বুঝি নেমে এসেছে নদীর জলে! আলোর মালায় সেজে উঠত পদ্মা। আর তার কালো জল মসৃণ গতিতে চলতে চলতে আওয়াজ তুলত ছপছপ!

—'মিতা......' সিরাজ তার কোঁচড় থেকে বের করে আনত পানিফল। মিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলত, 'আমি বড় হইয়া মাঝি হমু। তুমি কী হইবা?'

মিতা তখনও ভেবে উঠতে পারেনি বড় হয়ে সে কী হবে! সে নির্বিবাদে একটা পানিফল মুখে পুরে দিয়ে বলে, 'কখুনও ভাবি নাই; কিন্তু তুমি মাঝি হইবা ক্যান?'

সিরাজের মুখে মাঝিদের নৌকোর আলো ঝলমল করে উঠত। তার একটা ভেঁপু ছিল। ওই ভেঁপুটা বোধহয় তার প্রাণের থেকেও প্রিয়। সবসময়ই তার কোমরে গোঁজা থাকত। সেই ভেঁপুতে গোটাকয়েক টান মেরে বলত সে, 'আমি পদ্মায় নাও বাইয়া বেড়ামু। জাল ফালাইয়া ইলশা ধরুম। আর দিবারাত্তর গলা ছাইড়া গান গামু। দ্যাখো নাই? মাঝিরা কী সুখেই না গান গায়! পদ্মার পানিতে কী সুখ মিতা, জানো নাই!'

—'তয় আমিও মাঝি হমু।'

সিরাজ মায়া জড়ানো হাসি হাসে, 'না, তুমি মাঝি হবা না। তুমি অনেক বড় হইবা! জজ-ম্যাজেস্টর হইবা! আমাগো মুখ রওশন করবা।'

মিতার একটু সন্দেহ হয়। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হলে সিরাজের সাথে আর দেখা হবে কি? সে কথা বলতেই সিরাজ ফের হাসে, 'ক্যান? দ্যাখা হইব না ক্যান? আমি মাছ ধইরা তোমারে দিমু, আর তুমি খাবা!'

ব্যস, এইটুকুতেই নিশ্চিন্ত!

এভাবেই সন্ধেটা কাটত। নদীর পাড়ে বসে, কখনও ভেঁপু বাজিয়ে, কখনও সুখ-দুঃখের কথা বলে। সিরাজ প্রায়শই বলত, 'বোঝলা মিতা, আববাজান আমারে মেলায় এই ভেঁপুডা দিছিল। আর তারপরই কলেরায় লোকডা মইরা গেল। আমাগো ঘরে দামি কিস্যু নাই। থাকনের মধ্যে এই ভেঁপুডা! এডারে আমি মরলেও ছাড়ুম না। এইডা আমার আববাজানের চিহ্ন।'

আর সকালবেলাটা কাটত ঘুড়ি উড়িয়ে। বিস্তৃত মাঠের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি সিরাজ আর তার মিতা খালি পায়ে দৌড়ে বেড়ায়......

—'মিতা-আ-আ! তোমার ঘুড়ি কাটছে...কা-ট-ছে রে-এ-এ......।'

এরপরই শুরু হত প্রতিযোগিতা। কে আগে গিয়ে কাটা ঘুড়ি ধরতে পারে।

মাঠের নরম শিশিরবিন্দু এই কাণ্ড দেখে ঝলমলিয়ে হাসত। ঝিলের বুক থেকে হু হু করে হাওয়া এসে লুটোপুটি খেত দুই কিশোরের গায়ে। জলে বড় বড় শালুক অবাক হয়ে চেয়ে দেখত সেদিকেই। সোনালি রোদ যেন আকাশের অনাবিল আনন্দধারার মতো গলে গলে পড়ত!

খোলা মাঠে, তাজা শিশির পায়ে মাড়িয়ে ছুটে চলেছে দুজনে। দুজনের খিলখিল হাসি খোলা মাঠ ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে খোলা আকাশে। কাটা ঘুড়ি বাতাসের টানে গোঁত্তা খেতে খেতে পড়ল গিয়ে পুঁটে গাজিদের বাগানে! আটকে গেল গাছে।

পুঁটে গাজিদের বাগান আলো করে ফলে থাকত কুল, বৈঁচি, আমড়া! থোকায় থোকায় পাকা কুল ঝুলত বোঁটায় বোঁটায়।

—'রও মিতা, আমি দেখতাছি...'

চোখের পলকে ভেঁপুটা কোমরে গুঁজে তরতর করে গাছ বেয়ে উঠে যায় সিরাজ! একহাতে কাটা ঘুড়ি ধরে আরেক হাতে পটাপট ছিঁড়ে নিত কুল। একটা করে নিজের মুখে পুরত, আর গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ছুঁড়ে দিত নীচে; যেখানে কোঁচড় পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মিতা।

—'এই ক্যাডা! ক্যা-ডা-রে?'

হঠাৎই বাগানের ওপ্রান্ত থেকে ভেসে আসে কর্কশ চিৎকার। সিরাজ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখে উল্টোদিক থেকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে পুঁটে গাজি! খালি গা, পরনে লুঙ্গি আর পায়ে একজোড়া শতছিন্ন বুটজুতো! এই বুটজোড়া তাকে কে দিয়েছিল কে জানে! কিন্তু সর্বক্ষণই সে বুটজুতো পরে থাকত।

—'পলাও...পলাইয়া যাও মিতা!'

উপর থেকে চেঁচিয়ে বলে সিরাজ। কিন্তু সিরাজের মিতা অনড়! সে বন্ধুকে ছেড়ে যাবে না!

কোনওমতে তড়বড় করে গাছ থেকে নেমে আসে সিরাজ। বন্ধুর হাত কষে ধরে বলে, 'পলাও।'

পুঁটে গাজি ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে। দূর থেকে তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় চিৎকার করে বলে, 'হালা নি-বৈবং-শা! চুরি করতাছ! হা-লা, কাইট্টাই ফেলুম!'

বলেই ছেলেদুটোর পিছনে তাড়া করে। কিন্তু তাড়া করে আর কতক্ষণ পারবে! দুজনেই বয়েসে নবীন। দুরন্ত গতিতে মুহূর্তের মধ্যে পুঁটে গাজিকে পিছনে ফেলে ছুটে চলল। বাগান পেরিয়ে, ধানখেতের মধ্য দিয়ে। দুই ধারে সোনালি ধানখেত যতদূর চোখ যায় চলে গেছে। সেই আলের উপর দিয়ে দুই বালক হাত ধরাধরি করে দুষ্টুমি ভরা খিলখিল হাসি হাসতে হাসতে ছুটেই চলেছে...ছুটেই চলেছে!

পুঁটে গাজি কিছুদূর ধাওয়া করেও ধরতে পারত না দুই চোরকে। নিষ্ফল আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বলত, 'হা-রা-ম-জা-দা!'

দুজনেই ফের হেসে ওঠে। সিরাজ তার ভেঁপুটা বিজয় আনন্দে বাজায়। তারপর আলের উপর দাঁড়িয়েই পুঁটে গাজিকে খুব একচোট মুখ ভেঙচে ফের পালিয়ে যায়।

সিরাজের অভ্যাসই ছিল পরের বাগানে ডাকাতি করা! এর বাগান থেকে কয়েৎবেল, ওর বাগান থেকে আমড়া কিংবা কাঁচা আম; রোজই সে কিছু না কিছু চুরি করে আনত। ফলস্বরূপ কপালে মারধোরও জুটত। অনেকবার তার মিতা দেখেছে যে সিরাজের গালে পাঁচ আঙুলের দাগ, কপালে কালসিটে!

সে উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চায়, 'তুমি আইজ আবার মাইর খাইছো?'

সিরাজ কুলকুল করে হাসত, 'মাইর যত না খাইছি, লগে ফলও খাইছি বিস্তর। তুমার লাইগ্যাও আনছি।'

বলেই কোঁচড় থেকে বের করে দিত সব চুরির সম্পদ। দুজনে মিলে পদ্মার ধারে বসে সেই ফল খেত, ভেঁপু বাজাত আর গল্প করত। সিরাজ উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত নদীর দিকে আর বলত :

—'দেইখ্যো, আমি ঠিক মাঝি হমু। আর তুমারে নাও-এ লইয়া মাঝদরিয়ায় যামু। হেইখানে গিয়া আমি গান গামু আর তুমি ভেঁপু বাজাইবা! তোমাগো কেষ্টঠাকুর যেমনি বাঁশি বাজায়, তুমিও তেমনি কইরাই ভেঁপু বাজাইও মিতা। এ গাঙের পানিতে ভেঁপুর সুর বড় মিঠা লাগে।'

—'কিন্তু আমি তো ভেঁপু বাজাইতে পারি না!'

—'আমি পারি।' সিরাজ হেসে বলেছিল, 'আমি তুমারে শিখাইয়া দিমু'নে।'

এরপর পদ্মার জল অনেকদূর গড়িয়েছে।

সিরাজের মিতার বাবা প্রথমে কর্মসূত্রে ঢাকায় চলে গেলেন। কয়েকদিন বাদে ফিরে এসে তাঁর পরিবারকেও নিয়ে গেলেন।

যাওয়ার আগের দিন সিরাজ এসেছিল। ছলছলে চোখে বলেছিল :

—'তুমি আর এইহানে থাকবা না?'

মিতার চোখেও জল ছলকে উঠেছিল। ধরা গলায় বলে; 'বাবায় কয় আমাগো ঢাকা লইয়া যাইব। আমরা এহন হইতে ওইহানেই থাকুম।'

—'ভালা...' সিরাজ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, 'আমি শহর দেখি নাই। তুমি দ্যাখবা। ফিরা আইস্যা কইও শহরে কী কী দ্যাখলা। আসবা না?'

সে মাথা নাড়ে, 'আসুম।'

—'আর...' সিরাজ তার অতিপ্রিয় ভেঁপুটা বের করে এনেছে, 'এইহান রাহো।'

মিতা অবাক হয়েছিল! এই ভেঁপুটা সিরাজের প্রাণ! সে একমুহূর্তও ওটাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। অথচ......!

ভেঁপুটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নামাখা হাসি হেসেছিল সিরাজ, 'এডারে সামলাইয়া রাইখ্যো। তুমারে দিলাম। যেমনি এডারে বাজাবা, তেমনি আমারে মনে করবা। আমারে ভোলবা না তো মিতা?'

মিতা মাথা নাড়িয়ে জানিয়েছিল, কোনওদিন ভুলবে না।

পরদিন ভোরে সমস্ত বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে রওনা হল ওরা। গোরুর গাড়িতে যেতে যেতে সে দেখেছিল রাস্তার সমান্তরাল আলপথ দিয়ে ছুটে আসছে সিরাজ। যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর সে গাড়ির পিছনে ছুটতে ছুটতে এসেছিল। আর চিৎকার করে ডেকেছিল :

—'মি-তা-আ-আ-আ.........মি-তা-আ-আ-আ-আ......মি-তা-আ-আ-আ-আ......।'

ভেঁপু বাজানো আর শেখা হয়নি মিতার!

গল্প—৩

—'বরিশালে দাঙ্গা লাগছে দাদাভাই!'

ইসমাইল ভাইজানের কথাটা শুনে থ হয়ে বসেছিল দাদাভাই! এ তো লাগারই ছিল! দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল অনেকদিন থেকেই। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে আস্তে আস্তে চিড় ধরেছে।

সময়ের সাথে সাথেই ঘনিয়ে আসছিল তীব্র সঙ্কট! তার মধ্যেই গোটা বাংলা দু-টুকরো হয়ে গেল। ওপারের নাম হল পশ্চিমবঙ্গ। আর এপার : পূর্বপাকিস্তান!

তোড়জোড় আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। দাঙ্গা লাগতেও সময় লাগল না। দাঙ্গা ক্রমশই বিধ্বংসী রূপ নিচ্ছে। কোথাও শান্তি নেই; জনজীবনে থাবা বসাতে শুরু করল তীব্র আতঙ্ক।

তবুও সে কখনও ভাবেনি কোনওদিন এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার বাবা প্রথমে চাকরিসূত্রে ঢাকায় এসেছিলেন। পরে নিজেই কাঠের ব্যবসা ফেঁদে বসেন। অসম থেকে নদীর জলে ভেসে আসত কাঠ। সেই কাঠকেই প্রায় সোনায় পরিণত করলেন তার বাবা। ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল।

বাবা গত হওয়ার আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বাবার পর সে-ই ব্যবসার হাল ধরল। আপাতত সে বাড়ির কর্তা। সদ্যোজাত সন্তানের বাবা এবং একজন বড়সড় ব্যবসায়ী।

তাদের পাশের বাড়িতেই থাকেন ইসমাইল ভাইজান আর রেশমাভাবি। ইসমাইল তার থেকে বয়েসে বড় হলেও আদর করে তাকে 'দাদাভাই' ডাকতেন। ইদ উপলক্ষ্যে প্রত্যেকবারই থলে হাতে এসে হাঁকাহাঁকি শুরু করেন, 'দাদাভাই— দা-দা-ভা-ই! কই গেলা!'

দাদাভাই ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটে আসত, 'হ ভাইজান, কী হইছে?'

—'হইছে আমার মুন্ডু।' ইসমাইল হাতের থলে থেকে বের করতেন নতুন ধুতি, পাঞ্জাবি, শাড়ি আরও কত কী!

—'নাও, এইগুলান রাইখ্যা আমারে উদ্ধার করো।'

সে বিব্রত হয়ে বলে, 'ভাইজান, আবার কী আনছো?'

—'তক্কো কইরো না।' তিনি ছদ্মরাগ দেখিয়ে বলতেন, 'মুখে ভাইজান কও। আর কামের বেলায় লবডঙ্কা! ভাইজানের সওগাত লইতে শরম হয় বুঝি?'

এরপর আর কী বলা চলে! অগত্যা দাদাভাই থলেটা নিয়ে সুড়সুড় করে ভিতরবাড়িতে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই ভিতর থেকে মায়ের আবির্ভাব :

—'ইছমাইল, তুই কিন্তু কাইল এইহানেই খাইয়া যাইস। আমার বত্ত আছে। আর একা আইবি না। তর বিবিরে লইয়া আইস।'

—'এই, মা! তোমার হুকুমের লাইগ্যা বইস্যাছিলাম।' ইসমাইল আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসেন, 'কইছো যখন, তখন দুইডায় মিল্যা কাইল তোমার অন্নধ্বংস না কইরা নড়ুম না! মায়ের হুকুম তামিল না কইরা কি দোজখে যামু!'

এই ইসমাইল ভাইজানই প্রথম এনেছিলেন দুঃসংবাদটা। বিষণ্ণ মুখে বলেছিলেন :

—'দাদাভাই, ভালা বুঝি না। বরিশালে জব্বর দাঙ্গা লাগছে। মোল্লারা ঘুঙুর পইরা, মুখোশ পইরা হিঁদু কাটতাছে। হগগলডি কয় দাঙ্গা এহানেও লাগব'।

কথাটা শুনেই বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল তার। এর আগেও নোয়াখালিতে বিরাট দাঙ্গা লেগেছিল। দাঙ্গায় মারা গিয়েছে অসংখ্য হিন্দু। তাদের ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা

প্রাণে বেঁচেছে তারা এক কাপড়ে ও দেশে পালিয়ে গেছে। অনেকে পালালেও পৌঁছতে পারেনি। মাঝরাস্তাতেই তাদের রামদা, তলোয়ার দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা!

দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকেই যে অশান্তি ধিকিধিকি জ্বলছিল, তা একেবারে চরমে উঠল। অনেকের মুখেই শোনা গেল, এটা নাকি হিন্দুদের দেশ নয়! তাদের দেশ ভারতবর্ষ। আর এটা পূর্বপাকিস্তান! মুসলিমদের দেশ!

সেই শোনা কথাটাই অপরিসীম বেদনা নিয়ে উঠে এসেছিল দাদাভাইয়ের মুখে :

—'ভাইজান, এডা কি আর আমাগো দ্যাশ নাই? এই ধানখেত নদী মাঠ খাল-বিল দেইখ্যা বড় হইছি। এইহানে আমাগো বাপ পিতামো চোইদ্দ পুরুষের ভিটা! এই দ্যাশের ভাষায় কথা কই! রক্তে রক্তে পদ্মা বয়! তবু মানষে কয়—এই দ্যাশ আর আমাগো নাই! এই ভিটা ছাইড়া যাইতে কয়। যে দ্যাশডারে জনমে চক্ষেও দেখি হেইডা নাকি আমাগো দ্যাশ!'

চোখ ফেটে টপটপ করে জল পড়েছিল দাদাভাইয়ের। বুকের ভিতরের হাহাকার যেন গলা চুঁইয়ে পড়ল, 'আর কী করলে এই দ্যাশডা আমাগো হইব কইতে পারো ভাইজান?'

ইসমাইলের গলাও ব্যথায় বুঁজে এসেছিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

—'দাদাভাই, একটু সজাগ থাইক্যো। তোমাগো বড় ঘর। দাঙ্গা হইলে বিপাকে পড়বা। উয়ারা লুঠতরাজ করতে আছে। তোমাগো ছাড়ব না।'

—'কারা ছাড়ব না?'

—'মোছলমানেরা।'

কান্নাভেজা রাঙা চোখ দুটো তুলে বলেছিল দাদাভাই, 'তয় ভাইজান, তুমিও তো মোছলমান!'

ইসমাইল স্তম্ভিত হয়ে যান। কী বলবেন বুঝতে পারেননি। তাঁর চোখের পাতাও ভিজে গিয়েছিল। ধরা গলায় শুধু বললেন, 'হ, হক কথা কইছ বটে।'

তারপর আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিলেন। তার আদরের দাদাভাই তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে দেখেছিল অমন টানটান লম্বা চেহারার মানুষটা যেন শুধু একটা কথার ভারেই কুঁজো হয়ে গিয়েছে!

এরপর ভীষণ আতঙ্কে কেটে যায় কয়েকটা দিন। চতুর্দিকে কেমন যেন থমথমে পরিবেশ। বেতারে একের পর এক দুঃসংবাদ! সে খবর শুনে বজ্রাহত গাছের মতো 'থ' হয়ে যেত দাদাভাই। মনের ভিতরে আঁচড়ে বেড়াত একটা ভয়। তার ঘরে বৃদ্ধা মা, যুবতী বৌ আর সদ্যোজাত শিশু। কী হবে এদের?

অবশেষে সে রাতটাও এল! কোনওদিন সেই রাতটার কথা ভুলতে পারবে না সে!

তখন ঘড়িঘরে ঢংঢং করে বারোটার ঘণ্টা বাজছে। এক একটা ঘণ্টার সাথে হৃৎপিণ্ড যেন নেচে নেচে উঠছিল। এই ঘড়িঘরে রোজই ঘণ্টা পড়ে। কিন্তু কোনওদিন সে আওয়াজ এত ভয়ংকর মনে হয়নি! সেদিন মনে হচ্ছিল, ঘণ্টাগুলো যেন আসন্ন প্রলয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে!

ঘড়িঘরে বারোটার ঘণ্টা পড়া শেষ হওয়ামাত্রই আকাশ ফাটানো চিৎকার ঘুমন্ত শহরের হাড়-পাঁজর কাঁপিয়ে দিল। চতুর্দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে হতে ফিরল গায়ের রক্ত হিম করা রব—

—'আ-ল্লা হো-ও-ও-ও আ-ক-ব-র!'

মুহূর্তের মধ্যে তার মনে হল বোধহয় সে আর বেঁচে নেই! দেহটা বড় ভার লাগে। পা দুটো যেন লোহার বেড়ি দিয়ে কেউ বেঁধে দিয়েছে! কী করবে, কোথায় যাবে কিছুই যেন ভাবতে পারছে না! শুধু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো জানলা দিয়ে দেখল অনতিদূরের হিন্দুবাড়িগুলোয় জ্বলে উঠেছে আগুন! লেলিহান শিখা ধূমায়িত হয়ে লকলক করে উঠছে! তরোয়ালের ঝনঝন শব্দ, নারী-পুরুষের আর্তচিৎকার আর উন্মত্ত হুঙ্কারে ভরে উঠল আকাশ-বাতাস। মৃত্যুভয়ে সবাই ছুটে বেড়াচ্ছে দিগ্বিদিকে! পিছনে উদ্যত রামদা নিয়ে দুর্বৃত্ত!

সেই আওয়াজে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছেন মা। স্ত্রী সচকিত হয়ে উঠে বসেছে। কোলের ছেলেটা জেগে উঠে তীক্ষ্ণ গলায় কান্না জুড়ল।

মা আর স্ত্রীয়ের ভয়ার্ত দৃষ্টির উত্তরে সে নিষ্প্রাণ ও হতবুদ্ধি স্বরে বলে; 'দাঙ্গা লাগছে।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই পিছনের দরজায় প্রবল করাঘাত! উগ্র, দ্রুত হাতে কেউ কড়া নাড়ছে —

—'ঠক...ঠক...ঠক...'

—'কে?'

ভীত, চাপা গলায় মা বললেন, 'কে কড়া নাড়ে?'

সে ঠোঁটে আঙুল রেখে আওয়াজ করতে বারণ করে। দরজার শব্দের সাথে যেন বুকের ভিতরে কেউ হাতুড়ি পিটছে। আস্তে আস্তে দরজার সামনে গিয়ে কান পেতে বোঝার চেষ্টা করল ওপ্রান্তে ঠিক কী অপেক্ষা করছে!

ওপ্রান্ত থেকে কিন্তু কোনও হুঙ্কার ভেসে এল না। এল না কোনও তীব্র গর্জন। শুধু একটা পরিচিত স্বর ফিসফিস করে বলল :

—'দাদাভাই...জলদি দোর খুলো...আমি আইছি...আমি...তোমার ভাইজান।'

দাদাভাই নিমেষের মধ্যে দরজা খুল দিয়েছে। বিদ্যুৎগতিতে ঘরে ঢুকে পড়ে ইসমাইল উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'কথা কওনের সময় নাই। হাতের কাছে যা পাও সবড়ি লইয়া আমাগো ঘর চলো। দাঙ্গা লাগছে। অ'রা আওনের আগে পিছের দোর দিয়া পলাইতে হইব। জলদি করো।'

তখন ভাবার সময় সত্যিই ছিল না। একবস্ত্রে, হাতের কাছে যেটুকু নামমাত্র টাকাপয়সা, সোনাদানা পেল সেটুকু নিয়েই তারা উঠে এল ইসমাইলের বাড়ি। পিছনের দরজা দিয়ে পালাতে পালাতেই শুনল সামনের দরজা ভাঙার শব্দ! তার সাথে সাথেই তীব্র উন্মত্ত চিৎকার—

—'আ-ল্লা হো-ও-ও-ও আ-ক-ব-র!'

দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে কাউকে পেল না। নিষ্ফল আক্রোশে তারা বাড়ি ভাঙচুর করল। জিনিসপত্র যা লুটে নেওয়ার, তা নিয়ে শেষে গোটা বাড়িতেই আগুন ধরিয়ে দিল।

ইসমাইলের বাড়ির জানলা দিয়ে তিনটে মানুষ সজল চোখে দেখল তাদের এতদিনের তিলতিল করে গড়ে তোলা স্বপ্ন, সাধ, আকাঙ্ক্ষা; সব পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে! আর সেই মর্মান্তিক ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করতে করতে উল্লাসে চিৎকার করছে কতগুলো নির্বোধ জানোয়ার!

মা এই দৃশ্য দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। তাঁর সাধের ফলন্ত সংসার এভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেখে কান্না চাপতে পারেননি।

—'কাইন্দো না মা।' ইসমাইল সান্ত্বনা দেন, 'মানষের পরানডা আগে। পরানে বাঁচলে আবার সবকিছু হইব। কাইন্দো না।'

—'ইছমাইল।' কান্নাজড়ানো গলায় মা বলেন, 'অগো কী ক্ষতি করছি আমরা...?'

ইসমাইল তার উত্তর দেন না। চুপ করে নির্বাক মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন।

—'ভাইজান...অ'রা আবার তোমাগো ঘরে হামলা করব না তো?' প্রচণ্ড আতঙ্কে বলেছিল দাদাভাই, 'আমাগো লাইগ্যা তুমি এত বড় ঝুঁকি নিবা?'

—'হ, নিমু।' ইসমাইল শান্তস্বরে বলেন, 'তুমি হক কথা কইছিলা দাদাভাই। আমি মোছলমান। আমার ধম্ম আমারে মারতে শিখায় নাই! মানষেরে ভালোবাসতে, বাঁচাইতে শিখাইছে। যারা মানষ হইয়া মানষেরে মারে; তারা পাপী। পাপীর কুনো জাত হয় না...ধম্ম হয় না।'

তিনি একটু থেমে ফের দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমি আমার ধম্ম পালন করুম। যতক্ষণ আমার দ্যাহে জান আছে কেও তোমাগো কিস্যু করতে পারব না—আল্লার নামে এই কসম খাইলাম।'

কসম রেখেছিলেন ইসমাইল। দুষ্কৃতীরা কী করে যেন জানতে পেরেছিল যে তাঁর বাড়িতেই লুকিয়ে রয়েছে একঘর হিন্দু। সহজে ছাড়তে চায়নি। কিন্তু ইসমাইল প্রভাবশালী লোক ছিলেন বলে হামলা করতেও সাহস করেনি। শুধু একরাতে কয়েকজন মুখোশধারী এসে বলেছিল, 'মিঞা, তোমার লগে আমাগো কুনো দুশমনি নাই। কিন্তু মোছলমান হইয়া ঘরে হিঁদু লুকায়ে রাখছো। অগো বাইর কইরা দাও। নয় তোমারেও ছাড়ুম না।'

—'হা-লা, শুয়ারের বাচ্চা, হা-রাম-খো-র!' একহাতে রামদা আরেক হাতে ল্যাজা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন ইসমাইল। দু-চোখে ধকধক করে জ্বলে উঠেছিল আগুন :

—'কারোর ঘর পোড়ে; কেউ খই খাও! মজা পাইছো! হিম্মত থাকলে হালা, আগায়ে আয়। আইয়া দ্যাখ—এই ল্যাজা আর রামদা দিয়া তগো না কাটছি, তয় আমারও নাম ইছমাইল না!'

ইসমাইলের রুদ্রমূর্তির সামনে আর দাঁড়াতে সাহস পায়নি তারা। তখনকার মতো চলে গিয়েছিল। তবে হুমকি দিয়ে গিয়েছিল যে দলবল নিয়ে আবার আসবে।

তিনি সে হুমকিকে পাত্তাও দেননি। রাতের বেলা তিনি আর রেশমাবিবি পালা করে বাইরের ঘরে রামদা আর ল্যাজা নিয়ে পাহারা দিতেন। আর ভিতরের ঘরে ভয়ে কাঁটা হয়ে দিন কাটাত তিনটে মানুষ। বাচ্চাটা যখন-তখন কেঁদে উঠত বলে তার মুখে কাপড় গুঁজে রাখত তার মা।

এমনভাবেই কেটে গেল কয়েকদিন। ততক্ষণে ওরা তিনজনেই বুঝতে পেরেছে যে এ দেশ ছেড়ে না গেলে আর রক্ষা নেই। দুষ্কৃতীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। বাকিরা দলে দলে

দেশ ছেড়েছে।

ভাবলেই মনের ভিতরটা অবশ হয়ে আসে! আজন্ম পরিচিত এই মাটি ছেড়ে কোথায় যাবে? তাদের সমস্ত অস্তিত্ব তো এই মাটিতেই মিশে আছে!

তবু মা একদিন ইসমাইলকে বললেন :

—'তর ঘাড়ে বইস্যা আর কত খামু ইছমাইল? তর বোঝা হইয়া থাকতে ভালা লাগে না।'

তিনি বিস্মিত, ব্যথিত হলেন, 'এইডা তুমি কইতে পারলা মা? তোমাগো ঘরে কত খাইছি, পরছি, মাখছি। দুখের দিনে সব ভুইলা যামু? আমারে কি তুমি নিমকহারাম ভাবলা!'

মায়ের চোখে জল এল। এত দুঃখের দিনে এমন আন্তরিকতা পেলে সবারই কান্না পায়। তবু পরিস্থিতি মানুষকে শক্ত হতে শেখায়। মা কান্না চেপে বলেন, 'হেই কথা কই নাই। তুই আমার পোলারও বাড়া। আরেকখান কাম কইরা দে বাপ।'

—'হুকুম করো মা।'

—'আমাগো ও দ্যাশে যাওনের বন্দোবস্ত কর।' মা কেঁদে ফেললেন, 'এ দ্যাশ এহন শত্তুর হইছে। এইহানে আর মন টিকে না।'

ইসমাইলও বুঝতে পারছিলেন যে এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেদিকে মোড় নিচ্ছে তাতে এ দেশ আর নিরাপদ নয়।

তবু মন মানে না! যুক্তি-বুদ্ধির উপরও টেক্কা দেয় হৃদয়। ইদের দিনে আর কেউ হাসিমুখে নেমন্তন্ন খেতে আসবে না, পুজো-পার্বণে কেউ সহাস্যে পিঠে-পুলি বা ভাত-মাছ বেড়ে দেবে না—ভাবলেই বুকটা হু হু করে।

কিন্তু কষ্টটা বুকে চেপেই বললেন, 'জবান দিলাম মা। তাই হইব।'

বলেই আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিলেন। পিছন থেকে মা ডাকেন, 'শোন।'

ইসমাইল থমকে দাঁড়ালেন।

—'এইহানে আয়...আমার কাছে বয়...'

তিনি বাধ্য ছেলের মতো মায়ের সামনে বসে পড়লেন। মা তাঁর মুখ দু-হাতে স্পর্শ করেছেন। একদৃষ্টে সেই প্রশান্ত শ্মশ্রুগুম্ফ আচ্ছাদিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখ জলে ভরে এসেছে। প্রচণ্ড উচ্ছ্বসিত কান্নাকে চাপতে চাপতে দু-হাতে তাঁর মুখ ধরে বললেন, 'এ জনমে আমার একখানই দুস্ক রইল ইছমাইল...। তোরে ক্যান আমি প্যাডে ধরি নাই বাপ......!'

ইসমাইল চোখ নীচু করলেন! সম্ভবত চোখের জল গোপন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য!

পরের দিন রাতের বেলায় মাছের ঢাকা গাড়িতে আঁশটে গন্ধ মাখা চুপড়ির সাথে রওনা হল তিনটে মানুষ আর একটি শিশু। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন স্বয়ং ইসমাইল। পথে যদি কোনও বিপদ আসে সেজন্য হাতের কাছে অস্ত্রও রেখেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত গাড়িটা ইসমাইল মিঞার বলেই কোনওরকম বিঘ্ন এসে উপস্থিত হল না। রাতের অন্ধকার মেখেই গাড়ি ছুটে চলল ভারত-পূর্বপাকিস্তান সীমান্তের দিকে।

তিনটে ছিন্নমূল প্রাণ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এসে জুটল পশ্চিমবঙ্গে। এখানে প্রাণের ভয় নেই।

তার সাথে নেই সেই মাটির গন্ধ, পদ্মার সেই ছুটে চলা, সেই দিগন্তব্যাপী ধানের খেত, নেই করিমচাচা, সিরাজ, ইসমাইল ভাইজানরাও।

আর নেই সেই নাড়ির টান!

......আচ্ছন্ন দৃষ্টি বারবার তবু কী যেন খুঁজে বেড়ায়...!

কবেই তো সব শেষ হয়ে গেছে; তবু কী যেন অমোঘ টানে বারবার টেনে ধরে! পদ্মাপাড়ের হাওয়া আজ আর ত্রিসীমানায় নেই; তবু কোথাও যেন আজও হু হু করে বয়ে বেড়ায়! কবেই তো অতীত হয়ে গেছে, তবু কেন সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ বারবার ফিরে আসে স্মৃতিতে......!

মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটা অনুভব করে অদ্ভুত একটা দুলুনি। এমন দুলুনি পদ্মা নদীর বুকে ভেসে চলা নৌকোগুলোয় চড়লে টের পাওয়া যেত। বড় সস্নেহে পদ্মা যেন কোলে তুলে দোলাচ্ছে!

নিঃশ্বাস নিতে বড় কষ্ট...আঃ...

...তখনও আদিগন্ত মাঠ রোদে ঝলমল করছে! ঘাসের বুকে ফোঁটা ফোঁটা তাজা স্বচ্ছ শিশির। ঝিলের বুকের সাদা শালুকের দল শিশিরে স্নান করেছে। কাশবন ঢেউয়ে ঢেউয়ে হাত নেড়ে ইশারায় বলে, 'আয়...আয়...'

......সেই মাঠের ওপ্রান্তে করিমচাচার বাড়ি। করিমচাচা খুব মন দিয়ে সবজীবাগানটা দেখছিলেন। তাকে দেখতে পেয়েই সোৎসাহে বললেন, 'আইছো মনু?...আয়ো...আয়ো...'

লোকটা আপনমনেই ঘোরের মধ্যে বিড়বিড় করে বলে, 'এই আসতাছি...'

—'কী বলছ?...কী বলছ বাবা?'

সে চুপ করে গেল...

...তখনও চোখের সামনে সেই বিরাট মাঠ...সিরাজ পড়ি কি মরি করে দৌড়চ্ছে কাটা ঘুড়ির পিছন পিছন। খিলখিল করে হাসছে। আর চিৎকার করে বলছে :

—'মিতা-আ-আ-আ...আমি নৌকা চালাইতে শিখছি। তুমি সনে ভেঁপু বাজাবা না? আইসো...শিগগির আইসো মিতা...'

লোকটা ফের বলে, 'এই যাই......'

আশেপাশের মুখগুলো অবাক হয়ে এ ওর দিকে তাকায়। বিড়বিড় করে কি বলছে মানুষটা? এ কি বিকার!

—'বাবা...কী বলছ?'

...ইদের দিন সকালে ইসমাইল ভাইজান একখানা পেল্লায় থলে নিয়ে এসে হাজির। হাসিমুখে চেঁচিয়ে বলছে, 'আমারে ছাইড়া যাইবা কই দাদাভাই? এই ইদের নিওতা দিলাম। আইবা না?'

সে আপন মনেই জবাব দেয়, 'আসুম।'

—'বাবা...বাবা...!'

কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন তার হুঁশ ফেরে। প্রচণ্ড শব্দ করে শ্বাস টানতে টানতে বড় বড় চোখে এদিক-ওদিক তাকায়।

—'কিছু বলছ?'

জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার সাথে উঠে এল ভীষণ কাশি। একদলা কফ মুখের কষ বেয়ে পড়ছে। সেই অবস্থাতেই ঘড়ঘড় শব্দে উত্তর এল...

—'আমারে ডাকে...'

—'কে ডাকে? কে ডাকে বাবা?'

উদ্বিগ্ন মুখগুলো তার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়েছে। সে দেখতেও পেল না। দুলুনি যেন ক্রমশ বাড়ছে। পদ্মা তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। চোখের পাতায় নেমে আসছে ঘুম। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সবুজ মাঠ, সোনালি ধানখেত, রুপোলি রোদ্দুর......

নিশ্ছিদ্র কালো সন্ধ্যা তার দু-চোখে ডানা মেলে দিল। বুকের উপর দশমণি পাথর চাপানো! হাঁ করে নিঃশ্বাস টানার শেষ যুদ্ধ করতে করতে শেষ প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে গেল সে...

—'বাবা? কে ডাকে তোমায়?'

ক্ষীণ, অস্পষ্ট, প্রায় মিলিয়ে যাওয়া স্বরে সে ফিসফিস করে বলল—

—'আ-মা-র...দ্যা-শ...!'

—

কাঠিবাবু

লোকটার নাম বটকৃষ্ণ। অপভ্রংশে বটকেষ্ট।

বয়স ত্রিশ থেকে তেতাল্লিশ পর্যন্ত যে কোনও সংখ্যা হতে পারে। দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট দু-ইঞ্চি। ওজন চল্লিশ কেজি! উস্কোখুস্কো চুল, আমের আঁটির মতো মুখে তেল মজুত রাখার উপযুক্ত দুটি গাল, কাদা ঘোলা চোখ এবং খিটখিটে মেজাজের মালিক!

নিন্দুকেরা বলে বটকেষ্টর মুখ দেখলে নাকি একটানা সাতদিন ডিসেকশন টেবিলে কাটানোর এফেক্ট হয়। সত্যি সত্যিই তাই হয় কি না জানা নেই, তবে নিন্দুকদের কথা গায়ে না মাখাই ভালো। বটকেষ্ট মাখেও না।

বারাসতের একটু অভ্যন্তরে একখানা কচুরিপানাযুক্ত ও মশাচ্ছন্ন পুকুরের পাশে ছোট্ট শ্যাওলাধরা ইট-পাঁজর সর্বস্ব বাড়িতে দুটি টিয়া, একটি ঘুঘু, একরাশ ছুঁচো ও ইঁদুর; আর একটি রুগণ বৌ নিয়ে তার উলোঝুলো সংসার। রোজ সকালে 'অ্যাঁ...অ্যাঁ' করে একরাশ বমির সাথে নৈঃশব্দ্যকে উত্তেজিত করতে করতে দিনের শুরু। আর রাতে ঝাল ঝাল শুয়োর বা মুরগির পরিত্যক্ত অবশিষ্টাংশের সাথে সস্তার বাংলা মদে দিনের শেষ।

এই জাতীয় শুরু ও সারার মাঝখানের সময়টা কাটে মেইন রোডের উপর তার নিজস্ব ছোট্ট ঘুপচি পানের দোকানে বসে।

বটকেষ্ট প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের নাম কস্মিনকালেও শোনেনি। পানের দোকানে বসে সে সারাদিনে যতটুকু নিজস্ব দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট। তার মৌলিকতা সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই। থাকলে জানতে পারত যে, মাস্কারাময়ীর আস্কারায় জেগে ওঠা মনের গভীর আকুতি শুধু তার একার নয়; ব্যর্থতার এই জ্বালায় কমবেশি সকলেই জ্বলেছেন। পানের দোকানি, নিরীহ কেরানি থেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, এমনকি দান্তে, শেলি, বায়রন পর্যন্ত কেউ বাদ যাননি।

অতঃপর সারাদিন দোকানে কাটিয়ে এসে রাত্রে একথালা পান্তাভাত আর ঝাল ঝাল মাংস সপাসপ মেরে দেওয়া। সাথে দেশি মদের অনুষঙ্গ! এবং স্বাভাবিক নিয়মেই চিররুগ্ন স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক নড়বড়ে সঙ্গম। বাকি রাতটা কাটে গেঁয়ো পাঁচীর বিছানায় শুয়ে পরির স্বপ্ন দেখে!

জীবন বলতে এইটুকুই! প্রাত্যহিক একঘেয়ে কাজগুলো নিয়ে নাড়াঘাঁটা করা। আলুথালু ফাটাফুটি দিনগুলোকে সেলাই করে যাওয়া। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়া,—আর আবার পরের দিন সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি!

স্বাভাবিকভাবেই মনে খুব সঙ্গত একটা প্রশ্ন জাগে। লোকটা বাঁচে কী নিয়ে? এ হেন নিস্তরঙ্গ একটানা বিনোদনহীন জীবন; আর যাই হোক, মানুষকে সুস্থ রাখতে পারে না। যাঁরা এই ধরনের

জীবন যাপন করেন তাঁরা তাস-পাশা খেলে, জুয়া-সাট্টার আড্ডায় গিয়ে অথবা রেড লাইট এরিয়ার ঊর্বশীদের কাছ থেকে প্রেম কিনে কোনওমতে দিন গুজরান করেন। ওইটুকুই তাদের রসদ!

অথচ বটকেষ্ট এর কোনওটাই করে না! তাস-জুয়ার নেশা তার নেই! মদ খেলেও, মেয়েমানুষের দোষ আছে একথা বটকেষ্ট সম্পর্কে কেউ বলবে না! আজ পর্যন্ত নিষিদ্ধ পাড়ায় তার ছায়াও পড়েনি; যদিও ও পাড়ায় যাতায়াত থাকার বেশ যুৎসই কারণ ছিল!

এই কার্য-কারণের মাঝখানের ফাঁকটাই লোকটার সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। জুয়া খেলা বা লাম্পট্য; কোনওটাই খুব গুণের কথা নয়। কিন্তু তার মতো মানুষের ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক চরিত্রগত ত্রুটি। ওই ত্রুটিটুকু না থাকার জন্যই হয়তো লোকটাকে বড় বেশি অস্বাভাবিক লাগে। মনে হয় কোনওরকম বিনোদন ছাড়া মানুষটা বেঁচে আছে কী করে.........?

সেদিন সকালে খোশমেজাজে দোকান খুলে বসেছিল বটকেষ্ট।

এখন অফিসটাইম। বাবুরা ভাত খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে আপিস যাবেন। তাই সকালের দিকটায় বিক্রিবাটা বেশি হয়। ব্যস্ততাও তদনুরূপ। কারও মিঠাপাতিতে চুন, সুপুরি, খয়ের। কারুর মৌরী, মশলা, চমন বাহার, কেউ বা আবার সাদাপানে জর্দা! তার সাথে চ্যান্সেলর, নেভিকাটের ফরমায়েশ তো আছেই। বটকেষ্টকেই সব মনে রাখতে হয়। ধরাবাঁধা খদ্দেরকে বাঁধাধরা অর্ডার সাপ্লাই দিতে দিতে আবার টুকটাক রসালাপও চলে :

—'কেমন আছেন দাদা? আজ যে এত সকাল সকাল?'

দাদার উত্তর দেবার অবসর নেই। কোনওমতে খুচরো আড়াই টাকা বের করে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'স্পেশ্যাল ডিউটি।'

—'ইস্পেশাল ডিউটির জন্য ইস্পেশাল পান বুঝি? হেঁ হেঁ হেঁ...।'

দাদাটি তার ছোট্ট রসিকতায় হাসার সময় পেলেন না দেখে সে নিজেই একচোট দেঁতো হাসি হেসে নিল। পরমুহূর্তে খরিদ্দারটি পিছন ফিরে চলে যাওয়া মাত্রই হাসি থামিয়ে ভেংচি কেটে বলল, 'ইস্পেশাল ডিউটি! সা-ল্লা-হহ।'

তার প্রায় মৃতবৎ নিষ্প্রভ চোখ চিতার আগুন নিয়ে ধক ধক করে জ্বলে ওঠে! সবাইকে সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁক করে দিতে চায়!!!

আস্তে আস্তে বেলা গড়িয়ে আসে। খদ্দেরদের ভিড়ও ক্রমশ পাতলা হচ্ছে। কাছাকাছি বাড়ির গুটিকতক বৌদি তার নিয়মিত ক্রেতা। ভাতঘুম দেওয়ার আগে একটা মিষ্টি পান তাদের বরাদ্দ। কিছুক্ষণের জন্য একটা মেয়েলি সুখী সুখী গন্ধ ভেসে বেড়ায় ছোট্ট দোকানে। তারপরেই ফেটে যায় আবেশের বুদবুদগুলো! মেইন রোডের শ্লথ ট্র্যাফিকের পাশে ক্ষুদ্রতম ছায়া নিয়ে এসে দাঁড়ায় খাঁ খাঁ নির্জন দুপুর!

বটকেষ্ট তার স্বল্প পরিসর দোকানে হাত-পা গুটিয়ে প্রায় গোল হয়ে বসে ঝিমোচ্ছিল। সবে তন্দ্রার ঝিমঝিমে মৌতাত অল্প অল্প ছড়িয়ে পড়ছে, এমন সময় 'ক্যাঁ—চ' করে একটা গাড়ি ব্রেক কষে এসে দাঁড়াল তার সামনে।

তন্দ্রাটা কেটে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসে বটকেষ্ট। ততক্ষণে গাড়ির পিছনের দরজা খুলে জুতো মসমসিয়ে নেমে এসেছেন এক সুসজ্জিত ভদ্রলোক।

—'ইন্ডিয়া কিং আছে?'

সে বোকার মতো মাথা নাড়ে। এই নামটা তার কাছে পরিচিত নয়। ভদ্রলোক বিরক্ত হলেন মনে হয়। মুখে সামান্য কুঞ্চন ছাপ ফেলেই মিলিয়ে গেছে।

—'শুনছ?' গাড়ির জানলায় এবার একটা মুখ ভেসে উঠেছে। মুখ না বলে বেলুন বললেই বোধহয় ভালো হয়। পিটপিটে চোখ, ডাবল ডেকারে চাপা দেওয়া নাক, গ্রীবার লেশমাত্র নেই। সারা গায়ে একরাশ সোনালি আলো ঝমর ঝমর করে বলল, 'ওকে জিজ্ঞাসা করো না! লোক্যাল লোক। বলতে পারবে।'

ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে গাড়ির দিকে তাকালেন। তারপর এদিকে ফিরে গলা সাফ করে নিয়ে বললেন, 'রজনীবাবু,...মানে রজনী সান্যালের বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারো?'

বটকেষ্ট প্রথমে প্রশ্নটা খেয়াল করেনি। সে অবাক হয়ে মহিলাকেই দেখছিল। এই ভর দুপুরে জগদ্দল চেহারার মহিলা এমন ভয়ানক সেজেছেন কেন? এ পাড়ায় কোথাও কোনও বিয়ে আছে বলেও তো মনে পড়ছে না!

—'এক্সকিউজ মি...রজনী সান্যালের বাড়ি...'

রজনী সান্যাল এ পাড়ার নামজাদা রইস!

—'সান্যালবাবুর বাড়ি?' সে এঁড়ে গলায় বলল, 'এই তো সোজা গিয়ে ডানদিকের গলির দুটো বাড়ির পরের তিনতলা বাড়িটা!'

—'থ্যাঙ্কস।'

ভদ্রলোক আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে বটকেষ্ট পেছন থেকে ডাকে, 'ও সার, শুনুন...'

তিনি অবাক হয়ে ফিরে দাঁড়ান, 'ইয়েস!'

—'না...মানে আপনি সান্যালবাবুর কে হন?'

নিতান্তই নিরীহ কৌতূহল। উত্তরে গাড়ির ভিতর থেকে ভেসে এল অ্যালসেশিয়ান গর্জন। যেন বলতে চায়, 'কে হে তুমি! আমার মনিব কার কে হন তাতে তোমার কী?'

সে ঢোঁক গেলে। আড়চোখে গাড়ির জানলায় তাকায়। কুকুরটা বাঁধা আছে তো?

—'না...আসলে আপনাকে অনেকটা ওঁর মতোই দেখতে কি না...তাই জানতে চাচ্ছিলাম...।'

কথাটা বলেই বুঝতে পারল কী ভুল করেছে!

সান্যালমশাই অত্যন্ত কুৎসিত দর্শন! তাঁর মতো দেখতে মানে...

ভদ্রলোক কিন্তু বেশ ভালো মানুষ। রাগলেন না। অর্থাৎ পয়সাওয়ালা মাত্রেই খেঁকুটে নয়। বরং হেসে বললেন, 'আমি ওঁর কেউ নই। তবে হতে যাচ্ছি। ওঁর ছেলের সাথে আমার মেয়ের...'

বটকেষ্টর মাথা একধাক্কাতেই পরিষ্কার। সে অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে পান সাজতে সাজতে বলে, 'অ!!! ও-না-র ছে-লে! তা ভা-লো!'

ভদ্রলোক তার মুখভঙ্গি দেখে চলে যেতে গিয়েও পারলেন না। পানের দোকানি মিটমিট করে তাঁর দিকেই তাকাচ্ছে। মুখ দেখলেই মনে হয়, ওর ভিতরে কোনও রহস্য আছে। অথবা গোপনীয় কোনও কথা!

এমন কিছু, যা সে বলি বলি করেও বলছে না।

—'তুমি ওঁর ছেলেকে চেনো?'

বটকেষ্ট সুপুরির কুঁচির মতোই মিহি দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, 'চিনব না স্যা-র!!! কে না চে-নে!'

এমন কথা থেকে বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই বুঝতে পারে যে চেনার খবরটা খুব স্বস্তিজনক নয়। ভদ্রলোক তখনও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেখে সে বাকিটা পূরণ করে দেয়।

—'ও ছেলেটার আগের বৌটা তো কম হাঙ্গামা করেনি! পাড়াময় ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল।'

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মোক্ষম কথাগুলো এসে ধড়াম করে ঘাড়ে পড়ল! তিনি চমকে উঠলেন; এমন একটা প্রসঙ্গ এসে পড়বে তা কল্পনাও করেননি। বিস্মিত, ব্যথিত স্বরে বললেন, 'না...না...ভুল হচ্ছে কোথাও...! ওঁর ছেলে তো অবিবাহিত!!!'

—'ওরা তাই বলে। মেয়েটাকে বৌ বলে স্বীকার করতে চায়নি।' বটকেষ্ট এদিক-ওদিক সন্তর্পণে তাকায়। গলার স্বর যথাসম্ভব নীচু করে বলে, 'আপনি ভালো মানুষ মনে হয় সার। কাউকে বলবেন না যেন...।'

মানুষটি কোনওমতে মাথা নেড়ে জানালেন, বলবেন না।

—'মেয়েটা ভরা পোয়াতি ছিল! ওই গুণধর ছেলের কীর্তি।—পেম! পেম! বুঝলেন কি না? কালীঘাটে গিয়ে নাকি সিঁদুরও পরিয়েছিল! কিন্তু তারপর আর স্বীকারই করল না। মেয়েটা খেপে গিয়ে মহা হাঙ্গামা করেছিল। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে একদিন সান্যালবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির! অনেক গলাবাজি করে হুমকি দিয়ে এল, বৌ বলে ঘরে না তুললে পুলিশে নালিশ করবে।'

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'মেয়েটার তেজ ছিল সার।'

ভদ্রলোকের মুখ আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠছিল। রুদ্ধশ্বাসে কাহিনি শুনছেন...

—'তারপর?'

—'তারপর আর কী?' বটকেষ্টর চোখ গোল গোল হয়ে গেছে, 'দু-দিন পরে মেয়েটার লাশ মিলল ইস্টিশনে। ট্রেনে কাটা পড়ে মরেছে! এখন নিজেই মরেছে না কেউ মেরেছে তা ভগবান জানে। তবে সেই ঘটনার পর পাড়াসুদ্ধু লোক ছেলেটাকে চেনে! সবাই জানেও।'

শ্রোতাটি তবু দ্বিধাজড়িত স্বরে বলেন, 'সবাই জানে! কিন্তু একথা তো কেউ আমাদের বলেনি! আমরাও তো খোঁজখবর নিয়েছি......!'

—'কে বলবে সার?' সে বঙ্কিম হাসল, 'আপনি বাঁচলে পরের নাম। পেয়ারের জানটা কেউ সেধে হারাতে চায়?'

সান্যালবাবুর ভাবী সম্বন্ধীর মনের অবস্থা বলার অপেক্ষা রাখে না। কথাবার্তা শেষ করে যখন গাড়িতে উঠে বসলেন, তখন তাঁর মুখ গম্ভীর। চোয়াল শক্ত!

স্ত্রী তাঁর কাঁধে হাত রেখেছেন, 'একটা পানওয়ালার কথায় এত গুরুত্ব দিচ্ছো কেন? ওরা সবসময়ই বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে।'

তিনি সরাসরি জবাব দিলেন না। শুধু আলগোছে বললেন, 'হুঃ।'

বলাই বাহুল্য যে ছোট্ট শব্দটায় তেমন জোর পাওয়া গেলো না...!

খবরটা যেন রাতারাতি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

দুনিয়ার এটাই নিয়ম। এখানে গরিব লোককে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হতে হয়। তাই তার হেনস্থা খুব জোর খবর নয়। কিন্তু ধনী ব্যক্তি যদি দৈবাৎ বিপাকে পড়েন তাহলে সেটাই জনসাধারণের গরমাগরম আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বিনা ইন্ধনেই চিড়বিড় করে জ্বলছেন রজনীবাবু! ছেলের বিয়েটা বেশ বড়ঘরেই ঠিক করে ফেলেছিলেন। কেতাদুরস্ত আদব-কায়দা ও মোলায়েম অভিজাত ব্যবহারে মেয়েপক্ষ বেশ ভিজেছিল। শুধু পাকাকথা বাকি। বিয়েটা এখানে দিতে পারলে ঘরের লক্ষ্মীর সাথে বেশ মোটাসোটা লক্ষ্মীপ্রাপ্তিও হত। কিন্তু আকস্মিক ভাবেই গোটা ব্যাপারটা ভেস্তে গেল! কী করে এমন অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধটা ভেঙে গেল, তা এখনও তাঁর বোধ-শক্তির বাইরে!

তার উপর আবার দুশ্চরিত্র, লম্পট বদনাম! ভাবলেই শিরায় শিরায় লাভার স্রোত বয়ে যাচ্ছে! বহু চেষ্টাতেও তাকে শান্ত করা যাচ্ছে না! কী প্রচণ্ড অপমান! কী প্রচণ্ড......!!!!

একেই হাই ব্লাডপ্রেশারের রোগী, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো আবার এই কাণ্ড! সকাল থেকে একের পর এক গ্লাস শেষ হচ্ছে! ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলে থাকা সাবেকি পাইপটার প্রাণ থাকলে এতক্ষণে 'ত্রাহি মধুসূদন' বলে ডাক ছাড়ত। মেয়ের বাপকে হাতের কাছে পেলে বোধহয় এভাবেই মুখে ফেলে চিবোতে শুরু করতেন। কিন্তু উপস্থিত যখন তার সম্ভাবনা নেই তখন পাইপের উপর দিয়েই গায়ের ঝাল মেটাচ্ছেন!

পরপর তিনদিন গৃহবন্দি থাকার পর আর পারলেন না! উত্তপ্ত মস্তিষ্ক একটু শীতলতা চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই বেরিয়ে পড়তেই হল।

নিজের ছোট্ট পানের দোকানে বসে বটকেষ্ট তখন অন্যান্য দিনের মতোই দুলে দুলে পান সাজতে ব্যস্ত! মন খুশি খুশি। মাঝেমধ্যে রেডিওটার সাথে তাল মিলিয়ে হুঁ হুঁ করে গানও গাইছে। হেঁড়ে গলায় বিশেষ সুর নেই। তবু বেসুরো গলার গান তার নিজেরই কানে মধুবর্ষণ করছে।

হঠাৎ হেঁচকি উঠে গানে তালা পড়ে গেল। রজনীবাবু দ্রুত গতিতে এদিকেই আসছেন যে! কী সর্বনাশ! জানতে পেরেছেন নাকি! তার টাকরা থেকে ব্রহ্মতালু অবধি শুকিয়ে গেলো। রজনীবাবুর সুখ্যাতি এদিকে বিশেষ নেই। বরং দুর্নামই আছে। ক্ষমতাশালী লোক ইচ্ছে করলে সবই পারেন। এরপর হয়তো কোনওদিন বটকেষ্টর লাশটাই......!!!!

চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল! মুখ থেকে ভক ভক করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে! মাথার চুল উস্কোখুস্কো! একী মূর্তি! সে ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে! এখন তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল! কেন যে

শখ করে কেউটের লেজে টান মারতে গিয়েছিল! এখন বুঝি ছোবল খেতে হয়। হয়তো এক্ষুনি লোকটা এসে তার গলা টিপে ধরে বলবে......

—'তামাক দে।'

রজনীবাবু একটা নোট বাড়িয়ে দিয়েছেন, 'কড়া তামাক দিবি। ভেজাল হলে সব ফেরত দিয়ে যাব!'

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। কথার ধরন শুনলে গা জ্বলে যায়। তবু হেঁ হেঁ করতে করতে তামাকের প্যাকেট এগিয়ে দিয়েছে সে।

—'কেমন আছেন সার? সব ভালো তো?'

আলগোছে একটা 'হুঁ' বলে রজনী চুপ করে গেলেন। তাঁর নীরবতা যে কোনও অংশেই 'মহান নীরবতা' নয় তা বুঝতে বাকি থাকে না।

—'শুনলাম আপনার ছেলের বিয়ে নাকি ঠিক?'

ভদ্রলোক লাল চোখ আরও লাল করে তাকিয়েছেন!

—'খুব ভালো খবর সার...খুব ভালো খবর...পানের অডারটা কিন্তু আমার দোকান থেকেই নিতে হবে। আপনারা সজ্জন ব্যক্তি। কত শিক্ষেদীক্ষে! আপনাদের পায়ের ধুলো পড়লে...বুঝলেন কি না...হেঁ হেঁ হেঁ...'

বটকেষ্ট একতরফাই বকে গেল। রজনী কী বুঝলেন কে জানে! গম্ভীর মুখে তামাকের প্যাকেট নিয়ে চলে গেলেন।

সে একদৃষ্টে লোকটার গমনপথের দিকে তাকিয়েছিল। অতবড় রাগি, দাপী মানুষটাকে কেমন যেন অসহায় লাগছে। এলোমেলো পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। সেই স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপ আর নেই। প্রকাণ্ড কয়েকমহলা অট্টালিকা যখন ভেঙে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যায় তখন বোধহয় তাকে এমনই দেখতে লাগে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা দ্বিধা বিবেকে কামড় বসাল। কাজটা কি ঠিক হল? সে মিথ্যে কথা বলেনি ঠিকই; কিন্তু সত্যিটাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে বলেছে। এতটাই বেশি জমকালো করে তুলেছে যে ঘটনাটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে!

আসল ঘটনাটা আদৌ এতটা অসহ্য ছিল না। রজনীবাবুর ছেলের প্রাক্তন প্রেমিকা ঝামেলা করেছিল ঠিকই। পাড়াসুদ্ধু তা নিয়ে ঢি ঢিও পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু সে গর্ভবতী ছিল না। এমনকি মারাও যায়নি। বরং নবদ্বীপের কোন এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে সুখে সংসার করছে।

এর সবটাই বটকেষ্ট জানত। অথচ......!

নিষ্প্রভ চোখদুটো আবার অগ্নিকুণ্ডের মতো দপ করে জ্বলে ওঠে। বেশ হয়েছে! বেশ করেছে বলেছে! আবার বলবে! কী ভেবেছে লোকগুলো? দুনিয়ার সমস্ত সুখ করায়ত্ত করে বসে থাকবে? দুঃখ, গ্লানি, কদর্যতা কোনওদিন তাদের স্পর্শও করবে না!

মামাবাড়ির আবদার!

সে সমস্ত চিন্তা নিমেষে ঝেড়ে ফেলে পান সাজায় মন দিল। ভাবনাগুলোকে দূর করতে পারলেই বাঁচে। এই চিন্তা-ভাবনা নামক বস্তুগুলোই আসলে যত নষ্টের গোড়া। যত কম ভাবা যায় তত বেশি আনন্দে থাকা যায়। ভাবতে বসলেই যত বিপদ!

—'বটকেষ্ট, একটা মিষ্টি পান দে, এলাচ ছাড়া।'

বটকেষ্ট মুখ গুঁজে পান সাজছিল। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে মুখ তুলে তাকিয়েছে। তার মুখে আলতো একটা হাসি ঝিলিক মেরে যায় :

—'আ-রে! সেকেটারিবাবু যে! আসুন আসুন...কতদিন আসেন না।'

হারাধন মণ্ডল স্থানীয় হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সেক্রেটারি। বিয়ে-থা করেননি। সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা মানুষ। স্কুলের কাজেই জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্কুল-অন্ত-প্রাণ মানুষটি আবার ভয়াবহ আদর্শবাদীও বটে। ঠিক করেছেন তাঁর স্কুলের কোনও শিক্ষককে প্রাইভেটে পড়াতে দেবেন না। শিক্ষকরা তাঁকে প্রায় যমতুল্য জ্ঞান করেন। মাঝেমধ্যে তাঁর জন্য যমের করুণাও প্রার্থনা করে থাকেন। কিন্তু এত লোকের সমবেত প্রার্থনায়ও মৃত্যুদেবতা কর্ণপাত করেননি!

পান সাজতে সাজতেই বটকেষ্ট 'ক্ল্যাসিক'-এর প্যাকেট এগিয়ে দিয়েছে। হারাধনবাবুর ওটাই ব্র্যান্ড।

তিনি প্যাকেট থেকে আলগোছে একটা সিগ্রেট তুলে নেন।

—'ভাবছি সিগ্রেট খাওয়াটা ছেড়ে দেবো।'

গত তিন বছর ধরেই হারাধন সিগ্রেট ছাড়ার কথা ভেবে যাচ্ছেন। স্রেফ ভেবেই যাচ্ছেন। ছাড়া আর হচ্ছে না। বটকেষ্ট মিটিমিটি হাসে। পানের গায়ে তরল খয়ের বোলাতে বোলাতে রেডিওর কান মোচড়াচ্ছে! আদ্যিকালের পুরোনো রেডিওটা মাঝেমধ্যেই গাঁক গাঁক করে বাজতে শুরু করে দেয়। এখনই ফের তারস্বরে বাজতে শুরু করে রসালাপে ব্যাঘাত ঘটাতে যাচ্ছিল।

কিন্তু তার আগেই বটকেষ্ট রেডিও বন্ধ করে দিয়েছে।

—'তা ছেড়ে দিন না। ওটা কি একটা খাওয়ার জিনিস হল?'

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, 'ছাড়ব তো ভাবি। কিন্তু পারছি না।'

উত্তরে একটা রহস্যময় হাসি হাসল সে। এক একটা নেশার প্রকোপ এতটাই বেশি যে ছেড়ে দেওয়া মুস্কিল। ছাড়তে চাইলেও ছাড়ে কই!

—'পানও ছাড়বেন না কি?'

—'নাঃ, পান চলতে পারে।' তিনিও হাসছেন, 'পানে কোনও দোষ নেই। ওটা হার্মলেস।'

—'তাহলে বটকেষ্টর ইস্পেশাল পান খেয়ে দেখুন। মুখে দিলেই গলে যাবে।'

—'ঠিক আছে। খেয়ে দেখছি।' হারাধনবাবু ঘড়ি দেখছেন, 'তবে একটু তাড়াতাড়ি কর। একটু তাড়া আছে।'

—'এক্ষুনি হয়ে যাবে।' সে ক্ষিপ্রহাতে সুপুরি সাজাচ্ছে, 'তা তাড়া কীসের? যাবেন কোথায়?'

—'একটু জিতেনের বাড়ি যাব। স্কুলের ব্যাপারে একটু কথা আছে।'

পিটপিটে তেরছা চোখে বটকেষ্ট তাকাল। জিতেন হালদার মেকানিকসের শিক্ষক। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক লেভেলে ফিজিক্সও ভালো পড়ান।

—'অ।'' সে পানটা মুড়তে মুড়তে এগিয়ে দিয়েছে, 'কিন্তু এখন কি তাকে পাবেন?'

হারাধন আস্ত পানটা মুখে পুরে দিয়েছেন। পানের রসে মুখভর্তি। পিচ করে পিক ফেলে বললেন, 'কেন? বাড়ি নেই নাকি?'

—'না...না...যাবেন কোথায়? তবে একটু আগেই...' সে খুচ খুচ করে মাথা চুলকুচ্ছে!

—'একটু আগেই? একটু আগে কী?'

—'একটু আগেই আপনাদের ইস্কুলের কয়েকজন ছাত্তরকে ওদিকপানেই যেতে দেখলাম কি না! তাই বলছিলাম...উনি বোধহয় ছাত্তর পড়াচ্ছেন...।'

—'কী?' সেক্রেটারিবাবু প্রায় তড়িতাহত ব্যাঙের মতো লাফিয়ে ওঠেন। পরক্ষণেই টাইফুন গতিতে জিতেনের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেছেন। প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই চিৎকার করে বললেন, 'তোর পান-সিগ্রেটের দাম পরে দিয়ে যাচ্ছি বটকেষ্ট...আমি এখন একটু ব্যস্ত......'

বটকেষ্ট ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল, 'নিয়ে যান বাবু, দাম দিতে হবে না। আপনারটা ফি-রি!'

তখন বেশ রাত হয়ে এসেছে। আশেপাশের বাড়িগুলোর জানলার চোখ ফুটেছে টুপটুপ করে। তেল চকচকে পিচের রাস্তা চাঁদের আলোয় কেউটের পেটের মতো মসৃণ। আকাশ যেন ময়ূরকণ্ঠী জেলি। মেইনরোডের উপর হুশহাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়ির সঞ্চরণ। ল্যাম্পপোস্টগুলোর কোনওটার চোখে আলো জ্বলছে, কোনওটা আবার নিরেট অন্ধ। তাদেরই সমবেত আলোয় স্পষ্ট মেইনরোড। আর একটু দূরেই নিষ্প্রভ জ্যোৎস্নায় নারকেল গাছের ছায়া ছায়া শরীর দিগন্তে প্রান্তসীমা টেনে দিয়েছে।

পানের দোকানে এখনও জমাট ভিড়। সামনের স্টিরিওর শোরুমে হিমেশ রেশমিয়ার অনুনাসিক কণ্ঠস্বর। অফিস ফেরত বাবুরা বাজারে শোরগোল জমিয়ে তুলেছেন। আজ শনিবার। কাল সকাল থেকেই ভালোমন্দ চলবে। মাছের বাজারে প্যাচপ্যাচে মাছধোয়া আঁশটে কাদায় দাঁড়িয়ে দরাদরি চলছে রুইমাছের মাথা, ইলিশের পেটি, কুচো চিংড়ি অথবা ভেটকির টুকরোর। পাঁঠার মাংসের দোকানের সামনে লম্বা কিউ। শাকসবজীর দোকানে পান্নার মতো ঝকঝকে সবুজ পুঁইডাটা, তাজা হেলেঞ্চা, পটল, ঢেঁড়স। দেখলেই জিভে জল আসে।

রাত আরেকটু গভীর হয়ে আসতেই বটকেষ্ট দোকানের ঝাঁপ ফেলে ঘরমুখো হল। ডানহাতের ঢিলে স্ট্র্যাপওয়ালা আদ্যিকালের রংচটা ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। রাস্তাঘাট শুনশান। রাত্রি অদ্ভুত মোহিনী সর্পিণীর মতো আস্তে আস্তে গিলে ফেলছে গোটা অঞ্চলকে।

সবজিবিক্রেতা মকবুল কিন্তু তখনও বসে আছে তার সর্বশেষ ক্রেতাটির জন্য। বটকেষ্টকে সে নাম দিয়েছে, কাঠিবাবু। কোনও একসময় নেশাতুর দুর্বলতায় এর কাছে তার গোপন কথা ফাঁস করে ফেলেছিল। তারপর থেকেই এই নতুন নামকরণ। তবে মকবুল মানুষ ভালো। প্রাচীন পরিত্যক্ত কুয়োর মতো রহস্যটুকু নিজের পেটেই জমিয়ে রেখেছে; পাঁচকান করেনি।

পোকায় কাটা বেগুন, বাসি আলু আর মাংসের টুকরোয় থলি ভরে যখন সে বাড়ির দিকে রওনা হল তখন মাথার উপর অজস্র তারা টুনি বাল্বের মতো জ্বলছে, নিভছে। বেশ বড়সড় জলসাঘরের বাতির মতোই নীলাভ, কুহকময়।

বটকেষ্ট হাঁটতে হাঁটতেই নিজের কথা ভাবছিল। পৃথিবীর সব অংশে না জানি এখন কত সুখ! প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু আনন্দ আছে। কারুর দাম্পত্য সুখ, কারুর সুখটা অর্থকরী; কারুর বা সন্তানলাভের আনন্দ। দুঃখ থাকলেও কোথাও না কোথাও সুখের তিরতিরে ঝোরা ক্রমশই বয়ে চলেছে।

শুধু একা সে-ই সবকিছু থেকে বঞ্চিত! কেন? মকবুলের দেওয়া নামটা বারবার মনে পড়ছিল তার। কাঠিবাবু! পরের পিছনে কাঠি দেওয়া যার স্বভাব তার এমন নাম হওয়াই স্বাভাবিক।

সে আপনমনেই ফিক করে হেসে ফেলল। মকবুল জানে না, যাকে ওরা 'আল্লাহ' বলে আর বটকেষ্টরা 'ভগবান', তার চেয়ে বড় 'কাঠিবাবু' দুনিয়ায় আর নেই। সে যখন কাঠি দেয় তখন জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

আকাশটা তখনও ঝকঝক করে হাসছিল। বটকেষ্ট আকাশের দিকে তাকিয়ে অদৃশ্য কারুর দিকে মনে মনে একরাশ গালাগালি ছুড়ে দেয়। চোখে আগুনের হল্কা নিয়ে উগরে দেয় অশ্রাব্য খিস্তিখেউড়...

শালা...হারামজাদা...শুয়োরের বাচ্চা!...পিছনে কাঠি দেওয়ার জন্য তুই একটা হতভাগা পানওয়ালাকেই পেয়েছিলি?......

বাড়ি ফেরার পর মেজাজ আরও খিঁচড়ে গেল।

সব পুরুষই চায় সারাদিনের খাটুনির পর স্ত্রীর সঙ্গলাভ করতে। ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত মানুষের সামনে জলের গ্লাস এনে দেওয়ার একটা চুড়ি পরা হাত। সযত্নে খাবার বেড়ে দেওয়া। পান্তাভাতই হোক কি বিরিয়ানি; একটি মানুষের সস্নেহ পরিপাটি পরিবেশনে তাই হয়ে ওঠে অমৃত। তারপর রাতে একটি সুস্থ, সুন্দর, সপ্রেম মিলন।

অথচ বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় রীতিমতো দাপাদাপি করছিল বৌটা! এমন পেট ব্যথা তার প্রায়ই হয়। তখন কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে থাকে। আজ বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মধ্যরাত অবধি একফোঁটাও ঘুমোতে পারেনি। মনে হচ্ছিল আজই বুঝি সব যন্ত্রণার শেষ হয়। কিন্তু মাঝরাতের দিকে ব্যথাটা নরম হয়ে আসতেই বাঁচোয়া।

মেয়েছেলের একেবারে কই মাছের প্রাণ!

বাড়ির বাইরে দাওয়ায় বসে বৌয়ের ঝটপটানির শব্দ শুনছিল বটকেষ্ট। তার সাথে সাথেই চলছিল নিজের স্বর্গগত বাপের দ্বিতীয়বার শ্রাদ্ধ! সারা দুনিয়ায় আর মেয়ে খুঁজে পায়নি! একটা রোগের ডিপোকে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেল! নে শালা! পচা লাশ ঘাড়ে চাপিয়ে বৈতরণী পার হ! বাপ নয়...বাপ নয়...শত্তুর! নিজে তিনটে বিয়ে করেছিল। র-সে-র না-গ-র! আর ছেলের বেলায় একটা জন্মরোগীকে গছিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছে!

মরা বাপটাকে হাতের কাছে পেলে এইমুহূর্তে খুনোখুনি হয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে উপায় নেই। অগত্যা স্বর্গীয় পিতার উদ্দেশে 'ছিক' করে একদলা থুতু ফেলে সে উঠে দাঁড়াল। রাতের খাওয়া হয়নি। খাবারে বা মদে আর রুচি ছিল না। শিকারি বেড়ালের মতো ক্ষুধার্ত জ্বলজ্বলে চোখ! ঠান্ডা হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে উত্তপ্ত শরীরকে জুড়িয়ে দেওয়ার বৃথা চেষ্টায়।

বটকেষ্টর বাড়ির কাছেই তখন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ! মেয়ে গলার চাপা হাসি, পুরুষের উত্তেজিত শ্বাস! তার মুখগহ্বর ঘন লালায় ভরে গেল। শরীরটা কেমন যেন আঁকুপাঁকু করছে!

ডোবার ঠিক উল্টোদিকের বাড়ির ছেলেটার নতুন বিয়ে হয়েছে। ছেলেটাকে দেখতে আস্ত ষাঁড়ের মতো! অথচ বৌটা বেশ। নরমসরম পাউরুটির মতো ফুলো ফুলো গাল। পরিষ্কার রং, গড়নটাও চমৎকার! অমন পুতুলের মতো মেয়েটাকে একটা ষাঁড়ের সাথে বিয়ে দিল কেন মেয়ের বাপ কে জানে! দুনিয়ার সব বাপগুলোই বোধহয় চোখে ঠুলি পরে বসে আছে। নয়তো কোন প্রাণে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা দেয়?

বটকেষ্ট গুটি গুটি পায়ে সেদিকেই এগিয়ে যায়।

শোবার ঘরের জানলা বন্ধ করেনি কেউ। এই ভ্যাপসা গরমে জানলা বন্ধ করেও ঘুমোনো সম্ভবও নয়। সদ্য বিবাহিত দম্পতির ঘরের জানলাও খোলাই ছিল।

ভিতরে জমাট অন্ধকার। তা সত্ত্বেও দুটো ছায়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুটো শরীর মেতে উঠেছে আনন্দ খেলায়! উপরের দেহটা পুরুষের। তার দেহ আড়াল করে আছে নারীকে। মিলনের চরম সুখে দুজনেই আকুল হয়ে উঠেছে! চরম উত্তেজনায় উদ্বেলিত।

হঠাৎই মেয়েটির স্তিমিত দৃষ্টির সামনে যেন একটা পর্দা খসে পড়ল! ওকী! খোলা জানলায় এত রাতে ওটা কার মুখ! দুই জ্বলজ্বলে অতৃপ্ত চোখ মেলে নির্লজ্জের মতো চেয়ে আছে......কে?

পুরুষকে ছিটকে সরিয়ে দিয়ে আর্তচিৎকার করে ওঠে মেয়ে, 'ওই...ওই...কে?'

মুখটা সাঁৎ করে বিদ্যুৎগতিতে জানলা থেকে সরে গেল। পুরুষটি ততক্ষণে লাফ মেরে দরজা খুলে ফেলেছে......

—'এই শালা...বা......'

একটা ছায়া ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বাইরে শুধু জমাট কালোর প্রলেপ ছাড়া আর কিছু নেই!

জানলা-দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় ফিরে এল পুরুষ। মেয়েটি নিথর হয়ে শুয়েছিল। স্বামী তাকে স্পর্শ করতেই নিস্তেজ স্বরে বলে, 'আজ থাক'।

দুটি শরীর পাশাপাশি শুয়ে রইল; নিস্পন্দ, প্রতিক্রিয়াহীন!

পালাতে পালাতে বস্তি পেরিয়ে বটকেষ্ট ফের রাস্তায় চলে এসেছে। সার সার ল্যাম্পপোস্ট রাস্তার দু-পাশে 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে। গায়ে পালস পোলিও টিকার জমকালো বিজ্ঞাপন। রাস্তার পাশে জলের কল থেকে জলবিন্দু পড়ছে টুপটাপ। আর কোনও শব্দ নেই।

সামনেই মাথা উঁচু দাম্ভিক ফ্ল্যাটের বাঁদিকের জানলায় নীল সমুদ্র। নীল জোয়ারে হয়তো ইউক্যালিপ্টাসের গন্ধ! দুটো সোনালি মাছ হাবুডুবু খেয়ে খেলা করছে এখন।

বটকেষ্ট একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ঠেস দিয়ে পাগলের মতো খুব একচোট হেসে নিল। ছেলেমেয়ে দুটোর সুখের রাতটায় আচ্ছা কাঠি হয়েছে! রোজই সুখ ভোগ করবে! আহ্লাদ! একটা রাত অন্তত নষ্ট হোক।

ফ্ল্যাটের নীচে দাঁড়িয়ে দামি চতুষ্পদ। বেশ দামি গাড়ি। কাচে আলো পড়ে ঝলসে উঠছে। ভেলভেটের মতো গায়ে মাছি বসলেও বোধহয় পিছলে পড়বে! তেল চকচকে শরীরে ঝকঝক করছে অর্থ, সুখ, সমৃদ্ধি, প্রতিপত্তি।

এটা এই ফ্ল্যাটের প্রোমোটার তপন পালের গাড়ি। নীল কাচওয়ালা ফ্ল্যাটটাও তারই। শালা, একনম্বরের খচ্চর! অমন মাগীবাজ লোক দুটো নেই। একটা বৌ আর দুটো মেয়ে থাকে ব্যারাকপুরে। তারপরেও হারামির হাতবাক্সটা আরেকটা মেয়ের সাথে হাওড়ার ফ্ল্যাটে থাকে। আবার মালতীবৌদির সাথে এই ফ্ল্যাটে প্রায়ই রাতে রাসলীলা করে। আরও কটা বেশ্যা পুষে রেখেছে কে জানে! ব্যাটা টাকার কুমির; একশোটা মহিলা থাকাও আশ্চর্য নয়।

নীল কাচের দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সে। মালতী-বৌদি ভিতরে আছে নিশ্চয়ই। স্বামীটা ঘরে মরছে। নিজস্ব একটা পয়সাও নেই চিকিৎসার জন্য। তপন পালের পয়সায় বেঁচে আছে গোটা পরিবার। ক্যান্সারের রোগী বরটা বেশিদিন বাঁচবে না সে ওই হারামি প্রোমোটারটাও জানে। লোকটা মরলে তো ওরই পোয়াবারো!

মালতীবৌদিরও কি পোয়াবারো? মহিলাকে বোঝা মুস্কিল। স্বামী বাঁচবে না তা কি সে নিজে বোঝে না? তবু কীসের আশায় বহুনারীভোগী লম্পটটার হাতে নিজের চামড়া বেচছে?

ধুস...!

বটকেষ্ট ভেবে দেখল সে আবার ভুলভাল ভাবতে শুরু করেছে! আজকাল কি একটু বেশিই ভাবছে? নিজের ভিতরই কী করে যেন দুটো ভাগ টের পায় সে! একটা তার মতোই কুচকুচে কালো। আরেকটা সাদা। সাদাটা যে কোথা থেকে এসে টপকে পড়ে তা ভগাই জানে! সে ব্যাটা শুধু প্রশ্ন করে যায়, এটা ঠিক হল?...ঠিক হল? এটা কি ঠিক হল?......

আচমকা পিঠের উপর একটা নরম স্পর্শ!

বটকেষ্ট চমকে পিছনে ফিরল। পিছনে তাকাতেই বিস্ময়টা আরও প্রগাঢ় হয় তার! এত রাতে নিঝুম রাস্তায়, তার পিছনে একটা বাচ্চা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে! জ্বলজ্বলে দুই চোখে নির্ভেজাল হিংস্রতা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওই নীল জানলার দিকেই!

মালতীবৌদির ছেলে—বিট্টু!!!

সে অবাক হয়! বাচ্চা ছেলেটা এত রাতে এখানে কী করছে? কতই বা বয়েস ওর? মেরেকেটে চোদ্দো কি পনেরো হবে। এখন ওর ঘুমোনোর কথা, স্বপ্ন দেখার সময়। সেসব ছেড়ে এত রাতে এই জনহীন রাস্তায় কীজন্য এসেছে সে?

বটকেষ্ট গলা খাঁকারি দেয়, 'তুই বিট্টু না?'

ছেলেটার জ্বলজ্বলে চোখ ফ্ল্যাটের জানলা থেকে বটকেষ্টর মুখের দিকে ফিরল। সে একটু চুপ করে থেকে উত্তর দেয়, 'হুঁ।'

—'এখানে কী করছিস?'

তার দৃষ্টি অনাবিল জিঘাংসা নিয়ে ফের ঘুরে গেছে ফ্ল্যাটের জানলার দিকে। বটকেষ্টর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন সে বোধ করল না।

—'কী হল?' বটকেষ্ট ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'এত রাতে এখানে কী করছিস? চোখে ঘুম নেই?'

বিট্টু যেন চমকে উঠে তার দিকে তাকায়। অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবছে সে! এবারও প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। তবে কয়েক মুহূর্ত গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করে আস্তে আস্তে পা বাড়াল উল্টোদিকে।

বটকেষ্ট দেখল বিট্টু ধীরে ধীরে নিজের বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে।

এরপর আরও দিন তিনেক বিট্টুকে দেখেছে বটকেষ্ট। রাতদুপুরে, ওই ফ্ল্যাটের সামনে। সে যেন কিছু করতে চায়। একটা অদম্য ইচ্ছা তার ভিতরে দাপিয়ে মরছে। অথচ আরও একটা মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

বটকেষ্ট অনুভব করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আজকাল কিছু কিছু বিষয় তাকে বড়ই ভাবায়। অনেকবার ঠিক করেছে যে কিছুতেই ভাববে না। তবু একেবারে ঝেড়ে ফেলা মুস্কিল। বিশেষ করে বিট্টুর কথা। ছেলেটা ঠিক কী করতে চায়? কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সে প্রায়ই ওই ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ায়? কী আছে ওর মনে?

মালতীবৌদিকেও প্রায়ই দেখতে পায় সে। ঘরে একটা আধমরা মানুষ, তাও মহিলার কী সাজের ঘটা! স্বামী মরতে চলেছে; কিন্তু বৌয়ের গাঢ় লিপস্টিক তাতেও ফিকে হয় না! দামি দামি শাড়ি-গয়না পরে তপন পালের এসি গাড়ি চড়ে হুশ করে চলে যায়। দেখলেই গায়ে জ্বালা ধরে তার। মেয়েছেলের কী নষ্টামি! হোক মৃত্যুপথযাত্রী; তবু স্বামী তো আছে! তাকে ঘরে ফেলে মাগী ফুর্তি করতে চলল! পেটে অল্পস্বল্প শিক্ষেদীক্ষেও আছে। একেবারে ক' অক্ষর গোমাংস নয়। গতরে শক্তি আছে। তাই খাটিয়ে খা না বাপু! পরপুরুষের সাথে ঢলাঢলি করতেই হবে?

তার হাত নিশপিশ করে। খুব ইচ্ছে হয় দুটোর ফুর্তিতে কোনওভাবে কাঠি দিতে। কোনও কষ্ট নেই, খাটনি নেই; শুয়ে শুয়েই কী সুন্দর আরাম আর বিলাসের জিনিসগুলো হাসিল করে নিচ্ছে মহিলা! এত সহজে হাসিল করে নেবে সব সুখ! কী অন্যায় আবদার!

ধুত্তোর! মাথা ঝাঁকিয়ে যেন চিন্তাগুলোকেও ঝেড়ে ফেলতে চায় বটকেষ্ট। পরের ছেলে পরমানন্দ, যত গোল্লায় যায় তত আনন্দ। মরুক গে যাক। এসব লটঘট নিয়ে চিন্তা করে খামোখা সময় নষ্ট। যা পারে করুক। তার কী?

সে সমস্ত ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রেখে পান সাজায় মন দেয়। আজ অন্যান্য দিনের তুলনায় গরম কম। ভোরের দিকে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। হাওয়াটা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা। গা জুড়িয়ে দেয়। মনটাও ফুরফুরে হয়ে ওঠে।

পান সাজার মধ্যেই কানে আসে, কোথায় যেন রেল রোকো হয়েছে। অফিসযাত্রী, স্কুলের ছেলেমেয়েদের দুর্ভোগের অন্ত নেই। অনেকে স্টেশনে গিয়ে ফের বাড়ি ফেরত চলে এসেছে। কেউ কেউ আবার বাসের দমবন্ধ ভিড়ে মারামারি করে অফিস-স্কুলমুখো হয়েছে।

খদ্দেরকে পছন্দমতো পান দিতে দিতে সবই চুপচাপ শুনছিল বটকেষ্ট। এসব খবরে কোনও নতুনত্ব নেই।

এক দাদা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ধরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দুরবস্থা নিয়ে লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়ছিলেন। তাঁর সাথে হঠাৎ আরেক দাদার তর্ক বেধে গেল।

—'আরে বনধ কি লোকে এমনি এমনি করে? এসব বনধ, রেলরোকো না করলে সরকারের যে টনক নড়ে না!' প্রথম দাদা প্রায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছেন, 'এতদিনের শাসনে কী দিতে পেরেছে সরকার? তেলের দাম হু হু করে বাড়ছে। বাজার অগ্নিমূল্য। মিডল ক্লাস খাবে কী? চালের দাম দেখেছেন?'

দ্বিতীয় দাদা অপেক্ষাকৃত শান্ত, 'ওটা সেন্ট্রালের ব্যাপার। স্টেট গভর্নমেন্ট কী করবে? তা ছাড়া এতদিনে কি রাজ্যটা উচ্ছন্নে গেছে?'

—'নয়তো কোথায় গেছে?' প্রথম দাদা মুখে ফেনা ভেঙে বললেন—'অন্যান্য মেট্রো সিটিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেছেন.....?'

বটকেষ্ট মিটমিট করে হাসছিল। লোকগুলোর খেয়ে আর কাজ নেই। ফালতু মগজমারি নিয়ে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ লাগিয়েছে। দুনিয়ার খবর রাখে, শুধু নিজের ঘরের খবর ছাড়া!

সে তর্কের মধ্যে বাগড়া দেয়। প্রথম দাদার দিকে তাকিয়ে হাসছে :

—'দাদা কি দল পাল্টেছেন নাকি?'

প্রথম দাদা থতমত খেয়ে তাকিয়েছেন, 'মানে?'

—'আপনি সরকারি চাকরি করেন না?'

—'করি। তাতে কী?' তিনি আবার চেঁচাতে শুরু করেছেন, 'সরকারি চাকরি করলেই পা চাটতে হবে নাকি?'

—'অ!' তার চোখে পেটেন্ট মিহি দৃষ্টিটা ফের উঠে এসেছে। এই দাদাটি তার চেনা। পাড়ারই লোক। এঁর মেয়ে ক্লাস ফোরে পড়ে। রোজ সকালে যখন বটকেষ্ট দোকান খোলে তখন মেয়েকে স্কুলে দিতে যান ভদ্রলোক। ওনার বৌ ভারী আলাপী মানুষ। দুপুরবেলা প্রায়ই মিষ্টি পান নিতে আসেন। গল্পগাছা করেন।

—'বৌদি বলছিলেন মেয়েকে ইংরিজি মিডিয়ামে দেওয়ার খুব ইচ্ছে আপনার'। সে ধীরেসুস্থে বলে, 'নামী ইস্কুলে ভর্তির জন্য পার্টির লোক রাজীব সমাদ্দারকে ধরেছিলেন না? রাজীববাবুও কাজটা করে

দেবেন বলে দিয়েছিলেন......'

তড়পানি যে কোথায় গেল! দাদার মুখ চুপসে ফাটা ঠোঙা। আশেপাশের লোকেরা তার দিকেই দেখছে। সকলের চোখেই প্রচ্ছন্ন বিস্ময়ের সাথে মিশ্রিত বিদ্রূপ। কেউ কেউ বঙ্কিম অম্লরসাক্ত হাসিও হাসছে।

খুব সুনিপুণ ভাবে কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকল বটকেষ্ট, 'আপনি দল বদলেছেন সে কথা রাজীববাবু জানেন?'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাদা তাকে জরিপ করছেন। এভাবে লোকটা সবার সামনে বাঁশ দিয়ে দেবে তা ভাবেননি। আশেপাশের লোকগুলো মিটিমিটি হাসছে।

দাঁতে দাঁত পিষলেন তিনি। গিন্নির পেট পাতলা হলে কর্তাদের এমন সর্বনাশই হয়!

অসম্ভব রাগ আর অপমান কোনমতে গিলে ফেলে জ্বালাময়ী কণ্ঠে বললেন,

—'একটা চ্যান্সেলরের প্যাকেট দিতে আর কত সময় লাগাবি তুই?'

বটকেষ্ট হেসে ফেলল। বোঝা গেছে লোকটার দৌড়!

—'ঔরত জাতই হয় সব্বোনাশের গোড়া।' মকবুল সবজি মেপে মেপে চটের থলিটায় ভরে দিচ্ছিল। রোজই সে পরিমাণে একটু বেশিই দেয়। বলাই বাহুল্য, এই হতভাগা কাঠিবাবুর উপর তার মায়া পড়ে গেছে। বেশির ভাগ ক্রেতাই সবজীবিক্রেতাকে মানুষ বলে গণ্য করে না। কথা বলার ভঙ্গিতেই থাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য।

একমাত্র এই লোকটার সাথেই আলাপ জমাতে পারে মকবুল। পেশ করতে পারে তার দার্শনিক তত্ত্বগুলো।

আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

—'উয়াদের রংঢং দেইখ্যা ভোললেই জাহান্নামের রাস্তা খুলে! বোঝলা নি কাঠিবাবু?'

বটকেষ্ট হাসে, 'রংঢং দেখার সুযোগ হল কই রে?'

—'ক্যান?' মকবুলের মুখে চিন্তার ছাপ, 'বিবিজানের বিমারি কুমে নাই?'

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এ বিমারি আর কমার নয়। রোগী নিয়ে ঘর করতে করতে তাকেও যেন রোগে ধরেছে। মাঝেমধ্যেই টের পায় ভিতরটা বড্ড জ্বালাপোড়া করে। একেবারে দাবানলের মতো বুকের ভিতরে আগুন পাঁজর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেয়। শুধু ভস্ম...! শুধু শ্মশানের ছাই মেখে বসে আছে সে! এ এক অদ্ভুত রোগ! এ রোগেরও নিরাময় নেই।

—'আল্লাহরে তো আর বিশ্বাস করো না'। মকবুল ব্যাগটা এগিয়ে দিয়েছে, 'ভাবিজানরে লইয়া কুনো পিরের দরগায় যাও। দানোর নজর লাগে মনে লয়। নিজের জন্য না যাও বিবিডার কথা ভাইব্যা দেইখ্যো।'

ব্যাগটা হাতে নিয়ে বটকেষ্ট অর্থপূর্ণ হাসল। আর কথা না বাড়িয়ে এবার ফেরার পথ ধরেছে। মকবুল ধর্মপ্রাণ মানুষ। তাই জগৎজুড়ে ঈশ্বরের কৃপা আর দানবের কুদৃষ্টিই তার চোখে পড়ে। তার বিশ্বস্ত 'আল্লাহ'ও যে কুদৃষ্টি দিতে পারেন তা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আজকাল আর বাড়ি ফিরতেও ইচ্ছে করে না। ঘরের টান নেই। সংসারের প্রতি তীব্র অনীহা। জৈবিক চাহিদাগুলো দমবন্ধ হয়ে শরীরের ভিতরে আঁকুপাঁকু করতে থাকে। নবদম্পতি সেদিনের ঘটনার পর জানলা বন্ধ করে শুতে শুরু করেছে। আর যারা প্রতিবেশী আছে তাদের বেশির ভাগই বুড়োবুড়ি। দেখার কিছু নেই। এমতাবস্থায় নিজের রিপুকে শান্ত করার উপায়ও অপ্রতুল।

বাজার থেকে অনতিদূরে রাস্তার পাশের সাদা বাড়িটা মুখুজ্যেদের বাড়ি। এ বাড়ির বৌ রেখা সম্ভবত বাঁজা। এখনও পর্যন্ত বাচ্চা-কাচ্চা হওয়ার লক্ষণ নেই। কিন্তু দম্পতির মধ্যে প্রেমের অভাব তো নেই-ই উপরন্তু লোক দেখানো সোহাগের চোটে চোখে অন্ধকার! ভাব এমন করে যেন উত্তম-সুচিত্রা চলেছে! রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যেই প্রায় জড়াজড়ি করে হাঁটে। লজ্জাশরমের মাথা খেয়েছে!

বটকেষ্টর খুব ইচ্ছে ছিল উত্তম-সুচিত্রার মধ্যে বিকাশ রায় হয়ে ঢুকে পড়ে। অনেকদিন ধরেই ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছে। তবে সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

আজ মনটা বিক্ষিপ্ত ছিল। নিজের দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতায় মনে মনে জ্বলছিল সে। কোথাও জ্বালাটা উগরে না দেওয়া অবধি শান্তি নেই। চিড়বিড়ে যন্ত্রণাটা জ্বালিয়ে খাচ্ছিল তাকে।

এমন সময়ই সামনে পড়ে গেলেন রেখাবৌদি।

সম্ভবত স্বামী এখনও অফিস থেকে ফেরেননি। হয়তো ওভারটাইম অথবা যানজটে আটকে গেছেন। বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে তাঁর অপেক্ষাই করছিলেন রেখা। স্বামীর বাড়ি ফেরার সময় হলেই প্রতিদিন নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে নেন। একঢাল খোলা রেশমি চুল ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছে। উড়ছিল পরিপাটি করে পরা শাড়ির আঁচলও।

বটকেষ্ট পাশ দিয়ে যেতে যেতেই থমকে দাঁড়াল। একটা অদ্ভুত সুন্দর উষ্ণ গন্ধ ভেসে আসছে রেখাবৌদির শরীর থেকে! গন্ধটা নাকে আসতেই ভিতরের রিপুগুলো অসহ্য রাগে ফের রাক্ষুসে দাপাদাপি করতে শুরু করল।

বটকেষ্টর মুখ কিন্তু ভাবলেশহীন। অন্দরের উথালপাথাল উত্তেজনা ছাপ ফেলেনি বাইরে। সে হেসে বলে, 'বৌদি, এত রাতে বাইরে যে! দাদা ফেরেননি বুঝি?'

রেখা বৌদি প্রায় ফিল্মের নায়িকার ভঙ্গিতেই অপেক্ষা করছিলেন। বটকেষ্টকে হয়তো লক্ষ করেননি। এবার খেয়াল হল।

—'নাঃ।' তিনি হাসছেন, 'ওর ওভারটাইম চলছে। ফিরতে দেরি হবে।'

—'রোজই ওভারটেম?'

—'হ্যাঁ, এই সময়টা ওদের কাজের চাপটা বেশি থাকে।'

—'রোজই? বলেন কী?' বটকেষ্ট অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলে, 'তা'লে গত তিনদিন ধরে আপনারা দুজনে মিলে বাইকে বেড়াচ্ছেন কী করে?' পরক্ষণেই ফিক করে হেসে ফেলেছে, 'দাদা আপিসের কাজেও ফাঁকি দেন তা'লে!'

—'কে বলল তিনদিন ধরে বাইকে চড়ে বেড়াচ্ছি?' রেখার মুখে পাতলা হাসি, 'একসময় অবশ্য খুব বেড়াতাম। কিন্তু এখন ওর সময় হয় না।'

—'কী যে বলেন বৌদি!' তার চোখে কৌতুক, 'আমাদের কাছে লুকিয়ে লাভ কী? এই তো গতকাল, পরশু, তার আগের দিনও আপনাদের দুজনকে একসাথে বাইকে করে ফিরতে দেখলুম! আপনি কমলা রঙের জামা আর কালো প্যান্ট পরেছিলেন। মনে নেই?'

রেখাবৌদির মুখের হাসিটা কেউ যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিল। চোখে অনাবিল বিস্ময়, 'টপ! জিনস! কিন্তু আমি তো টপ-জিন্স পরি না!'

—'সেকী! আপনি পরেন না!' সে যেন থতমত খেয়ে বলে, 'তবে দাদার পিছনে কে বসেছিল!'

বৌদির মুখ আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে উঠছিল। আগের 'নায়িকা নায়িকা' ভাব আর নেই। বটকেষ্টর মনে মনে ব্যাপক হাসি পাচ্ছে। আজ বেচারি উত্তমকুমারের কপালে দুঃখ আছে। বাড়ি ফিরে সুচিত্রা সেনের বদলে 'গীতা দে'র রণং দেহি মূর্তির মোকাবিলা করতে হবে। বেচারা!

—'তুমি বোধহয় ভুল দেখেছ।'

—'হুঃ!' সে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, 'বোধহয় তাই। যদিও খুব একটা ভুল আমার হয় না। তবে...আপনি বলছেন যখন...তখন বোধহয়...ভু-ল-ই দেখেছি!'

স্তম্ভিত বৌদিকে পিছনে ফেলে আর কোনও বাক্যব্যয় না করে এগিয়ে গেল বটকেষ্ট। তার পেট ফেটে হাসি পাচ্ছিল। মহিলা যেমনই হোক, যতই সুন্দরী আধুনিক হোক, বরকে সন্দেহ করতে ছাড়বে না। ওটা মেয়েদের বহু অভ্যাসের একটা!

যাক, আজ আরও দুটো নারী-পুরুষের রাত মাটি করে দেওয়া গেছে। সে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসে। কখনও কখনও নিজের হাসিটা তার চতুর খ্যাঁকশেয়ালের মতো মনে হয়। হায়নার হাসির কথা অনেকেই শুনেছে। কিন্তু শেয়াল হাসে কি না ঠিক জানা নেই।

তবে আন্দাজ করা যায় যে শেয়াল হাসলে বটকেষ্টর মতো করেই হাসত। এমনই চতুরতা আর হিংস্রতার সম্পৃক্ত মিশ্রণ!

আজ কিছুতেই বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল না। ইচ্ছেটাই বিকল হয়ে গেছে। বাড়ি যত কাছে আসছিল তত যেন একটা দমবন্ধ অনুভূতি চেপে ধরছিল তাকে। যেন ভেতরে ব্যর্থতা নামের একটা রাক্ষস বসে আছে তারই অপেক্ষায়। ঘরে ঢুকলেই চেপে ধরবে!

নিজের বাড়ির সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল বটকেষ্ট। ভিতরে যথারীতি নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার। বাড়ি নয়; শ্মশান! এখানে কোনও জীবিত মানুষ ঘর করে না। মৃত স্বপ্ন আর ইচ্ছেরা সংসার পেতে বসেছে। ইট-কাঠ-পাথরগুলোও শোকস্তব্ধ।

এখন নিজের বাড়িতে ঢুকতেও ভয় করে। আজ পর্যন্ত এই বাড়িটা 'ঘর' হয়ে উঠল না। দেওয়ালগুলো কোনওদিন হাসি শুনল না। বহুদিনের নীরবতা জমে জমে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

সে বাইরে দাঁড়িয়েই ভিতরের ঘরে বৌয়ের ব্যথাক্লান্ত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ওই শব্দটুকুই একমাত্র প্রমাণ যে এ বাড়িতে একজন জীবন্ত মানুষ আছে। অন্ধকার চৌহদ্দির মধ্যে আর

কোনও প্রাণের সাড়া নেই। নেই আলো, নেই শান্তি!

অথচ আকাশটা আজও কী সুন্দর! সামান্য ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ এখনও ইতস্তত ভাসছে। রুপোর টাকার মতো চাঁদটা জ্বলজ্বল করছিল একপাশে। কখনও কখনও মেঘের পাতলা আস্তরণ অল্প অল্প ছুঁয়ে যাচ্ছে; কিন্তু ম্লান করে দিতে পারেনি। নীলাভ আভার শান্ত জ্যোৎস্না গাছের মাথা থেকে চুঁইয়ে পড়ছিল। আলোর ধারায় ভেসে যাচ্ছে সব! কত আলো! কত আলো!

এমন আলোর একাংশও কি তার ঘরে জ্বলতে পারত না? সবাই এর ভাগ পেতে পারে; একা বটকেষ্টই বাদ!

বাড়ি ফিরেও সে ভেতরে ঢুকল না। রুচি ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ দাওয়ায় বসেই কাটিয়ে দিল। তারপর কী ভেবে যেন ফের উঠে দাঁড়িয়েছে। গন্তব্যস্থান ঘর নয়। কোথায় যাবে নিজেও জানে না। শুধু এইটুকু জানে এই অভিশপ্ত বাড়ি থেকে যতদূরে পালানো যায় তত ভালো!

বটকেষ্ট দ্রুতগতিতে হাঁটতে হাঁটতে মেইনরোডের দিকে চলল। সে পালাচ্ছে। নিজের বাড়ির বিষণ্ণতার দিকে মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল মানুষটা।

ঝোপঝাড়ের গা থেকে একটা বুনো গন্ধ ভেসে আসছে। রোজ এই গন্ধটা পাওয়া যায় না। সকালের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল বলেই এখনও স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা আগাছার গন্ধ প্রকট।

ঝোপের ফাঁকে ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গের মতো জোনাকি জ্বলছিল। তার পদতারণায় সন্ত্রস্ত হয়ে উড়ে গেল। চতুর্দিক অন্ধকার। শুধু সামান্য দূরে ল্যাম্পপোস্টের আলো মিটমিট করে জ্বলছে। সামনের দশাসই ফ্ল্যাটের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে তারই ক্ষীণ রশ্মি উল্টোদিকের মেটে রাস্তায় এসে পড়েছে। খানিকটা আলোকিত করার চেষ্টা করছে যেন। কিন্তু বিপরীতদিকের শূন্যতা সেই সামান্য আভাকেও শুষে নিয়েছে। সেখানে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব থাকতেই পারে না।

রাস্তার উপরের ফ্ল্যাটে তপন পালের ঘরের জানলায় নীলাভ আলোটা আজও দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ কপোত-কপোতী ভিতরেই আছে। ফ্ল্যাটটাকেই বৃন্দাবন বানিয়ে ফেলেছে দুজনে। দামি কাচের জানলায় নির্লজ্জ নীল রশ্মি। স্পষ্ট নয়, যেন নীল কুয়াশায় আবেশাচ্ছন্ন।

বটকেষ্ট সেদিকেই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। জানলাটা বড্ড উঁচুতে। নয়তো উঁকি মেরে একটু লীলাখেলা দেখা যেত। মন আনচান করছে। ভিতরে নিশ্চয়ই গরমাগরম ব্লু ফিল্ম-এর লাইভ টেলিকাস্ট চলছে! দেখার লোভ সম্পূর্ণ আছে। উপায় নেই।

সে লক্ষ করেনি কখন যেন অগোচরে আরেকটা ছায়ামূর্তি সরীসৃপের মতো সাবধানি ভঙ্গিতে উঠে এসেছে রাস্তার উপরে। অগ্নিদৃষ্টিতে ওই জানলাটার দিকেই তাকিয়ে আছে। বটকেষ্টর পিছনে, কয়েক হাত দূরত্বে একটা ছোট্ট ছায়া!

তার দু-চোখ রাতচরা নেকড়ের মতো ধক ধক করে জ্বলছিল!

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা! পরক্ষণেই ছোবল মারার মতো বিদ্যুতগতিতে উঠে এসেছে ছায়াটার হাত! একটা আধলা ইট অভ্রান্ত লক্ষ্যে আছড়ে পড়ল নীলাভ জানলাটার উপরে। মুহূর্তের ভগ্নাংশে আরও একটা!

প্রচণ্ড শব্দে ঝন ঝন করে ভেঙে পড়ল জানলার কাচ! রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান করে দিল একটা বিকট চিৎকার! ইটটা কারুর গায়ে পড়েছে!

—'এই কে?...কে রে?'

বটকেষ্ট দ্রুতগতিতে পিছনে ফিরল। ছায়াটা প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করছিল। সে প্রায় বাঘের মতো লাফ মেরে তাকে চেপে ধরেছে। তার ভীম বেষ্টনের মধ্যে ছায়াটা ছটফট করছে। কিন্তু পালাতে পারেনি।

—'কে রে শালা? রাতদুপুরে লোকের জানলায় ইট......!'

বলতে বলতেই সে থেমে গেল! ল্যাম্পপোস্টের আলোয় অপরাধীর মুখ দেখতে পেয়েছে। একটা বছর চোদ্দো-পনেরোর অপরিণত মুখ।

কিন্তু সে কী মুখ! হিংস্রতায় মুখের প্রত্যেকটা পেশি শক্ত! চোয়ালের হাড় কঠিন সঙ্কল্পে দৃঢ়বদ্ধ!

—'বিট্টু! তুই......!'

অপরিসীম বিস্ময়ে সে হতবাক। কী বলবে ভেবে পেল না। ছেলেটা এখন আর ছটফট করছে না। ভীষণ রাগে ফুঁসছে! সে অপলকে বটকেষ্টর দিকেই তাকিয়ে ছিল।

—'কৌন বে মা......? কৌন হ্যায়?'

ফ্ল্যাটের হিন্দুস্থানি নাইটগার্ডের আওয়াজ শুনতে পেল বটকেষ্ট। একঝলক তার চেহারাটাও দেখা যায়! মুশকো লোকটা হাতে লোহার রড উঁচিয়ে এদিকেই ছুটে আসছে!

সে একধাক্কায় সরিয়ে দিয়েছে বাচ্চাটাকে। ক্রুর, নিষ্ঠুর গলায় বলল :

—'পালা...।'

বিট্টু হতবাক, এত সহজে ছাড়া পাবে ভাবেনি! বাইরে প্রকাশ না করলেও সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল লোকটা তাকে ধরিয়ে দেবে। কিন্তু......

—'কী হল?' বটকেষ্ট চাপা অথচ কর্কশ ভাবে বলে, 'দারোয়ানের লাঠি পিঠে পড়লে তবে যাবি? যাঃ ভাগ......ভাগ বলছি!'

পরিস্থিতি সঙ্গীন বুঝতে পেরে বিট্টু পড়ি কি মরি করে দৌড়েছে। ক্ষিপ্রগতিতে সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ততক্ষণে নাইটওয়াচম্যানের চিৎকারের সঙ্গে মিশেছে তপন পালের ক্রুদ্ধ গর্জন। একটা ইট তার কপালে পড়েছে। তবে একদম সোজাসুজি লাগেনি। অতবড় ইটের টুকরো মাথায় পড়লে মাথাটা আর আস্ত থাকত না। অল্পের উপর দিয়ে গেলেও চোট লেগেছে। কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। জামাকাপড় অবিন্যস্ত! মদের নেশায় চোখ লাল। বীভৎস মূর্তি নিয়ে লোকটা ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে :

—'হারামি...খানকির বাচ্চা! বদরী ধর শুয়োরটাকে! কাচে ইট মারা! তপন পালের মাথা ফাটানো! দেখে নেব বা...টাকে!'

নাইটওয়াচম্যান ততক্ষণে রাস্তায় চলে এসেছে। বটকেষ্ট বিট্টুকে ছেড়ে দিলেও নিজে পালানোর চেষ্টা করেনি। নাইটগার্ড বদরীপ্রসাদ হাতের কাছে তাকে পেয়েই কলার চেপে ধরল।

—'শালে! সাবজি কা কাচ তোড় দিয়া! সর ফোঁড় দিয়া!...চল......'

সে বিন্দুমাত্রও প্রতিবাদ করল না। নিজেকে দরোয়ানের হাত থেকে ছাড়ানোর চেষ্টাও নেই। বদরী তাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল তপন পালের ফ্ল্যাটে।

তপন পালের কপাল থেকে রক্ত পড়ছিল। সে একটা তোয়ালে চেপে রেখেছে ক্ষতস্থানে। জামাটার বুক খোলা। গোরিলার মতো রোমশ বুক। পাঁচ মাসের পোয়াতির মতো ভুঁড়ি। লুঙ্গিটা নাভির নীচে এমনভাবে পরেছে যে ভয় হয়, এই বুঝি খসে পড়ল!

লোকটাকে দেখেই বটকেষ্টর গা ঘিনঘিন করে ওঠে...।

তপন পাল একদৃষ্টে তাকেই দেখছিল। বটকেষ্টকে সে চেনে। বেশ কয়েকবার ওর দোকান থেকেই পান, সিগ্রেট কিনেছে। সে অত্যন্ত ধূর্ত লোক। লোক চরিয়ে প্রোমোটারি করে খায়। একঝলক দেখেই আন্দাজ করল, বোধহয় এ লোকটা এ কাজ করেনি। তার মতো লোকের বাড়ির জানলা ভেঙে দেওয়ার মতো সাহস হয়তো ওর নেই। তা ছাড়া একটা পানওয়ালা তার কপাল ফাটাতে যাবে কেন?

তবু সে তীব্র কণ্ঠে বলে, 'তুই এখানে কী করছিস বে?'

বটকেষ্ট নিরুত্তর। সে মনে মনে ভাবছিল অন্য কথা। সব কথা ফাঁস করে দিলে কেমন হয়? এমন সাধের লটঘটটায় কাঠি হয়ে যাবে। প্রেমিকার ছেলে ইট মেরে নাগরের মাথা ফাটিয়েছে একথা জানতে পারলে পিরিত আর থাকবে কি? এমন সুন্দর রোজগারের রাস্তাটিও বন্ধ হয়ে যায়। মালতীবৌদির যাবতীয় সুখ, আরাম, বিলাসের মুখে ছাই পড়ে।

—'তুই এ কাজ করিসনি।' তপন পাল হিসহিসিয়ে বলে, 'আমি মানুষ চিনি। তোর এত সাহস নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই দেখেছিস কে করেছে। বদরী তোকে ফ্ল্যাটের সামনে থেকে ধরেছে। তুই কিছু জানিস না তা হতেই পারে না।'

বটকেষ্টর গলার হাড় সামান্য নড়ল। যেন কিছু বলবে।

মালতীবৌদি পাশের ঘর থেকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। স্পষ্ট না জানলেও আন্দাজ করতে পারেন এ কাজটা কে করেছে। অনেকদিন ধরেই এ আশঙ্কা ছিল। চাপা উত্তাপের আঁচও পেয়েছিলেন। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের আক্রোশ এতদূর গড়াবে তা ভাবতে পারেননি।

তিনি অসম্ভব আতঙ্কে বটকেষ্টর দিকেই তাকিয়েছিলেন। বটকেষ্টও সেদিকেই তাকাল।

হঠাৎ চোখে চোখ পড়ে গেল!

—'বল কে ইট মেরেছে।' তপন পাল যেন সাপের গলায় কথা বলছে; 'নয়তো তোকে পুলিশে দেবো। পুলিশের মার খেলে বুঝবি তপন পাল কী চিজ। সিধা সিধা বল, নয়তো....।'

বটকেষ্ট মালতীবৌদির ফ্যাকাশে মুখের দিকে একবার দেখে নিল। মহিলা আতঙ্কে সাদা! তার প্রাণভোমরা এখন এই কাঠিবাবুর হাতে। একটা নাম বললেই মাগীর ফূর্তিতে কাঠি!

তার চোখ মহিলার মুখ থেকে সরে গেল। ফ্ল্যাটের ভাঙা জানলা দিয়ে আকাশটা দেখা যাচ্ছে। স্বচ্ছ, সমুদ্রনীল আকাশটা আলোয় ভেসে যাচ্ছে! সে নিপ্পলকে সেদিকেই দেখছিল। উপরওয়ালা মিটমিট করে হাসছে। একটা চোদ্দো-পনেরো বছরের ছেলেকেও ছাড়েনি হারামজাদা!

—'বলবি না পুলিশ ডাকব?'

আবার হুমকি!

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বড় কাঠিবাবু যার পিছনে অন্তহীন কাঠি দিয়ে রেখেছে, এই নগণ্য কাঠিবাবু আর নতুন করে তাকে কি কাঠি দেবে?

—'ডাকব পুলিশ?'

—'যাকে খুশি ডাক।'

হঠাৎ সমান আক্রোশে বলে ওঠে বটকেষ্ট। তার মুখ ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে! উদ্ধত অনমনীয় ভঙ্গিতে বলল :

'আমিই ইট মেরেছি। বেশ করেছি! কী করবি...কর শা-লা!'

বিট্টুর চোখের চাপা রাগ বটকেষ্টর চোখে লেলিহান আগুন নিয়ে জ্বলে উঠেছে! ধক ধক করে দাবানল সব গ্রাস করে নিতে চায়। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিতে চায় সব কিছু....!

শুধু ভস্ম....শুধু ভস্ম....আর কিছু না....!!!!

—

খাদ

১

২রা এপ্রিল ২০১৯

পর্বতের কাছে এসে দাঁড়ালে অন্ধকারকেও জীবন্ত বলে মনে হয়!

গগনচুম্বী শৈলশ্রেণি যখন জমাট আঁধারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে তখন মনে হয়, হয়তো বা কোনও প্রাগৈতিহাসিক দানব বিরাট দেহটাকে এলিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তার খসখসে কালো চামড়া থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অতিলৌকিক আঁধার! সে অন্ধকার নির্জীব নয়। একটু একটু করে অতৃপ্ত অশরীরীর মতো সেও যেন কোনও এক নির্দিষ্ট রূপ ধরার চেষ্টা করছে। তার কালো কুচকুচে লম্বা আঙুলগুলো বুঝি ইশারায় কিছু নির্দেশ করে বলতে চায়, ওদিকে! ওখানে!

আকাশে হাল্কা মেঘের মধ্যে রুপোলি একফালি চাঁদ তীব্র, শানিত ফলার মতো নিষ্ঠুর বাঁকা হাসি হাসছে। তার আলো চুঁইয়ে পড়ছে এক বিষণ্ণ সর্বগ্রাসী গহ্বরে! সেই গহ্বর; যার তৃষ্ণা যুগযুগ ধরে সহস্র যৌবনোচ্ছল পাহাড়ি নদী, চঞ্চল ঝোরাও মেটাতে পারেনি! সে গহ্বর সৃষ্টির আদিযুগ থেকেই সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছে। এক প্রবীণ, প্রাজ্ঞ মানুষের মতো হৃদয়ে বরফশীতল নির্লিপ্তি মেখে দেখে গিয়েছে জীবনের অলিখিত অধ্যায়গুলো! সে পৃথিবীর আদিমতম সাক্ষী! আর তার নাম—!

খাদ!

খাদের অন্ধকার বুক থেকে উঠে আসছে হাল্কা ধোঁয়াশা। আর কিছু নেই! শুধু অন্ধকার! শুধু খাঁ খাঁ করা শূন্যতা! আর কিছু নয়!

‘এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার!—এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার!’

আচমকা রাত্রির শান্ত নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে একটা অত্যন্ত মৃদু স্বর ফিসফিস করে বলে উঠল কথাগুলো। আবছা কুয়াশায় সেই কণ্ঠস্বরের মালিককে স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু একটা ছায়াদেহ কোনওমতে টলতে টলতে এসে দাঁড়াল খাদের ধারে। তার নেশাগ্রস্ত নড়বড়ে পা ফেলা দেখলেই ভয় হয় যে, এই বুঝি পড়ে যাবে খাদের অতলে! যেরকম বিপজ্জনকভাবে টলছে মানুষটা তাতে যে কোনও মুহূর্তে অতলান্তিক খাদ গ্রাস করতে পারে তাকে।

কিন্তু লোকটার কোনও ভয় নেই! সে নির্ভয়ে টলতে টলতে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে ছুড়ে দিল সেই বাক্যটাই!

‘এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার!’

খাদ নিশ্চুপ! শুধু কুয়াশা আর অন্ধকার ছাড়া তার আর কিছুই দেওয়ার নেই! আপাতত শুধু এক অদ্ভুত প্রতীক্ষায় সে দু-হাত বাড়িয়ে আছে। হয়তো সেটাই একমাত্র উত্তর!

২

২রা এপ্রিল, ২০১০

একটি বৃষ্টিস্নাত সকাল।

দূরে হিমালয়ের সাদা শৃঙ্গ সূর্যের নরম সোনালি আলোয় ঝকমক করছে! দু-পাশের সদ্যস্নাত সবুজ পাহাড় লাস্যের ঢল নামিয়েছে। যেন নগাধিরাজ সোনার মুকুট পরেছেন। ধবধবে সাদা রাজবেশে কখনও সোনালি, কখনও রুপোলি জরির কারুকার্য। দু-কাঁধের রেশমি পান্নাসবুজ স্কন্ধাবরণ তাঁর পেশল দেহ স্পর্শ করে লুটিয়ে পড়েছে দু-দিকে।

এই দৃশ্যকে পেছনে রেখে লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝকঝকে কাঠের বাংলো। তার লাল টুকটুকে টালির ওপরে এসে পিছলে পড়ছে সূর্যরশ্মি। বাংলোর চারপাশে কিছু আপেল ও পাইনগাছের ভিড়। আপেলগাছগুলো এই মুহূর্তে ফুলে ফুলে ভরা। সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে সাদা ফুলগুলো ভারী লাজুক ভঙ্গিতে উঁকি মারছে। সাদার সঙ্গে ঈষৎ গোলাপি রঙের আভা যেন তাদের লজ্জারই প্রকাশ! বাংলোর সামনে যতদূর চোখ যায়, লাল রঙের আগুন! কামনা-বাসনায় লেলিহান উদগ্র লাল টিউলিপের বাগান সৌন্দর্যের চরমে প্রস্ফুটিত!

তার অনতিদূরেই খাদ! অতলান্তিক রহস্য আর নীরবতা নিয়ে সকালের রোদ মাখছে। সাদা মেঘের পাতলা আস্তরণে ঢাকা থাকার দরুন প্রায় কিছুই দেখা যায় না। সূর্যরশ্মিও সে জমাট কুয়াশাকে ভেদ করে উঠতে পারেনি।

মিসেস নীলম শেরাওয়াত সেই খাদের দিকে অনিমেষে তাকিয়েছিলেন। একহাতে ধরা বর্ষাস্নাত সিক্ত লাল টিউলিপের গুচ্ছ। অন্যহাতটা কোনও অজানা কারণে মুষ্টিবদ্ধ। তাঁর লম্বাটে নিখুঁত মুখমণ্ডলে এই মুহূর্তে কোনওরকম চাঞ্চল্য নেই। ঈষৎ ধূসর চোখদুটো খাদের দিকেই নিবদ্ধ। কিন্তু সে চোখে কোনও দৃষ্টি নেই! খাদের মতোই শূন্য এবং অভিব্যক্তিহীন। সব মিলিয়ে তাঁকে অদ্ভুত একটা ভাবলেশহীন অন্ধ পুতুলের মতো দেখাচ্ছে।

'মাম্মাখমা-ম্মাখ!'

একটি কচি মিষ্টি স্বরে তাঁর নিস্তরঙ্গ দৃষ্টিতে আলোড়ন উঠল। মুহূর্তের মধ্যে শূন্যতা সরে গিয়ে দু-চোখে উপচে পড়েছে মমতা ও স্নেহ। তিনি হাসিমুখে পেছন দিকে তাকালেন। একটি বছর তিনেকের শিশু ছোট্ট ছোট্ট হাত বাড়িয়ে এদিকেই ছুটে আসছে। খণ্ডমুহূর্তের মধ্যেই নীলমের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গম্ভীর মুখে বলল সে, 'ম্যায়নে পাপা কো হারা দিয়া।'

অপত্যস্নেহের সঙ্গে কিছুটা কৌতুক নেচে উঠল মিসেস শেরাওয়াতের চোখে। হাসি চেপে ছদ্ম কৌতূহলে বললেন, 'আচ্ছা?'

তিন বছরের বালক সজোরে মাথা ঝাঁকায়। এতক্ষণ সে তার বাবার সঙ্গে ছোট্ট প্লাস্টিকের কামান নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিল। দুশমনের ফৌজ, তথা কয়েকটা কাঠবিড়ালি একখানা পাইনগাছকে দখল করে, ঘাঁটি বানিয়ে বসেছিল। তাদের সবাইকে পরাস্ত করে শেষ পর্যন্ত ফৌজিসাহেব নিজের বাবাকে হারিয়েছেন! বলাই বাহুল্য, বড়ই পরিশ্রম হয়েছে তাঁর!

'হে; ই, জওয়ান! অ্যা-টে-ন-শ-ন!'

পেছন থেকে এবার পুরুষালি ভারী কণ্ঠ ভেসে এল। বছর পঁয়ত্রিশের এক দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ মানুষ বাংলো থেকে বেরিয়ে এদিকেই এলেন। শিশুটির কাছে এসে বললেন, 'তুমি দ্রাস সেক্টর অরক্ষিত রেখে এসেছ! আর সেটা আপাতত আমার দখলে!'

এতক্ষণের বিজয়ী হাস্যমুখ শিশুটি এবার হাপুস নয়নে কান্না জুড়ে দিল। একটু আগেই অনেক কষ্ট করে সে শত্রুসেনা নিধন করে ভারতমাতাকে মুক্তি দিয়ে এসেছে। কিন্তু কে জানত যে শত্রু আবার ফিরে আসবে! বেচারি কাঁদতে কাঁদতেই বলে, 'আপনে চিটিং কিয়া!'

নীলম শেরাওয়াত ক্রন্দনরত বালকটির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে পুরুষটির দিকে ছদ্মরাগে তাকালেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'দিস ইজ আনফেয়ার মেজর ধীমন্ত শেরাওয়াত!'

মেজর ধীমন্ত শেরাওয়াত ফিক করে হেসে ফেলেন। হাসলে তাঁর গালে ভারী চমৎকার একটা টোল পড়ে। হাসতে হাসতেই উষ্ণ স্বরে জবাব দিলেন, 'এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার!'

নীলমের ভুরু ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। নীচুস্বরে বললেন, 'তোমায় কতবার বলেছি, ওইটুকু বাচ্চাকে যুদ্ধ-মারদাঙ্গা শিখিও না। দুনিয়ায় আর কোনও খেলা নেই?'

ধীমন্ত শান্ত হাসলেন। নীলমকে বুঝিয়ে লাভ নেই। সম্পর্কে স্ত্রী হলেও নীলম তাঁর থেকে অনেকটাই ছোট। দুজনের বয়েসের মধ্যে প্রায় দশ বছরের ফারাক। তাই নীলমের মধ্যে এখনও কিছুটা ছেলেমানুষি রয়েই গিয়েছে। তিনি যুদ্ধ, বন্দুক, তোপ-গোলা থেকে দূরেই থাকতে চান। আসলে কার্গিলের যুদ্ধ নীলমকে অল্পবয়েসেই একদম অনাথ করে দিয়েছিল। তাই 'যুদ্ধ' শব্দটাকেই আন্তরিক ঘৃণা করেন তিনি।

জীবনের প্রারম্ভে নীলম কার্গিল সীমান্তের কাছাকাছি একটি প্রান্তিক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। সংসারে দরিদ্র মেষপালক বাবা এবং একটি মূক ও বধির জড়ভরত ভাই ছাড়া তাঁর আর কেউ ছিল না। নীলমের মা ছেলেটিকে জন্ম দিতে গিয়েই মারা যান। তখন নীলমও মাত্র সাত বছরের শিশুকন্যা। কিন্তু গরিবের সংসারে মেয়েরা অল্পবয়েসেই বড় হয়ে যায়। তাই সদ্যোজাত মাতৃহারা শিশুটির জননীর স্থান দখল করে নিতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি নীলমের। ছোট ভাইটি জন্ম থেকেই জড়বুদ্ধি এবং মূক-বধির! তাই তার দিদি হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছিল তাকে।

কিন্তু কার্গিলের ভয়াবহ যুদ্ধ নীলম আর তার ভাইয়ের একমাত্র অবলম্বনটুকুও কেড়ে নিল। জঙ্গিদের অবিরাম গোলাবর্ষণের শিকার হলেন তার বাবা! অনাথ ভাই-বোনকে ভারতীয় সেনারা উদ্ধার করল ঠিকই, তবে নীলমের কপালে আরও যন্ত্রণা লেখা ছিল। এর কিছুদিন পরেই এক তুষারঝড়ের রাতে তার আট বছরের সন্তানসম ভাইও চিরদিনের জন্য নিখোঁজ হয়ে গেল। জড়মস্তিষ্ক বালক প্রায়ই এদিক-ওদিকে চলে যেত। আবার কয়েকদিন পরে ফিরেও আসত। সেবার আর ফিরল না!

এই গোটা ইতিহাসটাই স্বয়ং নীলম বলেছেন মেজর শেরাওয়াতকে। জীবনের কোনও অধ্যায়ই গোপন রাখেননি তিনি। ওঁদের প্রেম-পর্বের শুরুতেই নিজের সম্পর্কে সব বলে দিয়েছিলেন নীলম।

আজ থেকে দশ বছর আগে সেই পনেরো বছরের উদভ্রান্ত ও ক্লান্ত অনাথা কীভাবে এক বৌদ্ধ শ্রমণের কাছে আশ্রয় পেয়েছিল, মনাস্ট্রিতে তার ধর্মীয় শিক্ষা, স্কুলিং থেকে শুরু করে পরবর্তী উচ্চশিক্ষার ইতিহাস; সবই বলেছিলেন নীলম। শুনতে শুনতে অন্তরে এক গভীর বেদনাবোধ টের পেয়েছিলেন ধীমন্ত। একমুহূর্তের জন্য মনেও হয়েছিল, পৃথিবীতে যুদ্ধ নামক জিনিসটা না থাকলেই বোধহয় ভালো হত! কিন্তু পরক্ষণেই ফিরে গিয়েছিলেন তাঁদের চিরাচরিত আর্মির শিক্ষায়, 'নো অ্যাগোনি, নো পেইন, শ্যাল মেক মি ক্রাইখ'!

একজন প্রফেশনাল যোদ্ধার মনে দুর্বলতার কোনও স্থান নেই! আর যুদ্ধের ক্ষেত্রে কোনও গেমই আনফেয়ার নয়! এমনকি সাধারণ মানুষের অসহায় মৃত্যুও 'পার্ট অফ দ্য গেম'! 'প্যাথেটিক'; কিন্তু 'আনফেয়ার' বলা যায় না। কারণ, 'এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার!'

'মাম্মা, খিদে পেয়েছে।'

শিশুপুত্রের আবদেরে কণ্ঠস্বরে সংবিৎ ফিরল ধীমন্তের। সে কান্না থামিয়ে এখন ব্রেকফাস্টের দাবি করছে। তিনি হাসিমুখে তাকালেন নীলমের দিকে।

'আমাদের বীর ক্যাপ্টেন এখন ব্রেকফাস্টের ওপর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করতে চান। কোই শক?'

মেজরের হাসি ঝলমলে মুখের দিকে তাকিয়ে ইতিবাচক মাথা নাড়লেন নীলম। তারপর ভারী রহস্যময় হাসি হেসে স্বামীর দিকে এগিয়ে দিলেন সদ্য তুলে আনা রেড টিউলিপের গুচ্ছ। মৃদু হেসে বললেন :

'হ্যাপি ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি মেজর শেরাওয়াত! সারপ্রাইজ গিফ্টটা রাতের জন্য তোলা রইল।'

বলতে বলতেই ফের তাকালেন খাদের দিকে। খাদ থেকে তখনও উঠে আসছে ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ। তার ধূসর চোখের মতোই রহস্যময় কুয়াশা ঢেকে রেখেছে সেই মৃত্যুগহ্বরকে!

৩

'লেটস কল আ স্পেড, আ স্পেড!'

কর্নেল মনোজ গুপ্তা হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে সামান্য নেশাজড়ানো কণ্ঠে বললেন, 'আ স্পাই, ইজ আ স্পাই। তার কোনও জাত নেই, নাম নেই, সম্পর্ক নেই। সে শুধু বিশ্বাসঘাতক।'

নীলম তাঁর দিকে কাবাবের প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে হেসে বললেন, 'যে আপনার চোখে বিশ্বাসঘাতক, সে অন্যদের চোখে দেশপ্রেমিকও হতে পারে।'

কর্নেল ঠক করে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন নীলমের দিকে। একটু রুক্ষ কণ্ঠে জানালেন, 'ইউ নো মিসেস শেরাওয়াত, আমার তো কখনও কখনও সন্দেহ হয়, যে আপনি নিজেই স্পাই নন তো?'

ধীমন্ত সজোরে হেসে ওঠেন। তাঁর শিশুপুত্রও কিছু না বুঝেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। কর্নেল গুপ্তা পারলে গোটা দেশের লোককেই স্পাই হিসাবে চিহ্নিত করেন! অত্যন্ত ঠান্ডা মস্তিষ্কের যোদ্ধা মনোজ

প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সন্দিগ্ধহৃদয়। এবং কয়েক পেগ পেটে পড়লে সন্দেহের মাত্রা কিছুটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়।

'ধীমন্ত, মৎ হাসিও বেটা।' কর্নেল গুপ্তা তখনও নীলমের দিকে তাকিয়ে আছেন, 'লুক অ্যাট হার! এরকম সুন্দরী তরুণী তোমার মতো একটা আধবুড়ো লোকের প্রেমে কীভাবে পড়ে? তোমার মতো একটা অপদার্থর সঙ্গে চার বছর সংসারই বা কীজন্য করছে ভাইয়া? কুছ তো গড়বড় হ্যায়!'

ধীমন্ত এবার গর্বের হাসি হাসলেন। সত্যিই তো! নীলম স্নেহে, প্রেমে এবং ভালোবাসায় তাঁর সংসারটাকে স্বর্গ বানিয়ে রেখেছেন। এমনকি দেবশিশুর মতো এক সন্তানের সুখও পেয়েছেন তিনি। জীবনে আর কী চাই? নীলমের জন্যই তিনি আজ সুখী; পরিপূর্ণ! সেজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞও বটে।

নীলম কিন্তু আদৌ কর্নেলের কথায় ব্যথিত হননি। বরং উলটে মুচকি হেসে বললেন, 'থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট।'

কর্নেল গুপ্তা লম্বাটে মুখ করে ফের পানপাত্র তুলে নেন। সঙ্গে কাবাবও। মিসেস রজনী গুপ্তা তাঁর পাশেই বসেছিলেন। স্বামীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'আর্মিতে থেকে তোমরা সবাই মাথামোটা হয়ে গিয়েছ! বছরে তো ক'টা দিন মাত্র ছুটি! তার ওপর আজ আবার ওদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি! এখনও স্পাই, যুদ্ধ, গোলা-গুলি তোমাদের পেছন ছাড়ছে না! ওসব কোস্তা-কুস্তি বর্ডারে গিয়ে কোরো। নাউ, জাস্ট এনজয় দ্য ফুড।'

'ফুড গয়া তেল লেনে!' বৌয়ের ধমক খেয়েও বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হলেন না কর্নেল গুপ্তা। উলটে বললেন, 'তোমাদের কোনও ধারণাই নেই যে বর্ডারে কী হচ্ছে! ডেইলি কিছু না কিছু 'লফড়া' ঘটছেই! কত স্পাইয়ের সঙ্গে আমাদের রোজ লড়তে হয় জানো? ও ব্যাটারা সবসময় ফাঁক খোঁজে। জঙ্গিদের থেকেও মারাত্মক হচ্ছে ওদের গুপ্তচরেরা!'

উপস্থিত বাকি তিনজনই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। এমনকি মেজরের শিশুপুত্রও মুখ তুলে তাকাল। মনোজ এখন কী বলবেন তা ওঁরা প্রত্যেকেই জানেন! আজ পর্যন্ত মেজর শেরাওয়াতের এই বাংলোয় যত অনুষ্ঠান হয়েছে, প্রত্যেকবারই কর্নেল গুপ্তা ও রজনী আমন্ত্রিত হয়েছেন। ধীমন্তের বাবা-মা বহুদিন হল গত হয়েছেন। ভাই-বোনের সঙ্গেও তেমন সম্পর্ক নেই। বন্ধু বলতে এই একজনই। ধীমন্ত ও নীলমের বিয়ে থেকে শুরু করে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া, জন্মদিন পালন, ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি; সবকিছুরই সাক্ষী শুধু এই গুপ্তা পরিবার। আর যতবারই এই চারজন আনন্দোৎসবে মিলিত হয়েছেন, ততবারই এই বিশেষ এক গুপ্তচরের গল্প বাধ্যতামূলকভাবে শুনতে হয়েছে সবাইকে! মিসেস গুপ্তা বিড়বিড় করে বললেন :

'ওঃ গড! মনোজ, নট এগেইন!'

তাঁর বিরক্তিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বহুবার বলা সেই গল্পটাই আবার বলতে শুরু করলেন কর্নেল গুপ্তা! এক বিপজ্জনক গুপ্তচরের কাহিনি!

৪

কার্গিল যুদ্ধের পর প্রায় একবছর পরের ঘটনা।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের সেই ভয়াবহ বাস্তবতা থেকে তখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি ভারতীয় সেনাবাহিনী। কার্গিলের ভয়ংকর ব্লান্ডারটা হজম করতে পারেননি ব্রিগেডিয়ার, লেফটেন্যান্ট জেনারাল এবং সুবেদাররা। তাই সীমান্তরক্ষীদের ওপর কড়া হুকুম ছিল, সবসময়ই সতর্ক থাকতে হবে। কোনও-রকম ঝুঁকি আর নেওয়া যাবে না। তার ওপর থেকে থেকেই 'ক্রস-বর্ডার শেলিঙে'র ফলে প্রায়ই আহত বা নিহত হতে থাকল ভারতীয় জওয়ানরা! আর্মির ওপরওয়ালারা সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে ভারতীয় সেনাদের খবর নিশ্চয়ই কোনও না কোনওভাবে শত্রুপক্ষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। নয়তো এত নিখুঁতভাবে জওয়ানদের গতিবিধি জানতে পারছে কী করে প্রতিপক্ষ! বলাই বাহুল্য, তারপর থেকেই বাচ্চা-বুড়ো নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষকেই সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করল ইন্ডিয়ান আর্মি।

এরমধ্যেই ঘটে গেল আরও একটা মর্মান্তিক ঘটনা। ধীমন্ত ও মনোজের এক সঙ্গী, অভিজিৎ পান্ডে যখন আরও কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে নাইট ডিউটিতে ছিলেন, তখন খুব কাছ থেকেই আচমকা একটা গ্রেনেড তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়ল! অভিজিৎ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মারাত্মক একটা বিস্ফোরণ! মুহূর্তের মধ্যে মানুষটা ধোঁয়া হয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু কিছু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ!

নিজের বন্ধুর এই মর্মান্তিক পরিণতি মেনে নিতে পারেননি ধীমন্ত শেরাওয়াত ও মনোজ গুপ্তা। মনোজ গুপ্তা দাঁতে দাঁত পিষে বলেছিলেন, 'মা কসম, ইস্কা বদলা জরুর লুঙ্গা! আঁখকে বদলে আঁখ! সা-লে!'

ধীমন্ত মুখে কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁর মনোভাবও এমনই ছিল। যোদ্ধারা কখনও শান্তির ধ্বজা তোলে না। তাদের একটাই আপ্তবাক্য। আ টুথ ফর আ টুথ অ্যান্ড অ্যান আই ফর অ্যান আই! আর্মির অবিশ্বাস ও প্রতিহিংসার আগুন এমনিতেই কার্গিলের যুদ্ধের পর কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এবার তাতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। তাদের সন্দেহ এবার বিশ্বাসে পর্যবসিত হল। গুপ্তশত্রু আশেপাশেই আছে এবং কড়া নজর রাখছে! সে যে কেউ হতে পারে, যে কোনও বেশে থাকতে পারে।

ইতিমধ্যেই একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছিল মনোজের। যাকে বলে 'আনক্যানি ফিলিং'। বারবার তাঁর মনে হচ্ছিল, কেউ আড়াল থেকে তাঁদের দেখছে! একজোড়া অনভিপ্রেত চোখের উপস্থিতি মুহুর্মুহু টের পাচ্ছিলেন তিনি। প্রতি পদক্ষেপেই অনুভব করছিলেন যে কেউ তাঁদের লুকিয়ে জরিপ করছে, তাঁদের গতিবিধি মাপছে! শকুনের মতো একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ শিকারি দৃষ্টি প্রতিপক্ষের প্রত্যেকটা চাল গোপনে বুঝে নিচ্ছে! কিন্তু হাতে কোনও প্রমাণ ছিল না।

মনোজ তার এই অনুভূতির কথা কাউকে বলেননি। কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, যার ফল মিলল হাতেনাতেই।

একরাতে প্রহরারত অবস্থাতেই আবার সেই অস্বস্তি তাঁকে ঘিরে ধরল। সীমান্তের হিমেল হাওয়ার কামড়, প্রহরীর সহজাত সতর্কতা, রাত জাগার ক্লান্তিকেও ছাপিয়ে প্রখর হয়ে উঠল সেই অদ্ভুত অনুভব! কেউ দেখছে! কেউ আছে তাঁর আশেপাশে! আছেই!

তিনি বিদ্যুৎবেগে ফিরলেন পেছনদিকে! স্পষ্ট দেখলেন বরফে চাপা পড়া একটা পাথরের পেছনে একটা ছায়ামূর্তি! লুকিয়ে লুকিয়ে নজর রাখছে তাঁর ওপর! স্পাই! শত্রুপক্ষের চর!

'এ-ই! কৌন বে?'

চেঁচিয়ে উঠলেন মনোজ গুপ্তা। তাঁর আশেপাশের রক্ষীরাও ছুটে এল। ছুটে এলেন নাইটডিউটিতে থাকা ধীমন্ত। গুপ্তচরটি পালাবার বিন্দুমাত্রও সুযোগ পায়নি। তার আগেই তাকে ঘিরে ধরে সশস্ত্র সেনাবাহিনী। অনেকগুলো জোরালো টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল তার অবয়ব! ধূসর চাদরে মোড়া একটা মানুষ। মুখ ঢাকা থাকলেও চোখদুটো আলোয় ঝিকিয়ে উঠল।

কিন্তু কী অদ্ভুত সে চাউনি! তার চোখে চোখ পড়তেই রক্তহিম হয়ে গেল ধীমন্তের। এমন চোখ কি কোনও মানুষের হয়? হতে পারে? অসম্ভব কঠিন অথচ বরফের মতো শীতল সে দৃষ্টি! তার কোনও ভাষা নেই। এক অদ্ভুত ঔদ্ধত্যে মানুষটা তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। কোনও ভয় নেই তার!

'সা-লা সুয়ার কি ঔ-লা-দ! হা-রা-ম-জা-দা!'

হাতের বেয়নেটটার বাঁট তার মুখে ঘুরিয়ে সপাটে মারলেন মনোজ। লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সজোর আঘাতে তার নাক বেয়ে গলগলিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। সাদা বরফের ওপরে যেন কেউ বিছিয়ে দিল লাল কার্পেট!

কিন্তু আশ্চর্য! তারপরেও লোকটা একটুও ভয় পেল না। যন্ত্রণাসূচক একটা শব্দও বেরোল না তার মুখ থেকে। বরং সে ফিরে তাকাল ওদের দিকে। চোখে সেই বরফশীতল দৃষ্টি। অদ্ভুত এক বেপরোয়া ভাব। মনোজের মনে হল, লোকটা মনে মনে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে, আর বলছে, 'যা খুশি কর! পরোয়া করি না!'

'তেরি তোখ!'

বেয়নেটটা তাক করে গুপ্তচরের দিকে মার মার করে তেড়ে গেলেন মনোজ। কিন্তু লোকটার চোখের পলকও পড়ল না। সাপের মতো ভীষণ শীতলতা নিয়ে তাকিয়ে আছে সে। কোনও বিকার নেই!

ধীমন্ত মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, লোকটার কলজে আছে! চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে সশস্ত্র ভারতীয় সেনা। সামনে উদ্যত বেয়নেটের ফলা। তা সত্ত্বেও সে একটুও ভয় পাচ্ছে না! একটুও না! অমন অনমনীয় শত্রুর সামনে থমকে গেলেন মনোজ গুপ্তাও। খণ্ডমুহূর্তের জন্য হয়তো বা বিচলিতও হলেন। উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুকে কুপিয়ে মারা। কিন্তু প্রতিপক্ষের তেজ দেখে পরিকল্পনা পাল্টালেন তিনি। বেয়নেটটাকে তার বুকে ঠেকিয়ে বললেন, 'কে তুই? কোথা থেকে এসেছিস?'

লোকটা তার দিকে সাপের দৃষ্টিতে তাকাল। তার মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তবুও একটি কথাও বলল না। বরং নিঃশব্দে হাসল! শয়তানের হাসি! ইঙ্গিত স্পষ্ট; মেরে ফেললেও সে মুখ খুলবে না!

'এভাবে হবে না! টর্চার না করলে এ সা-লা চুতিয়া কিচ্ছু বলবে না। চ-ল!'

লোকটার কামিজ ধরে তাকে টেনে তুললেন মনোজ গুপ্তা। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন বাঙ্কারের দিকে। তাঁর পেছন পেছন ধীমন্ত সহ বাকি সঙ্গীরাও।

এরপরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু ভয়াবহ! সারা রাত লোকটার ওপর অত্যাচার করে গেল সেনাবাহিনী। তাদের বুঝতে বাকি ছিল না যে এই শত্রুপক্ষের খবরের দৌলতেই বারবার জওয়ানদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে! এই লোকটার জন্যই আজ অভিজিৎ পান্ডে বিস্ফোরণের শিকার! এই শয়তানদের জন্যই প্রত্যেকবার ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হয় দেশের মাটি! কিন্তু ও একা নয়। নির্ঘাৎ ওর পেছনে পুরো একটা গোষ্ঠীই রয়েছে। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত জওয়ানরা ভীষণ আক্রোশে পেটাতে শুরু করল তাকে। মারতে মারতে বোধহয় দেহের সব হাড়ই গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল। আর লাগাতার প্রশ্ন করে গেল, 'আর কে আছে তোর সঙ্গে? কে পাঠিয়েছে তোকে?...কাদের হয়ে কাজ করিস তুই?...তোর বাকি সঙ্গীরা কোথায়?...ব-ল!'

কিন্তু কোনও প্রশ্নেরই কোনও উত্তর নেই! জওয়ানরা মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে গেল। হাঁফিয়ে গেলেন স্বয়ং মনোজ গুপ্তাও। মারের চোটে লোকটার কপাল, মুখ ফেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে! সারা গায়ে কালশিটে! উঠে বসার শক্তিটুকুও নেই। তার শ্বাস টানার শব্দেই স্পষ্ট যে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তারপরও—!

লোকটা হাসল! হয় সে উন্মাদের হাসি; নয়তো পিশাচের! তার বরফকঠিন দৃষ্টি মুখর হয়ে বলে দিল, 'যত টর্চার করার করে নাও সা-লোঁ! কিন্তু একটা শব্দও করব না!'

'আচ্ছা? এত হিম্মৎ! হ-ড়া-মি!'

মনোজ গুপ্তার মাথায় তখন রক্ত চড়ে গেছে। তিনি হিংসাকুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে! এদের জন্যই শত্রুপক্ষ আক্রমণ করার সাহস পায়! এদের জন্যই অভিজিৎ মর্মান্তিকভাবে শেষ হয়ে গিয়েছেন! ক্ষমা নেই! কোনও ক্ষমা নেই!

'ধীমন্ত।' তিনি ধীমন্তের দিকে ফিরলেন, 'নমক, মির্চি আর ছুরি নিয়ে এসো তো। আমিও আজ এর শেষ দেখে ছাড়ব!'

সত্যিই শেষ অবধি দেখেছিল আর্মি! নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল তাদের অত্যাচার। ধীমন্ত আর মনোজ লোকটির এক একটি নখ ধরে ধরে গোড়া সুদ্ধু উপড়ে ফেললেন! তবু সে টুঁ শব্দটিও করল না। তার দেহ চিরে চিরে নুন আর লঙ্কাগুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়া হল! আর্মিবুটের নিষ্ঠুর আঘাতে তার দেহে কালশিটে পড়ল। কিন্তু তারপরও লোকটার কোনও বিকার নেই! সে গুম হয়ে আছে, রক্তক্ষরণে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কষ্টে চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলও পড়ছে। তবু একটি শব্দও উচ্চারণ করছে না! এমনকি একটি কাতরোক্তিও নয়! মনোজ আর ধীমন্ত সবিস্ময়ে দেখলেন, আর্মির অত্যাচারেরও সীমা আছে; কিন্তু এই মানুষটির নৈঃশব্দ্যের বোধহয় কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। বরং এখনও সে হাসছে! একটি গুপ্তচরের কাছে হেরে যাচ্ছে ভারতীয় সেনা! এ কী ধরনের মানুষ!

মনোজের চোখে রক্ত জমল, 'ফাইন! হি ইজ ইউজলেস! যখন ও কিছু বলবেই না; তখন ওকে আর বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই! ওর সেই হালই করব, যা একজন স্পাইয়ের হওয়া উচিত!'

তখনও সীমান্তে সূর্যোদয় হয়নি। সবে অন্ধকার একটু একটু করে ফ্যাকাশে হচ্ছে। তার মধ্যেই টেনে-হিঁচড়ে রক্তাক্ত মানুষটিকে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যভূমিতে। শেষবারের মতো ধীমন্ত জানতে চাইলেন, 'কিছু বলবি?'

উত্তরে সেই আদি ও অকৃত্রিম একরাশ নীরবতা! সেই নির্ভীক, বেপরোয়া চাউনি। সেনারা আর অপেক্ষা করল না!

একমুহূর্ত স্তব্ধতা! পরক্ষণেই সীমান্তের নৈঃশব্দ্য খান খান করে গর্জন করে উঠল একাধিক এ কে ফর্টিসেভেন!

৫

গল্পটা একনিঃশ্বাসে শেষ করে ফের পানীয়ের গ্লাস তুলে নিলেন মনোজ গুপ্তা। হতাশভাবে বললেন, 'আমরা শালাকে কুত্তার মতো গুলি করে মেরেছিলাম! কিন্তু একটাই আফসোস রয়ে গেল! লোকটাকে কিছুতেই ভাঙতে পারিনি আমরা। শালা হারামখোর মরে গেল, অথচ একটা কথাও বলল না! এটা আমাদের পরাজয়।'

ধীমন্ত যোগ করলেন, 'যখন ওকে গুলি করে মারা হচ্ছিল তখন ওর চোখ দেখেছি আমি! সেম এক্সপ্রেশন! ভয় নেই, দুঃখ নেই, কান্না নেই! ইনফ্যাক্ট কিচ্ছু নেই! রাইফেলের সামনে দাঁড়িয়েও ও হাসছিল!'

'ড্যাম ইট!' চূড়ান্ত ফ্রাস্ট্রেশনে মদের গ্লাসটা টেবিলের ওপর সশব্দে রাখলেন কর্নেল গুপ্তা, 'সেই হাসিটা আজও আমি ভুলিনি। আজও সেই হাসিটা আমায় মক করে! হন্ট করে!'

নীলম এতক্ষণ মুখ নীচু করে গোটা ঘটনাটা শুনছিলেন। এবার মুখ তুলে ঠান্ডাভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কর্নেল গুপ্তা, বহুবার আপনি এই ঘটনাটা বলেছেন। কিন্তু একটা তথ্য দিতে বোধহয় ভুলে গিয়েছেন!'

কর্নেল গুপ্তা একটু অতিরিক্তই মদ্যপান করে ফেলেছিলেন। নেশাজড়িত ভঙ্গিতে বললেন, 'কোন তথ্য?'

তিরবেগে প্রশ্ন এল, 'সেই স্পাই তথা 'লোকটা'র বয়েস কত ছিল?'

'আ স্পাই ইজ আ স্পাই!' তিনি একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, 'তার আবার বয়েস কী?'

নীলম শেরাওয়াত একটু থেমে বললেন, 'তার বয়েস বোধহয় আট বছর ছিল। তাই না? 'লোক' নয়, আট বছরের বাচ্চা ছেলে ছিল! নো?'

ধীমন্তের মাথায় যেন বাজ পড়ল! তড়িদাহতের মতো কেঁপে উঠলেন তিনি।

'নীলম! তুমি—!'

কিন্তু মেজরকে বাক্যটা শেষ করতে না দিয়েই নীলম আপনমনেই বলতে থাকলেন, 'সে আপনাদের কোনও কথার জবাব দেয়নি কারণ সে কথা বলতে পারত না! আপনাদের কোনও হুমকিই তার কানে যায়নি; কারণ সে কানে শুনতে পেত না! সে আপনাদের শত অত্যাচারেও টুঁ

শব্দটিও করেনি, কারণ ঈশ্বর তার মুখে প্রয়োজনীয় ভাষাটুকুও দেননি! এমনকি যন্ত্রণাপ্রকাশের অভিব্যক্তিও তার ছিল না! যে দৃষ্টিকে আপনারা শয়তানের দৃষ্টি ভেবেছিলেন, আসলে তা একজন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ভাষাহীন দৃষ্টি ছিল! সে বেচারি তো এটুকুও ঠিকমতো বোঝেনি যে তাকে নিয়ে ঠিক কী করা হচ্ছে! যে হাসিকে আপনারা ব্যঙ্গাত্মক ভাবছেন, আসলে তা হাসি নয়; এক অসহায় মানুষের কান্না, যার ভাষা বোঝার ক্ষমতা একমাত্র তার দিদিরই ছিল। সে কোনও স্পাই ছিল না!'

কর্নেল গুপ্তা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। ধীমন্ত বাক্শক্তিরহিত!

'প্রথমে ঘটনাটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু কর্নেলের মুখে বারবার শুনতে শুনতে আমি মর্মান্তিক সত্যিটা উপলব্ধি করেছি।' নীলমের চোখদুটি রক্তাভ হয়ে উঠেছে, 'সেই ধূসর রঙের চাদর পরেই সে নিখোঁজ হয়েছিল। সেই ভাষাহীন শীতল দৃষ্টি একমাত্র তারই ছিল! সেই অদ্ভুত বোকাটে হাসির মতো কান্না, সেই নীরবতা; সব কিছু মিলে গেল! আমি ভেবেছিলাম, হয়তো তুষারঝড়ের মধ্যেই সে ভুল করে বর্ডার ক্রস করে চলে গিয়েছে। হয়তো তাকে শত্রুরা মেরে ফেলেছে! কিন্তু আমি ভুল ভেবেছিলাম!'

প্রচণ্ড একটা কান্না এসে তার কণ্ঠরোধ করে দিল। অনেক কষ্টে অদম্য কান্নার বেগ সামলে নিয়েছেন নীলম। একটা গভীর শ্বাস টেনে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে ফের বললেন, 'বেশ কিছুদিন আগেই আমি আসল ঘটনাটা বুঝতে পেরেছি। শুধু অপেক্ষায় ছিলাম, এই গল্পটা আপনি আবার কবে বলবেন—!'

বলতে বলতেই স্তম্ভিত, বিহ্বল ধীমন্তের দিকে তাকালেন তিনি, 'কর্নেল গুপ্তা বা গোটা আর্মিকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার আমার নেই মেজর শেরাওয়াত। কিন্তু তোমার অন্তত একটা শাস্তি প্রাপ্য! সেই দিদি, যে তার একমাত্র ভাইকে মায়ের মতো বুকে করে আগলে রেখেছিল; সে তোমাকে শুধুমাত্র একটাই শাস্তি দিতে পারে। তোমাকে আমি সব সুখ দিয়েছি। এবার আমার যন্ত্রণাটাও নাও।'

ধীমন্ত কিছু বোঝার আগেই বিদ্যুৎবেগে তিনি প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে কোলে তুলে নিলেন তিন বছরের শিশুপুত্রকে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ধীমন্তের মনে হল, এই হাসি অবিকল সেই আট বছরের 'স্পাইয়ের' হাসির মতো! হাসি নয়, কান্না!

'সরি ধীমন্ত, এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার।'

কথাটা ছুড়ে দিয়েই তিরবেগে তিনি ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। পাগলের মতো তাঁর পিছন পিছন ছুটলেন ধীমন্ত! মেজর গুপ্তাও দৌড়লেন তাঁর পেছনে। রজনী স্থবির, মূক হয়ে বসে আছেন। তখনও হয়তো গোটা ব্যাপারটা উপলব্ধি করে উঠতে পারেননি।

মদ্যপানের শিথিলতার দরুন দুজন পুরুষের পায়ের পেশি সঙ্গ দিচ্ছিল না। জোরে দৌড়তে দৌড়তেই আচমকা মুখ থুবড়ে পড়লেন ধীমন্ত শেরাওয়াত! ভয়ার্ত, বিহ্বল চোখে দেখলেন, নীলম টিউলিপের বাগানকে দলিত মথিত করে দিয়ে সোজা এগিয়ে যাচ্ছেন খাদের দিকে! সেই ভয়ংকর খাদ! নীলমের কোলে তাঁর আত্মজ! তাঁর একমাত্র শিশুপুত্র!

সামনে খাদ!

৬

২রা এপ্রিল, ২০১৯

খাদের শূন্য বুক থেকে হু হু করে ঠান্ডা হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষটার গায়ে! অন্ধকারের মধ্যেই সে উচ্চারণ করল, 'এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার!...এভরিথিং ইজ ফেয়ার—?'

শেষ বাক্যটার শেষে যেন এক অন্তহীন জিজ্ঞাসা! খাদ নিরুত্তর! সে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেয় না! যেন নির্বাক এক দর্শকমাত্র। শুধু দু-হাত বাড়িয়ে রোজই অপেক্ষা করে এই প্রশ্নকর্তাকে বুকে টেনে নেওয়ার জন্য! প্রতিরাতে সে উন্মুখ হয়ে থাকে এই মানুষটির জন্য!

হয়তো সেটাই তার একমাত্র উত্তর!

—

খুনির আঙুল

১

'চুষুন দাদা, চুষুন। যত চুষবেন তত রস। যত খাবেন তত মিষ্টি। একবারটি খেয়ে দেখুন দাদা। মনে হবে প্রাণ ঠান্ডা হচ্ছে। স্বর্গসুখ পাচ্ছেন...।'

না, তেমন বিশেষ কিছু নয়। লেবুলজেন্স! প্রতিটা লোক্যাল ট্রেনেই লাল, কমলা, হলুদ কিংবা কালো রঙের লজেন্সের বয়ম হাতে এই লেবুলজেন্সের হকারদের দেখতে পাওয়া যায়। ওদের পেশা একই। পার্থক্য শুধু বক্তৃতায়। কতরকম সুরে, কতরকম অদ্ভুত টোনে, বিচিত্র ভাষার আবেদনে ট্রেনের যাত্রীদের চমকে দেয় ওরা। যে যত চমকাতে পারবে, যাত্রীদের মনোরঞ্জন করতে পারবে, তার তত বিক্রি।

'চুষুন দাদা, চুষুন। খেয়ে দেখুন দাদা। মুখে একেবারে মাখনের মতো গলে যাবে। একবারটি শুধু খেয়ে দেখুন...!'

ওপ্রান্ত থেকে হঠাৎ ভেসে এল গম্ভীর স্বর, 'খেলেই ম-রে যা-বে-এ-এ। চুষলেই ম-রে যা-বে-এ-এ-এ!'

বিপুলবাবু সবে একটা লেবুলজেন্সের প্যাকেট খুলে মুখে দিতে যাচ্ছিলেন। আচমকাই যেন অমোঘ দৈববাণীর মতো কানে এসে ঢুকল একটা আর্তচিৎকার!

'খে-লে-ই মরবে-এ-এ! চুষলেই মরবে-এ-এ!'

বিপুলবাবুর হাত কেঁপে গেল! আচমকা এই ডায়লগ শুনে হতভম্ব হয়ে গেছেন! হাতের কমলা রঙের লেবুলজেন্স পপাত ধরণীতলে! চশমার পিছনের বিস্মিত ভয়ার্ত চোখদুটো শব্দের উৎস খুঁজতেই যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পাশে বসা তরুণ সহযাত্রীটি হেসে ফেলে জানায়, 'ইঁদুর, আরশোলার বিষ।'

তাই তো। রোজই তো এই শব্দগুলোই শুনে চলেছেন লোক্যাল ট্রেনে। এ প্রান্তে লেবু-লজেন্স। ও প্রান্তে ইঁদুর-আরশোলা মারার বিষ। একটু পরেই আসবে ইমিটেশনের গয়না এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার চূরণ! তারপর বাত-বেদনার তেল। এ তো রোজই হয়ে চলেছে! নিজের নির্বুদ্ধিতায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে লেবুলজেন্স মুখে পুরে ফেলেছেন তিনি। ইঁদুর-আরশোলার বিষের হকারটি কয়েক মুহূর্তের জন্য ইতিউতি তাকিয়ে ফের হাঁকডাক শুরু করে, 'খেলেই মরবে-এ-এ-এ! চুষলেই মরবে-এ-এ!'

বিপুলবাবু একটি সরকারি স্কুলের কেমিস্ট্রি টিচার। নামে বিপুল হলে কী হবে! আগাপাশতলা ক্ষীণকায় মানুষটি যখন রাস্তা দিয়ে ছাতা মাথায় হাঁটেন, তখন মনে হয়, কোথাও কিছু নেই—শুধু একটা পেল্লায় ছাতা রাস্তা দিয়ে গড়গড়িয়ে চলে যাচ্ছে! নাকের ওপর একখানা প্যাঁচা মার্কা

আদ্যিকালের গোলগোল ফ্রেমের চশমা না থাকলে ভদ্রলোককে হয়তো দেখাই যেত না! সবসময়ই একটা কুণ্ঠিত ভাব। যেন অজান্তেই কোনও অপরাধ করে ফেলেছেন। এ জাতীয় ভীতু ভীতু প্রকৃতির মানুষের জীবনে বিড়ম্বনাদেবী সবসময়ই দক্ষিণহস্ত উপুড় করে রাখেন! চন্দননগর থেকে কলকাতায় ডেইলি প্যাসেঞ্জারি সেই বিড়ম্বনাগুলোর মধ্যে একটা। রোজ সাতসকালে দু-মুঠো ফেনাভাত আর ডিম-আলুসেদ্ধ নমো নমো করে পেটে দিয়েই দৌড়তে হয়! তার মধ্যেও আবার বিড়ম্বনা! এই বিড়ম্বনার নাম কোষ্ঠকাঠিন্য! এই তাড়ার মধ্যে কোথায় সুবোধছেলের মতো সহজবোধ্য হয়ে বর্জ্যপদার্থ সহজে নিষ্কাশিত হবে, তা নয়! বরং তার মেজাজমর্জি বোঝাই দায়! কখন যে তিনি দয়া করে দেখা দেবেন তা বোঝা অসম্ভব! ফলস্বরূপ বোতল-বোতল জল ও সিগারেট সেবনের পিছনে সময় যায়! এবং অবধারিত ভাবে ট্রেন মিস! স্কুলের হাজিরাখাতায় তাঁর নামের পাশে লালদাগ! এবং যথারীতি আরেক ভয়ংকর বিড়ম্বনার আগমন! রাশভারী হেডমিস্ট্রেসের মিছরির ছুরির মতো তীক্ষ্ণ কথা!

বিড়ম্বনার গল্প এখানেই শেষ নয়। অসম্ভব নিরীহ, শান্তস্বভাবের দরুন দুষ্টু ছাত্রছাত্রীরা সহজে বাগ মানতে চায় না! বিপুল রঞ্জন আচার্য; তথা বি আর এ, নামটির ইনিশিয়াল নিয়েও তাঁর বিপত্তি! এই গোটা পিতৃপ্রদত্ত নামটি এখন ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে সংক্ষিপ্তসারে 'ব্রা' হয়ে দাঁড়িয়েছে! এমনকি সহকর্মীরাও নাকি পিছনে তাঁকে 'ব্রা' বলেই ডাকেন। সেদিন স্বয়ং হেডমিস্ট্রেসও অন্যমনস্ক হয়ে দুম করে মুখ ফসকে বলে ফেললেন, 'একটু ব্রাকে ডেকে দাও তো!'

'আজ্ঞে?' পিওন থতমত! হেডমিস্ট্রেস অপ্রস্তুত। কোনওমতে বললেন, 'ওই যে বি আর এ...মানে বিপুলবাবুকে ডেকে দাও।'

হেডমিস্ট্রেস মুখ লুকোনোর জায়গা পাচ্ছেন না! পিওন গম্ভীর মুখে বাইরে এল! তারপর তার কী দমফাটা হাসি! যেন 'ব্রা' যে বিপুলও হতে পারে, তা স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবেনি।

ভাবতে ভাবতেই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বিপুল। আজকাল আর এসব ছোটখাটো জিনিস মনে দাগ কাটে না। এর থেকেও বড় বিড়ম্বনা তাঁর বাড়িতে বসে আছে। একমাত্র মেয়ে সোমদত্তা। বিয়ের বয়েস হয়েছে। তার জন্য তিনি নিজেও চিন্তিত কম না। রীতিমতো পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্র খুঁজছেন। কিন্তু মেয়ে বেঁকে বসে আছে। সে এখনই বিয়ে করতে চায় না। বিয়ে না করতে চাইলেও প্রেমে অরুচি নেই। রোজই এর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে, ওর সঙ্গে ডিনার খাচ্ছে! প্রতিবেশীরাও মেয়ের চরিত্র নিয়ে ফিসফিস করে। তবু বিপুলবাবু মুখ ফুটে তাকে শাসন করতে পারেন না! হাজার হোক, মা-মরা মেয়ে! এক বছরও হয়নি মাকে হারিয়েছে। এখনও সে শক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে আজও কেঁদে ফেলে মেয়েটা! এই পরিস্থিতিতে তাকে কড়া কথা বলেন কী করে!

'অলখ নি-র-ঞ্জ-ন!'

বাজখাঁই কণ্ঠস্বরে চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল তাঁর! রোজই এই সময়ে এক সাধুবাবার আগমন ঘটে! গায়ে লাল রঙের গেরুয়া! ইয়াব্বড় এক জটা! দেখলেই মনে হয়, না জানি কত পশুপাখি ওর মধ্যে ঢুকে

বসে আছে। অগোছালো দাড়ির জ্বালায় আসল মুখ বোঝা দায়। হাতে একটা চিমটে, অন্যহাতে কমণ্ডলু! রোজই এই কম্পার্টমেন্টে এসে বসেন। অবিশ্বাসীদের সঙ্গে তর্ক করেন না! বিশ্বাসীদের হাত দেখে দেন। সমস্যা থাকলে সমাধানের উপায়ও বলে দেন। উল্টোদিকের সিটে বসে থাকা রঞ্জনবাবু এই সাধুবাবাকে দিয়ে কী যেন একটা যজ্ঞ-টজ্ঞও করিয়েছেন।

'ক্যায়া হাল হ্যায় বেটা?' কথা নেই বার্তা নেই বাবাজি আজ একেবারে বিপুলের ঘাড়ে এসে পড়েছেন! যেন কতদিনের পরমাত্মীয়!

বিরক্ত হয়ে বিপুলবাবু উত্তর দিলেন না। তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল। লোকটার দাড়িগুলো হাওয়ায় উড়ছে। মাঝেমধ্যে বিনা অনুমতিতে বিপুলের নাকের ওপর ঝাপটাও মারছে! তার ওপর বাবাজির গায়ের বিটকেল গন্ধ! নস্যি আর গাঁজার সম্মিলিত সৌরভ! লোকটা হাত চুলকাতে চুলকাতে বিপুলবাবুর হাতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখছে। তিনি সভয়ে তাকান। সর্বনাশ, লোকটার চর্মরোগ আছে না কি? এসব বিষয়ে বিপুলবাবু আবার ভীষণ সাবধানি। রোজ ডেটল সাবান দিয়ে বার তিনেক স্নান করেন।

'ইয়ে ক্যায়া! ক্যায়া হ্যায় ইয়ে?'

তিনি বাবাজির থেকে যথাসম্ভব ছোঁয়াচ সামলে বসছিলেন! বাবা তাঁর বুড়ো আঙুলের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ! তারপরই বিদ্যুৎগতিতে তাঁর হাত চেপে ধরেছেন। তাঁর দৃষ্টি বুড়ো আঙুলের দিকে নিবদ্ধ! ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন, 'ইয়ে ক্যায়া হ্যায়! ইতনা বড়া অঙ্গুঠা! সত্যনাশ! সত্যনাশ!'

বিপুলবাবু কী বলবেন ভেবে পেলেন না! ছোটবেলা থেকেই ওঁর বুড়ো আঙুলটা অস্বাভাবিক স্ফীত। লোকে ক্ষেপাত, 'বুড়ো আঙুল ফুলে কলাগাছ!' কিন্তু তার জন্য কখনই কোনও ক্ষোভ ছিল না! কারণ বুড়ো আঙুলের স্ফীতিটা তার নিজের হাতে নেই। ওটা ঈশ্বরের বদমায়েশি বা অনিচ্ছাকৃত ভুল! এই 'বুড়ো আঙুল' নিয়েই তো এতবছর পার করে এলেন। এখন হঠাৎ নতুন করে 'সত্যনাশে'র কী হল!

'সত্যনাশ! ইতনা বড়া অঙ্গুঠা!' বাবাজি ওঁর দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে বলেন, 'তু তো খুনি বনেগা রে! জরুর খুনি বনেগা! তেরে হাথ মে খুন লিখা হ্যায়!'

মাথায় বাজ পড়লেও বোধহয় এত বিস্মিত হতেন না বিপুলবাবু! তিনি হতভম্ব হয়ে বাবাজির দিকে তাকিয়ে আছেন। কোনও কথা মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না! গোটা কম্পার্টমেন্টের শোরগোল যেন সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে মুহূর্তে থমকে যায়। সবাই কৌতূহলী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দেখছে এদিকে! কোনওমতে ঢোঁক গিলে স্খলিত স্বরে বিপুলবাবু বললেন, 'আ-মি! খু-ন!'

ঠিক তখনই উদ্যত ছুরি হাতে একটা লোক এগিয়ে এল তাঁর দিকে। যেন এখনই ঘ্যাচাং করে কেটে দেবে তাঁর গলার নলি! রাগতস্বরে বলল, 'দেব নাকি ছাল ছাড়িয়ে?'

'অ্যাঁ!' প্রচণ্ড ভয়ে আঁতকে উঠলেন তিনি। অবশ্য ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না! লোকটা নেহাতই একজন শশাওয়ালা!

২

‘কিরো-বেনসন থাম্ব থিওরির নাম শুনেছেন?’

অঙ্কের টিচার গিরীশ গুপ্ত ভুরু কুঁচকে তাকালেন বিপুলবাবুর দিকে, ‘এসব জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন কখনও?’

বিপুলবাবু অসহায় ভাবে মাথা নাড়েন, ‘নাঃ।’

‘তাহলে এখন খামোখা ঘামাচ্ছেন কেন?’ তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে টান মারলেন, ‘কেমিস্ট্রির লোক কেমিস্ট্রি নিয়েই থাকুন না। খামোখা জ্যোতিষের রাজ্যে ঢুকছেন কেন?’

বিপুলবাবু বিরক্ত হলেন। ঢুকছেন কি সাধে? কেমিস্ট্রি নিয়েই তো খুশি ছিলেন! কিন্তু জ্যোতিষ নিজেই এখন তাঁর রাজ্যে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে। বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী রাজ্যের সীমানার বাইরে যে সে আর থাকতে চাইছে না!

‘শুনুন, সহজ করে বুঝিয়ে বলি।’ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন গিরীশ, ‘কিরো-বেনসন থাম্ব থিওরি অনুযায়ী যে কোনও মানুষের চরিত্র তার বুড়ো আঙুল দেখে বোঝা যায়। বুড়ো আঙুল দেখে বলা যায় ওই আঙুলের মালিক শিল্পী, না কসাই।’

বিপুলের মুখ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। তবে কি তিনি কসাইয়ের দলে পড়লেন!

‘আপনার বুড়ো আঙুল একটু প্রয়োজনের বেশিই মোটা, গোদা আঙুল।’ গিরীশ হাসছেন, ‘থিওরি অনুযায়ী আপনার মধ্যে খুনের প্রবণতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে আপনাকে গ্যাংস্টার হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই! রকেট লঞ্চার, মিসাইল বা গ্রেনেড তো দূর, আপনি একটা নিরীহ মশা-মাছি মারার ব্যাট নিয়ে বেরিয়েছেন ভাবলেই...!’ কথাটা শেষ না করেই ফিচিক করে হেসে ফেললেন ভদ্রলোক। দৃশ্যটা কল্পনা করে পিছন পিছন একটা অট্টহাসিও আসছিল। কিন্তু অঙ্কের বইটার ওপর উপুড় হয়ে কোনওমতে সামলে নেন।

বিপুল দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। এই প্রতিক্রিয়া এই প্রথম দেখছেন না! তাঁর ঘনিষ্ঠতম ও বয়সে কনিষ্ঠতম কলিগ কাম বন্ধু জয়দীপকেও গোটা ঘটনাটা জানিয়েছেন। সে তো প্রথমেই কিছুক্ষণ ‘খ্যাঁ খ্যাঁ খোঁ খোঁ’ করে হেসে গড়াগড়ি দিল। সে হাসি আর থামেই না! কোনওমতে নিজেকে সামলাতে সামলাতে বলল, ‘অ্যাঁ? কী খুন করেছেন আপনি? মশা, মাছি? না ইঁদুর-বাদুড়?’

অদ্ভুত একটা রাগ নিজের মধ্যে টের পেলেন বিপুল! ট্রেনের লোকটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল! এই এক সপ্তাহে তাঁর মধ্যে কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। না, ঠিক পরিবর্তন নয়। হয়তো এই স্বভাব বা অভ্যাসগুলো তাঁর আগেই ছিল। কোনওদিন বিশেষ করে খেয়াল করেননি। কিন্তু এখন টের পাচ্ছেন! যেমন মাঝেমধ্যেই তাঁর ভেতরে একটা অদ্ভুত রাগ দাপাদাপি শুরু করে। রাগটা হয়তো আগেও ছিল। তবে এমন নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়নি কখনও। তিনি চাপা গলায় হিসহিস করে ধমকে উঠলেন, ‘জয়দীপ, আমি ফাজলামি করছি না!’

জয়দীপ একটু থমকে গিয়েছিল। তারপর স্বভাবসিদ্ধ হাল্কা ভঙ্গিতে বলে, ‘তা গুরুদেব যখন সমস্যাটা বলেছেন, তখন সমস্যা নিরসনেরও নিদান দিয়েছেন নিশ্চয়ই।’

‘হ্যাঁ।’ তিনি জানালেন, ‘একটা হোম-যজ্ঞ করা দরকার! বলেছেন, হাজার পাঁচেক টাকা লাগবে। তাহলেই সব দোষ কেটে যাবে।’

‘ইয়েহি তো মার খা গয়া ইন্ডিয়া!’ জয়দীপ টেবিলে চাপড় মারল, ‘ওটাই হচ্ছে আসল কথা। বিপুলদা, আপনি এই সব ভণ্ড, প্রতারকদের কথা বিশ্বাস করেন? কিস্যু না! স্রেফ আপনাকে মুরগি করে কিছু টাকা খসানোর ধান্দা! ছাড়ুন তো! যত্তসব।’

সে ‘ছাড়ুন তো’ বলে গেল বটে; কিন্তু বিপুল ছাড়তে পারেননি। এই সাতদিনে পাল্টেছে অনেক কিছু! আচমকাই আবিষ্কার করেছেন, তাঁর খুন-জখমের ঘটনা দেখতে বেশি ভালো লাগে! ডেইলি সোপ তিনি কখনই দেখেন না। কিন্তু ভূতের সিনেমা, হলিউড অ্যাকশন ফিল্ম, খুনোখুনি, ক্রাইম-থ্রিলার দেখতে বসলে নাওয়া-খাওয়ার হুঁশ থাকে না! এ অভ্যেস আজকের নয়। বহুদিন এ নিয়ে করুণা আর মেয়ে সোমদত্তার অভিযোগ শুনতে হয়েছে তাঁকে। বিরক্ত হয়ে সোমদত্তা বলত, ‘কী যে দেখ ছাইপাঁশ! একটা লোক মুখোশ পরে রামদা হাতে একটার পর একটা লোককে মেরে কেটে চলেছে! অথবা দুটো ডাইনোসোর একটা লোককে দু-টুকরো করে ছিঁড়ে খাচ্ছে! এসব কি দেখার জিনিস হল! খালি রক্ত...আর রক্ত!’

সেসব কথায় কোনওদিন পাত্তা দেননি তিনি। বরং উলটে আরও ডুবে গেছেন সিনেমার পর্দায়। কিন্তু আচমকা সেদিন একটা ইংরেজি থ্রিলার দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল, ‘কী দেখছি আমি! কেন দেখছি!’ বিপন্ন বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন; তাঁর খুন-জখম, বীভৎস রস দেখতে ভালো লাগে!

খুন-জখম দেখতে ভালো লাগা মোটেই দোষের কথা নয়। ইন্ডিয়ান পিনাল কোড অনুযায়ী কোনও অপরাধ তো নয়ই! কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপুল একটা অজানা ভয়ে, অযৌক্তিক অপরাধবোধে সিঁটিয়ে গেলেন। ঠিক করেছেন, এখন থেকে আর খুন-জখম নয়। রোজ রাতে ধর্মীয় কিংবা কার্টুন চ্যানেলগুলো দেখবেন। সন্তোষী মাতা, সাঁইবাবার ওপর আধারিত ফিল্ম ছাড়া আর কিছু নয়! মাঝখানে কয়েকদিন মহাভারত দেখেছিলেন। কিন্তু যেই না কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, অমনি দুম করে পালটে গেল চ্যানেল! না, যুদ্ধ নয়! কিছুতেই নয়! মহাভারত মাথায় থাক, বরং বেঁচে থাকুক পোগো, হাঙ্গামা চ্যানেল।

শুধু চ্যানেল নয়, সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেল মেনুও। সপ্তাহে তিনবার মাংস না খেলে চলত না তাঁর। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাংসওয়ালাকে নির্দেশ দিয়ে পছন্দমতন পিস বেছে নিতেন। বাকিরা বাজারের ব্যাগ রেখে সবজিবাজারের দিকে হাঁটা দেয়। কিন্তু তিনি ওখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। মাংসওয়ালার বিরক্তিকে উপেক্ষা করে রীতিমতো সরেজমিনে তদন্ত করে মাংসের টুকরো নিজের হাতে বেছে নেন। সেদিনও নিচ্ছিলেন। কসাইয়ের হাতে জীবন্ত ছালছাড়ানো মুরগি ছটফট করছে। একদম সামনে দাঁড়িয়ে বিপুল তাকে নির্দেশ দিয়ে চলেছেন, ‘আমার গোটা ঠ্যাংটাই চাই কিন্তু। একদম দু-টুকরো করবে না! আর মেটেটা অবশ্যই দেবে...!’

পিছন থেকে পাঁশুটে ইঁদুরের মতো একটা ভীত মুখ মাঝেমধ্যেই উঁকিঝুঁকি মারছিল। আচমকা খুনখুনে স্বরে বলল, 'ওঃ মশাই! কী করে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন? মুরগিগুলোর এই প্রাণান্তকর ঝটপটানি চোখে দেখা যায় না! বীভৎস! জীবনে এই প্রথমবার নিজে মাংস কিনতে এসেছি! নেহাত চাকরটা ছুটি নিয়েছে। আর ছেলে-মেয়ে-গিন্নির রবিবার মাংস না হলে চলে না তাই...!'

বিপুলবাবু ঝুঁকে পড়ে সদ্যছিন্ন মুরগির ঠ্যাংটা জরিপ করছিলেন। আচমকা কথাটা শুনে সটান উঠে দাঁড়ালেন! হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাজা রক্তে লাল হয়ে আছে তাঁর বুড়ো আঙুল আর তর্জনী! মাথার মধ্যে কে যেন ফিসফিসিয়ে বলল, 'খুনি! খুনি!'

সেদিন থেকে মাংস খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। শাক-সবজি, তরি-তরকারি দিয়েই পেট ভরান। এমনকি মাছও স্পর্শ করেন না! সোমদত্তা মাছ পছন্দ করে না। সকালে দুজনেই একপেট ফেনাভাত, ডিম-আলুসেদ্ধ খেয়ে নেন। বিপুল স্কুলের পথে রওনা দেন, আর সোমদত্তা কলেজের দিকে। বিপুলের লাঞ্চ স্কুলের ক্যান্টিনে লুচি-আলুর দম। আর সোমদত্তা চাউমিন বা দোসা। আরামের খাওয়া জোটে একবারই; রাতে! করুণা চলে যাওয়ার পর বিপুল রান্নাবান্না নিজেই করতেন। নিজেই মাছ কেটেকুটে নিপুণহাতে পরিষ্কার করে রাঁধেন-বাড়েন! সেদিন মাছ কাটতে বসে তাঁর গা শিরশিরিয়ে ওঠে। তরতাজা জিওল মাছ দিয়েছিল মাছওয়ালা! মাছগুলো তখনও বালতির জলে খলাৎ খলাৎ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটাকে বঁটির এক পোঁচ দিয়েই কেঁপে উঠলেন! জীবন্ত প্রাণীটা থরথরিয়ে এলিয়ে পড়তেই তার রক্তে স্নান করে বুড়ো আঙুলটা যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'খু-উ-ন...খু-উ-ন...!'

'কী ভাবছেন?' অঙ্কশিক্ষক গিরীশ গুপ্তর কণ্ঠস্বরে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। বিপুল সংবিৎ ফিরে পান। গিরীশ বিরক্ত সুরে বলেন, 'তখন থেকে দেখছি, ভেবেই চলেছেন! ওদিকে ইলেভেনের থার্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা যে অনেকক্ষণ পড়ে গেছে। ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করবেন না?'

সর্বনাশ! থার্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়ে গেছে মিনিট পনেরো আগে! অথচ তিনি এখনও স্টাফরুমে! হেডমিস্ট্রেস জানতে পারলে তাঁর গুষ্টির তুষ্টি করতে ছাড়বেন না। কোনওমতে কেমিস্ট্রির জগদ্দল বইটা এবং নিজেকে যুগপৎ সামলে হাঁফাতে হাঁফাতে পৌঁছলেন তিনতলায়। ইলেভেনের ক্লাসরুমের সামনে! কিন্তু ততক্ষণে কলির সন্ধে হয়ে গেছে, এবং ক্লাসের সুমুখেই বাঘিনির অলৌকিক আবির্ভাব!

হেডমিস্ট্রেস তখন সবে লাঞ্চের পর পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে দাঁড়িয়েছিলেন। চোখও যথেষ্ট লাল। তাঁর হাবভাব দেখলেই করুণাকে মনে পড়ে যায় বিপুলের। করুণার নামই করুণা, কিন্তু বেঁচে থাকতে বিপুলকে কখনও করুণা করেননি। কিছু কিছু মহিলা থাকেন যাঁদের ভালোবাসার শক্তি কম, বরং দাপটের চোটে সবাইকে ভয়ে জড়োসড়ো করে রাখার ক্ষমতা বেশি। এঁরা মিনতি করেন না, অনুরোধ করেন না। বরং আদেশ করেন। এবং সে আদেশ অমান্য করলেই অনর্থ!

'এতক্ষণে আপনার সময় হল?' রূঢ়, কর্কশ স্বর তরল সিসার মতোন কানে এসে ঢুকল, 'আমি তো ভাবছিলাম স্টপ-গ্যাপে কাউকে পাঠাব। কী রাজকার্য করছিলেন এতক্ষণ?'

কণ্ঠস্বরে কোনও নারীসুলভ কোমলতা নেই। ক্ষমা নেই! অসহ্য রাগটা হঠাৎ মাথার রগ বেয়ে চিড়বিড়িয়ে উঠল। তিনি উত্তর দিলেন না।

'কী হল? অজুহাত খুঁজে পাচ্ছেন না?' সুর সপ্তমে চড়ল, 'এমনিতে তো রোজই প্রায় লেটে ঢোকেন। হয় ট্রেন লেট, নয় রেল রোকো, ভূমিকম্প, বন্যা, খরা; সবই তো আছে! এখন দেখছি ক্লাসেও লেট! আপনার সমস্যাটা কী বলবেন? পড়াতে ভালো না লাগলে পড়াবেন না। দরজা খোলাই আছে। বেরিয়ে যান! ওয়ার্থলেস!'

শব্দগুলো তাঁর মাথায় ঢুকছিল না। অপমানিত মুখে, মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আরও একটা কণ্ঠস্বর মনে পড়ে গেল!

'অপদার্থ! এক নম্বরের অপদার্থ তুমি!' করুণার গলা ঝমঝমিয়ে ওঠে, 'মা-বাবা ঠিক বলতেন। তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না। মাস্টারিও না! কত মাস্টার দিব্যি হাজার হাজার টাকা ইনকাম করছে! বাড়ি, গাড়ি করছে। আর তুমি এখনও ভাড়ার বাড়ির টাকা গুনছ। এতদিনে নিজের মাথা গোঁজার একটা জায়গাও দিতে পারলে না! অপদার্থ!'

তিনি অপরাধীর মতো মৃদুস্বরে বলেন, 'ওরা সবাই প্রচুর টিউশনি করে। ব্যাচ বাই ব্যাচ ছেলে-মেয়ে পড়ায়।'

'তুমিও পড়াও।'

'না!' তাঁর শান্ত কণ্ঠে দৃঢ়তা, 'প্রাইভেট টিউশনি করব না আমি। অমন গোরু-ছাগলের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রিট করতে পারব না!'

'তা করবে কেন?' করুণা গনগনে দৃষ্টিতে প্রায় জ্বালিয়ে দিলেন তাঁকে, 'বরং নিজেই গোরু-ছাগলের খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢোকো। ওটাই তোমার আসল জায়গা! কোথাকার কোন ধর্মাত্মার পো এলেন রে!'

করুণা কোনওদিন করুণা করেননি। একমুহূর্তের জন্যও জীবনে শান্তি দেননি। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সাধারণ মাস্টারের রোজগারে তাঁর পোষাত না। সকাল থেকেই শুরু হয়ে যেত অভিযোগ। মাঝখানে কিছুক্ষণের বিরতি। রাতে ঘেমে নেয়ে স্কুল থেকে ফেরার পর আরও একপ্রস্থ অভিযোগ! এমনকি নিজের বিছানাও আলাদা করে নিয়েছিলেন। বলতেন, 'কাপুরুষ কোথাকার! তোমার পাশে শুয়ে কী পেয়েছি আমি? একটা মেয়েছেলের কলজের জোরও নেই! এই নাকি পুরুষ! থুঃ, ঘেন্না...ঘেন্না!'

তিনি শুধু চুপ করে শুনে গেছেন। শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়েছেন। ক্লান্ততর হয়েছেন! ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছনোর আগেই অবশ্য করুণা প্রথম ও শেষবারের মতো করুণা করলেন। লাংস ক্যান্সারে দেহত্যাগ করলেন!

'কী হল? মৌনব্রত নিয়েছেন নাকি?' ফের ধমকে ওঠেন হেডমিস্ট্রেস, 'কী ভেবেছেন? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে?'

ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র-ছাত্রীরা উঁকি মেরে রঙ্গটা দেখছিল! ওদের ফিসফিসানি কানে এল, 'ব্রায়ের স্ট্র্যাপ আজ ঢিলে করেই ছাড়বে হেড়ু!'

অসম্ভব রাগটা চড়াৎ করে পৌঁছে গেল মস্তিষ্কের কেন্দ্রে। কী ভাবেন এই মহিলা! কী ভাবে ওরা সবাই? তিনি জোকার? ক্লাউন? পাগল? তাঁর চোখে রক্ত জমল। আড়চোখে দেখলেন, মহিলা অসাবধানে দাঁড়িয়ে আছেন করিডোরের রেলিঙের গা ঘেঁষে। রেলিংগুলো বহু পুরোনো, ক্ষয়াটে। খুব বেশি কিছু করতে হবে না! সামান্য একটু ধাক্কা। তাহলেই মুক্তি! সোজা তিনতলা থেকে...

তিনি নির্ভয়ে দৃঢ়পায়ে রেলিঙের দিকে এগিয়ে গেলেন! তখনই মনে হল, বুড়ো আঙুলটায় যেন কাঁচা রক্তের দাগ। বিপুলবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'সরে যা-ন! রেলিঙগুলো পুরোনো! আমার বুড়ো আঙুল...বুড়ো আঙুল...!'

বলতে বলতেই পিছন ঘুরে উন্মত্তের মতো সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন।

৩

রাতে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলেন বিপুল। গুমোট গরমে ঘুম আসছে না! আগে এই ঘরে করুণা শুতেন মেয়েকে নিয়ে। এখন সোমদত্তা এ ঘরে শুতে ভয় পায়। তাই এখন এই ঘরেই তাঁর রাত্রিবাস। এখনও এ ঘরে ঢুকলেই ওষুধের গন্ধ পান বিপুল। আর মনে পড়ে যায় প্রেতিনীর মতো খলখল করে হেসে উঠে বলা করুণার বিষবাক্যগুলো : 'এবার? এবার কী করবে? সারাজীবন জ্বালিয়ে মেরেছ। এবার আমার পালা। প্রতিশোধ নেব...প্রতিশোধ! রাস্তায় বসিয়ে ছাড়ব তোমায়। জলের মতো টাকা খসাব! বীরপুরুষ লোন নিতে ভয় পান! প্রাইভেট টিউশনি করে দুটো এক্সট্রা ইনকাম করতে ভয় করে ওঁর! এবার? এবার কী করবে? বিনা চিকিৎসায় ফেলে মারবে?'

তিনি তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন, 'কিচ্ছু হবে না তোমার! দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হবে না মানে?' ফুঁসে উঠলেন করুণা। উত্তেজনার চোটে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। তবু সাপের মতো হিসহিসিয়ে ক্রুর ও শীতল শব্দগুলো বললেন; 'নিশ্চয়ই হবে। আমি মরব। কিন্তু তোমাকেও মেরে যাব।'

'কিচ্ছু হবে না রুনা।' করুণার দাদা এগিয়ে এসেছিলেন, 'নামজাদা নার্সিং হোমে রাখব তোকে। বড় বড় ডাক্তার দেখাব...!'

'না!' রুগ্ন করুণাকে অবিকল ডাইনির মতো লাগছিল, 'আমি কোত্থাও যাব না! এখানে, এই বিছানায় শুয়েই মরব। তোমাদের কোনও হেল্প দরকার নেই। তোমরা হেল্প করলে এই লোকটা বেঁচে যাবে। আমি ওকে ধ্বংস করে তবেই শান্তিতে মরতে পারব! এক পয়সাও দেবে না ওকে। দেখি ওর দৌড় কত!'

শেষ পর্যন্ত করুণার স্বপ্ন অনেকটাই সাফল্যের পথে এগিয়েছিল। করুণাকে কিছুতেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়নি। ফলস্বরূপ বাড়িটাই হয়ে উঠল হাসপাতাল! দামি এসি লাগাতে হল। অক্সিজেন সরবরাহের বন্দোবস্ত করতে হল। মোটা টাকার বিনিময়ে দুজন নার্সের ব্যবস্থাও হল! কেমোথেরাপির

পিছনে, অপারেশনের পেছনে জলের মতো টাকা গেছে! যদিও অপারেশন শেষ পর্যন্ত সাকসেসফুল হয়নি। স্বামী, সন্তান এমনকি নার্স দুজনকেও ছ'মাস ধরে যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, শেষ পর্যন্ত অপারেশন টেবিলেই মারা গিয়েছিলেন তিনি! তবু করুণা বিপুলকে প্রায় পথে বসতে দেখে গেছেন! দেনায় দেনায় জর্জরিত হতে দেখেছেন। ওঁর আত্মার শান্তি হয়েছে হয়তো!

কী শত্রুতা ছিল তাঁর বিপুলের সঙ্গে? কী অন্যায় করেছিলেন তিনি? বিয়ের পর থেকেই করুণার টাকাসর্বস্ব রূপ ছাড়া আর কিছুই দেখেননি! এখন মনে হয়, করুণা হয়তো মানসিক রোগী ছিলেন। জীবনে কিছুতেই সন্তুষ্ট হননি তিনি। গয়না গড়িয়ে দিলেও অশান্তি! গয়নাটা কেন হিরের নয়? কেন দার্জিলিং? কেন লাদাখ নয়? ট্রেনের থার্ড এসি? ফ্লাইট নয় কেন? জীবনের ছোট ছোট সুখগুলোকে কখনও দেখতে শেখেননি করুণা! বড় সুখ জুটল না কপালে, তাই হয়তো শেষ পর্যন্ত বড় অসুখই বাধালেন!

কখন যেন এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বিপুল। ক্লান্তিতে দু-চোখ বুঁজে এসেছিল। কিন্তু আচমকা চটকা ভেঙে গেল! আশ্চর্য! ওষুধের গন্ধটা এমন বেড়ে গেল কী করে? তাঁর নাকে ডেটল মিশ্রিত একটা উগ্র গন্ধ এসে ঝাপ্টা মারছে। পাশের শুয়ে থাকা অন্ধকারটা কখন এমন ভয়ানক আকার ধারণ করল? বিপুল সচকিত হয়ে ওঠেন। বিছানার পাশে আরও একটা অস্তিত্ব যেন টেনে টেনে শ্বাস ফেলছে! হিমশীতল একটা হাওয়া...

'শেষমেশ খুনই করতে হল তোমাকে?'

বিপুল ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন। কে?

'একটা মেয়েমানুষের হাত থেকে রক্ষা পেতে শেষ পর্যন্ত খুনই করতে হল? কাপুরুষ!' শেষ শব্দের 'ষ'টা যেন হুইসলের মতো কানে বাজল, 'কে-উ জানে না! সোমাও নয়। শুধু তুমি আর আমি...!'

বিপুলের কানে একটা কথোপকথন ভেসে আসে। দুটো লোক নীচু গলায় কথা বলছে! চিলড এসির ঠান্ডা আমেজে দুটো কণ্ঠস্বর খুব আস্তে অথচ স্পষ্ট ভেসে এল।

'আপনি বুঝতে পারছেন না!' ডাক্তারবাবুর শান্ত কণ্ঠস্বর, 'কিছু করার নেই। পেশেন্ট একদম অ্যাডভান্সড স্টেজে! ফুসফুস পুরোপুরি অ্যাফেক্টেড! কেমো নিয়ে শরীর পুরো ঝাঁঝরা! পেশেন্ট 'এসোফেগাসে' পৌঁছে গেছে। ফুড পাইপ অ্যাফেক্টেড। এ পরিস্থিতিতে অপারেশন করা রিস্কি! অপারেশন টেবিলেই মারা যাবেন। তার চেয়ে ওঁকে বাড়িতেই রাখুন! যে ক'টা দিন আছেন, শান্তিতে কাটুক।'

পেশেন্টের স্বামী ইতস্তত করছে, 'কিন্তু এমন করে ক'দিন ডক্টর?'

'বড়জোর মাস তিনেক।' ডাক্তারবাবু মাথা নাড়ছেন, 'তার বেশি কোনওভাবেই নয়।'

স্বামী অদ্ভুত একটা বিপন্নতায় ডুবে যাচ্ছে! আরও তিনমাস! একেই ধার-দেনা নাক অবধি ঠেকেছে। আরও তিনমাস টানতে যে দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম। তার চেয়ে আশু সমাধানটাই গ্রহণযোগ্য নয় কি? অপারেশন টেবিলেই যদি মুক্তি পাওয়া যায়...!

সে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'রিস্ক ফ্যাক্টর কোথায় নেই ডক্টর? তবু আমি অপারেশন করাতেই চাই।'

'কী বলছেন!' ডাক্তারবাবু আকাশ থেকে পড়লেন, 'আপনি কি আদৌ সমস্যাটা বুঝতে পেরেছেন? ওঁর পারফরম্যান্স ভীষণ পুওর! তার ওপর ইন-অ্যাডিকুয়েট পালমোনারি রিসার্ভ! এ পেশেন্ট ওটি থেকে ফিরবেই না!'

'তবু চান্স নিতে ক্ষতি কি ডক্টর?' স্বামীটি নাছোড়বান্দা, 'সুস্থ হয়ে ফিরেও তো আসতে পারে।'

ডাক্তারবাবুর মুখ গম্ভীর। বারবার বারণ করা সত্ত্বেও পেশেন্টের স্বামী কথা শুনছে না। তিনি জানেন এসব কেসে অপারেশন, আসলে কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা। অথচ স্বামী ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা!

'আমি সাইন করে দেব। যে বন্ডে সাইন করতে বলবেন, করব। আপনি শুধু অপারেশনটা করুন।'

শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। এই বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ফাঁকে কলমটাকে শক্ত করে ধরে খসখস করে মৃত্যুর পরোয়ানায় সই করে দিয়েছিল রোগিণীর স্বামী। তার হাত একবারের জন্যও কাঁপেনি! ওটিতে যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর কথাগুলো এখনও কানে বাজে, 'পরিণতি যাই হোক, দায় কিন্তু আমার নয়। এখনও সময় আছে। ভেবে দেখুন...!'

'আমার লাইফ ইনশিওরেন্সের টাকা দিয়ে সব দেনা মিটিয়েছ! বাঃ! একবারও লজ্জা করল না মরা বৌয়ের পয়সায় হাত দিতে?' কণ্ঠস্বরটা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'সবাই তোমাকে বেচারি, সাধুপুরুষ ভাবে! কিন্তু তুমি কী করেছ তা কেউ জানে না! একমাত্র আমি জানি...!'

প্রচণ্ড আক্রোশে অন্ধকারটার গলা টিপে ধরলেন বিপুল। চিৎকার করে বললেন, 'বলতে দেব না। কিছুতেই তোকে মুখ খুলতে দেব না!...কী ভেবেছিস...অ্যাঁ?'

অন্ধকারটা খলখল করে হেসে ওঠে! তিনি পাকা খুনির মতো প্রাণপণে তার গলা টিপে ধরেছেন! বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ক্রমাগতই চেপে বসছে মানুষটার গলায়। অসহ্য রাগটা জন্তুর মতো দাপাচ্ছে। এর শেষ দেখেই ছাড়বেন। অনেক সহ্য করেছেন! আজ এস্পার কী ওস্পার!

'বাবা! কী করছ!...' ও ঘর থেকে চিৎকার শুনে সোমদত্তা দৌড়ে এসেছে! সে সবিস্ময়ে আলো জ্বেলে দেখল, বিপুল করুণার পাশবালিশটার গলা টিপে ধরেছেন! যেন ওটা পাশবালিশ নয়! যেন ওটা একটা মানুষ!

'কী করছ? বাবা!'

'তোর মাকে খুন করছি।' বিপুলের চোখদুটো বনবন করে ঘুরছে। মুখে গ্যাঁজলা ভাঙছে। উন্মত্তের মতো চিৎকার করে বললেন, 'হ্যাঁ, আগেও করেছি। এখনও করছি। যতবার পারব খুন করব! আমি খুনী...আমি খুনী...ওই লোকটা ঠিক বলেছিল...আমি খুনী-ই-ই!'

পরের দিন লোক্যাল ট্রেনে বিপুলবাবুকে দেখা গেল না।

তাঁর বাঁধাধরা সিটে এসে বসলেন আরেক ভদ্রলোক। নিপাট ভালোমানুষ! সর্বাঙ্গে তাবিজ-কবচ ভূষিত! মাথার তেলা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো।

'ক্যায়া হাল হ্যায় বেটা?' ভদ্রলোক চমকে তাকালেন। কখন যেন এক সাধুবাবা তাঁর ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছেন। ঢুলুঢুলু দৃষ্টিতে কতটা আধ্যাত্মিকতা আছে, আর কতটা ভণ্ডামি, বোঝা মুশকিল।

'চুষুন দাদা, চুষুন। যত চুষবেন তত রস। যত খাবেন তত মিষ্টি। একবারটি খেয়ে দেখুন দাদা। মনে হবে প্রাণ ঠান্ডা হচ্ছে। স্বর্গসুখ পাচ্ছেন...।'

এপ্রান্ত থেকে আওয়াজ আসা মাত্রই, ওপ্রান্তে কে যেন বলে উঠল...

'খেলেই ম-র-বে-এ-এ-এ! চুষলেই মরবে-এ-এ-এ!'

—

লোকটা বড্ড ভুলো

১

অসিতবাবু আজও ট্রেন মিস করলেন। এমনিতেই গত তিনদিন ধরে তিনি লাগাতার ট্রেন মিস করে চলেছেন। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

এমনিতেই বিহারের নাগিনা স্টেশনটা ছোট্ট। বেশির ভাগ ট্রেনই দাঁড়ায় না। জম্মু-তাওয়াই তবু মিনিটখানেকের জন্য রেললাইনে একটু চাকা ঠেকায়। তা-ও তার আসার কোনও গৎবাঁধা সময় নেই। জম্মু-তাওয়াই নামে সুপার ফাস্ট হলেও কাজে সুপার স্লো! যখন ওনার মর্জি হবে, তখন দেখা দেবেন। বড়জোর এক-আধ মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়াবেন; তারপরই ধাঁ!

অবশ্য দোষটা একা ট্রেনের নয়। অসিতবাবু নিজেই জম্মু-তাওয়াইয়ের চেয়েও বড় লেটলতিফ। সকালের দিকে তাঁর ঘুম ভাঙতেই চায় না। যদি বা অ্যালার্মঘড়ির চিল-চিৎকারে যথাসময়ে ঘুম ভাঙল, ভদ্রলোক ঘুম থেকে উঠে অন্তত আধঘণ্টা ভোম মেরে বসে থাকবেন। আদতে তিনি ভুলেই গিয়েছেন যে, অ্যালার্মটা কেন দেওয়া হয়েছিল। যখন কারণটা মনে পড়বে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। অগত্যা হাঁউ-মাউ করে লাফ-ঝাঁপ মেরে তৈরি হতে গিয়ে টের পাবেন যে তিনি ব্রাশ কিংবা পেস্ট, কোনওটাই খুঁজে পাচ্ছেন না! যদি বা কপালজোরে খুঁজে পাওয়া গেল, অবধারিত ভাবে গেঞ্জি, শার্ট, প্যান্ট মিসিং হবেই! কোনওমতে সেগুলো জোগাড় করে পরে বেরোতে যাবেন, ঠিক তখনই চোখে পড়বে যে শার্টটা তিনি উলটো পরেছেন! অথবা প্যান্টের বেল্টের ফাঁক দিয়ে ভিজে গামছাটা উঁকিঝুঁকি মারছে!

এতসব ম্যাও সামলে টামলে দু-হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে, শেষ পর্যন্ত যখন দৌড়তে দৌড়তে স্টেশনে পৌঁছবেন, ঠিক তখনই চোখের সামনে দিয়ে হুশহাশ করে হাওয়া হয়ে যাবে জম্মু-তাওয়াই! আর অসিতবাবু কপালে হাত দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে নিরাশ, বিধ্বস্ত অবস্থায় বসে পড়বেন স্টেশনের ওপর!

গত তিনদিন ধরেই এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে। যেন সিনেমাহলে চলা ফিল্মের রিল গিয়েছে আটকে! বারবার একই দৃশ্যের অ্যাকশন রিপ্লে!

আজও যথারীতি ফোঁস ফোঁস করতে করতে ট্রেনটা বেরিয়ে যাচ্ছিল। অসিতবাবু পাঁইপাঁই করে ধাওয়া করলেন তার পিছনে। চিৎকার করে বললেন; 'রোক্কে,...রোক্কে!'

ট্রেনের গার্ড এদিকেই তাকিয়েছিল। একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। পরক্ষণেই নির্লিপ্ত মুখ করে বসে পড়ল। একটা লোক যে পাগলের মতো ছুটে আসছে এদিকেই, তা যেন তার নজরেই পড়েনি। অসিতবাবু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রায় চিয়ার লিডারদের মতো দু-হাত ছড়িয়ে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করতে করতে চেঁচাচ্ছেন, 'রোককে!...রোক্কে!...!' কিন্তু গার্ডের মুখ ভাবলেশহীন। যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না!

মরিয়া হয়ে তিনি ট্রেনের পেছনে ছুট লাগালেন। ছুটতে ছুটতে চলন্ত ট্রেনের প্রায় পেছনে পৌঁছে গিয়েছেন!...আরেকটু এগোলেই চলমান ট্রেনের পা-দানিটা পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক দু-হাতে ব্যাগ নিয়ে ঠিকমতন দৌড়তেও পারছেন না। কিন্তু আজ ট্রেনটা তিনি ধরবেনই! যেমন করেই হোক!

ট্রেনের পেছনের কামরার পা-দানিটা এসে গিয়েছে নাগালের মধ্যে। ছুটতে ছুটতেই অন্ধের মতো পা বাড়িয়ে দিলেন অসিতবাবু। কিন্তু পা-টা সঠিক জায়গায় পড়ল না। বরং পা পিছলে গেল! আর...!

'গে-ছি!...গে-ছি!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। মৃত্যুভয়ে চোখ বুঁজে ফেলেছেন। এই বুঝি সুড়ুৎ করে প্ল্যাটফর্মের ফাঁক গলে পড়ে গেলেন চলন্ত ট্রেনের নীচে। এই বুঝি ওঁর বুকের ওপর দিয়ে চলে গেল ট্রেনের চাকা! এই বুঝি তিনি দু-খণ্ড হয়ে গেলেন! এই বুঝি...!

আচমকা একটা কণ্ঠস্বর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, 'এখনও যাননি। তবে আরেকটু হলেই যাচ্ছিলেন!'

অসিতবাবু তখনও ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেননি। ভয়ে এখনও তাঁর হাত পা কাঁপছে। কোনওমতে ঢোঁক গিলে বললেন, 'আমি কি বেঁচে আছি?'

কণ্ঠস্বরটা তেমন ফিসফিসিয়ে বলল, 'এই তো কনফিউজিং প্রশ্ন করে বসলেন! বেঁচে থাকা বা না থাকাটা আপেক্ষিক ব্যাপার মশাই! তবে এইটুকু নিশ্চিত যে আপনি এখনও প্ল্যাটফর্মেই আছেন!'

এবার ভরসা পেয়ে চোখ খুললেন অসিতবাবু। নাঃ, ট্রেনের চাকার তলায় যাননি তিনি। তবে প্ল্যাটফর্ম আর লাইনের মাঝখানে ঝুলছেন। আর তাঁর শার্টের কলার ধরে টেনে আছে কেউ। বিড়ালের বাচ্চাকে যেমন ঘেঁটি ধরে টেনে তোলা হয়, তেমনই কেউ তাঁকে শার্টের কলার ধরে টেনে তুলল প্ল্যাটফর্মের ওপরে।

'ধন্যবাদ!' কাঁপা গলায় বললেন অসিতবাবু। এখনও হাত-পা কাঁপছে। তবু পেছন ফিরে উপকারী বন্ধুর দিকে তাকালেন, 'আপনি আমায় বাঁচিয়েছেন। কী বলে যে আপনাকে...!'

বলতে বলতেই থেমে গেলেন। সামনের লোকটি ওঁর পরিচিত। গত চারদিন ধরেই দেখছেন। উনি এই স্টেশনের স্টেশনমাস্টার। মৃদু হেসে বললেন, 'আজও ট্রেনটা ধরতে পারলেন না?'

'নাঃ।' হতাশ ভাবে বললেন অসিতবাবু, 'আজও মিস করলাম! কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না! রোজই ভাবি আজ ট্রেনটা ধরবই, কিন্তু কিছুতেই ধরা হয় না। কেমন যেন পাঁকাল মাছের মতো বারবার পিছলে যাচ্ছে!'

'এত তাড়া কীসের?' স্টেশনমাস্টার হাসতে হাসতেই বললেন, 'এসেই যখন পড়েছেন এখানে, তবে কিছুদিন থেকেই যান। নাগিনা জায়গাটা এত খারাপও নয়।'

'না না!' কপালের ঘাম মুছছেন তিনি, 'খারাপ হবে কেন? তবে কী জানেন? বাড়িতে আমার স্ত্রী আছেন। মেয়ে আছে। আমার তো এখানে এতদিন থাকার কথা নয়। ওরা হয়তো চিন্তা করছে!'

'তাতে কী! একটা ফোন করে দিন না বাড়িতে।' স্টেশনমাস্টার আস্তে আস্তে বলেন, 'মোবাইল আছে তো আপনার কাছে!'

'মোবাইল!' মোবাইলের কথা মনে পড়তেই কেমন যেন মুষড়ে পড়লেন অসিতবাবু, 'মোবাইল তো ছিল। কিন্তু গত তিনদিন ধরে সেটাকেও খুঁজে পাচ্ছি না! কোথায় যে রেখেছি একদম ভুলে গিয়েছি। মনেই পড়ছে না।'

'ঠিক আছে...ঠিক আছে।' তিনি কথা ঘোরালেন, 'মোবাইলের তো আর ট্রেনের মতো চাকা নেই যে গড়গড়িয়ে চলে যাবে। আছে নিশ্চয়ই ব্যাগে কোথাও। তেমন হলে কোনও পি সি ও থেকে ফোন করে নেবেন না হয়।'

অসিতবাবু বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়েন। বাড়ির নম্বরটাও তাঁর মনে নেই। কোনওদিনই থাকে না। এ নিয়ে গিন্নি অনেকবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুতেই নম্বরটা মনে রাখতে পারেন না। বহুবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, এবার ল্যান্ডলাইনের নম্বরটা মুখস্থ করে রাখবেনই। তবু প্রত্যেকবারই স্মৃতিশক্তি দাগা দেয়।

'আপনি বোধহয় একটু ভুলো মানুষ। তাই না?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন তিনি। অসিতবাবুর এই ভুলে যাওয়ার স্বভাব নিয়ে বাড়িতে অশান্তির শেষ নেই। গিন্নির নাম অরুণিমা। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত সঠিক ভাবে নামটা মনে রাখতে পারেননি। কখনও ডাকেন 'নীলিমা'! কখনও বা 'মধুরিমা'! কোনওবার 'নিরুপমা' তো কোনওবার 'অনুপমা'। একবার তো 'হেমা' বলেও ডেকে ফেলেছিলেন। গিন্নি শুনে বলেছিলেন, 'হে-এ-এ মা! এই লোকটাকে নিয়ে কী করি! তাও ভালো এখনও মাসিমা, পিসিমা, ঠাকুমা বলে ডাকেনি!' অসিতবাবুর কী দোষ! ওঁর নামের মধ্যে শুধু 'মা' শব্দটাই মনে থাকে! বাকিটা পুরো গুবলেট হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এক বন্ধু বুদ্ধি বাতলাল, 'পুরো নাম ধরে ডাকার কী দরকার! আধখানা নাম ধরে ডাক না!'

'কী বলে ডাকব? 'মা' বলে?' অসিতবাবু চটেমটে বললেন, 'ওই মা-টুকুই তো মনে থাকে। আর বৌকে মা বলে ডাকলে কি আর আস্ত রাখবে?'

'মা বলবি কেন? 'অরু' বলে ডাক।' বুদ্ধিমান বন্ধু বলল, 'অরু ডাকলেই তো আর প্রবলেম নেই!'

'কিন্তু 'অরু'টাও তো মনে রাখতে হবে। যদি ভুলে যাই?'

'ভুলবি কেন? ভেরি সিম্পল!' বন্ধু মুচকি হেসে বলে, 'শুধু মনে রাখিস 'গরু'। তাহলেই দেখবি 'অরু'ও মনে থাকছে।'

বন্ধুর টোটকায় কাজ হয়েছিল। তারপর থেকে গিন্নিকে 'অরু' বলেই ডেকে আসছেন অসিতবাবু। এবার আর ভোলেননি।

কিন্তু ওঁর ভুলে যাওয়ার বদভ্যাসে সংসারে অশান্তি তারপরও কমেনি। বৌয়ের নাম তো কোনওভাবে মনে রাখা গেল। কিন্তু মেয়ের ভালো নাম আর কিছুতেই মনে থাকে না! একবার স্কুল থেকে ফিরে মেয়ের কী হাপুসনয়নে কান্না! সেদিন অরুনিমার শরীর ভালো ছিল না বলে অসিতবাবু গিয়েছিলেন মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে। মেয়ে তো কাঁদে আর মাকে বকে, 'কেন বাবাকে পাঠিয়েছ আমায় আনতে! বাবা আমার প্রেস্টিজে পুরো গ্যামাক্সিন দিয়ে দিয়েছে।'

মা মেয়েকে কোনওমতে শান্ত করতে করতে জানতে চাইলেন, 'কেন? কী হয়েছে?'

'কী আবার হবে?' ভ্যাঁক করে কেঁদে বলল মেয়ে, 'স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী ছুটির পর আমরা সবাই দরোয়ানের সঙ্গে ছিলাম। রোজকার মতো আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু দেখি বাবা আসছে। তখনই বুঝেছিলাম কিছু একটা ঘটবে। বাবা দূর থেকেই আমায় দেখতে পেয়ে কাছে ডাকল। কিন্তু দরোয়ানজি স্কুলের রুল অনুযায়ী যতক্ষণ না গার্ডিয়ান স্টুডেন্টের নাম বলছে, ততক্ষণ ছাড়বে না। আর বাবা কিছুতেই আমার নাম বলতে পারছে না। বারবার আমাকে দেখিয়ে বলছে 'ওই তো আমার মেয়ে।' তবুও দরোয়ানজি ছাড়ে না। বলে, 'আগে মেয়ের নাম বলুন।' শেষ পর্যন্ত বাবা সবার সামনে চিৎকার করে বলল, 'এই খেঁ-দি, তোর না-ম কী-ই-ই-ই!' সবাই আমাকে খ্যাপাচ্ছে।' বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল সে, 'সবাই বলছে 'যাজ্ঞসেনী, তোর নাম খেঁদি! আগে তো বলিসনি!' কাল থেকে নির্ঘাৎ সবাই আমাকে 'খেঁদি খেঁদি' বলে খ্যাপাবে!'

এরকম কাণ্ড আরও বেশ কয়েকবার করেছেন অসিতবাবু। কিন্তু এবার যা ঘটছে, সেটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে! কে জানে, ওঁর স্ত্রী, আর মেয়ে এবার কী ভাবছে! অফিসের কাজে নাগিনায় এসেছিলেন। কিন্তু যেদিন তাঁর বাড়ি ফেরার কথা, তার থেকে চার দিন দেরি হয়ে গিয়েছে। কোনও খবরও দিতে পারেননি। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় অরুণিমা বারবার বলে দিয়েছিলেন, 'গিয়েই পৌঁছনোর খবর দেবে। রোজ মনে করে ফোন কোর। বাড়িতে যে দুটো প্রাণী আছে, ভুলে যেও না।'

অথচ গত চারদিন ধরে কোনও খবরই বাড়িতে দিতে পারেননি। ওরা হয়তো দুশ্চিন্তায় আছে...!

'এরপরের ট্রেন আবার কাল সকালে!' স্টেশনমাস্টারের কথায় সংবিৎ ফিরল তাঁর, 'ততক্ষণ কী করবেন? কোথায় উঠবেন? এখানে তো ধারেকাছে আবার তেমন কোনও হোটেল নেই!'

বাড়ির চিন্তায় অন্য দুশ্চিন্তাগুলো ভুলে গিয়েছিলেন অসিতবাবু। এবার তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। তাই তো! এবার কী করবেন? এর আগে অফিসের গেস্ট হাউসে উঠেছিলেন। তাও এখান থেকে অনেকটাই দূরে! তা ছাড়া যতদূর মনে পড়ছে গত তিনদিন তিনি মোটেই গেস্ট হাউসে ছিলেন না। এখানেই আশেপাশে কোথাও ছিলেন। কিন্তু কোথায়? ভুরু কোঁচকালেন তিনি; নাঃ মনে পড়ছে না!

মনে মনে বোধহয় অসিতবাবুর অসহায় অবস্থার কথা বুঝে নিলেন স্টেশনমাস্টার। সহৃদয় কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক আছে। কোনও ব্যাপার নয়। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।' বলতে বলতেই ওঁর ব্যাগ দুটো তুলে নিলেন।

'আরে...আরে! কী করছেন!'

অসিতবাবুর কথাকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে দুটো ব্যাগই তুলে হাঁটা দিলেন স্টেশনমাস্টার। পেছন পেছন দৌড়লেন অসিতবাবু।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?'

'এই তো! স্টেশনের একদম কাছে। ওখানে আমার এক পরিচিত মানুষের বাড়ি আছে। ভদ্রলোক পেশায় ম্যাজিশিয়ান। খুব মাই ডিয়ার লোক। আজকের দিনটা নাহয় ওখানেই কাটিয়ে দেবেন। খুব

একটা কষ্ট হবে না।' বলতে বলতেই হাসলেন ভদ্রলোক, 'আপনি নাগিনার অতিথি। আমাদের সবার অতিথি। আপনাকে কি কষ্ট করতে দিতে পারি?'

স্টেশনমাস্টারের অর্থপূর্ণ হাসিটা দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল অসিতবাবুর। কিন্তু তিনি মুখে কিছু না বলে ভদ্রলোকের পেছন পেছন চললেন।

২

স্টেশনমাস্টারের কথাই সঠিক। বাড়িটা স্টেশন থেকে একদম কাছেই। একদম পুরোনো আমলের দোতলা বাড়ি। দশাসই চেহারার ভিক্টোরিয়ান 'গথিক' ধরন। কিন্তু বাইরে থেকে দেখেই মনে হয় বাড়িটার অবস্থা এখনও বেশ ভালো। অন্তত অন্যান্য পুরোনো বাড়ির মতোন ধ্বংসস্তূপের চেহারা নেয়নি। লোহার গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই দু-পাশে ঘন আমবাগান। মাঝখান দিয়ে মোরামের রাস্তা চলে গিয়েছে বাড়ির দিকে।

অসিতবাবু স্টেশনমাস্টারের পেছন পেছন এসে উঠলেন বাড়িটাতে। হঠাৎ মনে হল; এই বাড়িটাকে আগে কোথাও দেখেছেন! কিন্তু কোথায়? নাঃ, মনে পড়ছে না! মনের ভেতরটা খুঁতখুঁত করছে। অথচ প্রকাশ করতে পারছেন না।

'আসুন।' স্টেশনমাস্টার একটা বিশাল ঘরে ঢুকে পড়ে আহ্বান জানালেন তাঁকে, 'এদিকে আসুন। ম্যাজিশিয়ান সাহেব এখানে আছেন।'

অসিতবাবু একটু ইতস্তত করতে করতেই ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু ঘরে ঢোকামাত্রই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ! একজন সুদর্শন লোক কালো জোব্বা পরে শূন্যে ভাসছে! দেখেই প্রায় আঁতকে উঠলেন তিনি। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'ও ক্কী!...উনি হাওয়ায় কী করছেন!'

'চিন্তা করবেন না।' স্টেশনমাস্টার তাঁকে আশ্বস্ত করলেন; 'জাদুকর মানুষ তো! এসব ওঁদের বাঁ হাতের খেলা! হাওয়ায় ভাসা, জলে হাঁটা; এসব ওঁরা হামেশাই করেন।' বলতে বলতেই একটু গলা চড়িয়ে বললেন, 'ও জাদুকর সাহেব। একবার নীচে নেমে আসুন। কথা আছে।'

জাদুকর টুক করে নেমে এলেন নীচে। চোখ খুললেন। অসিতবাবুর আবার মনে হল, এই লোকটাকে তিনিও চেনেন! কিন্তু কীভাবে! সে বিষয়ে আর কিছু ভাবার আগেই জাদুকর আচমকা বললেন, 'আজও ট্রেন মিস করেছেন আপনি!'

অসিতবাবু চমকে উঠলেন। এই লোকটা জানল কী করে যে তিনি ট্রেন মিস করেছেন! কিন্তু কিছু বলার আগেই ফের জাদুকর সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে...ঠিক আছে। কোনও ব্যাপার নয়। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু; কোনও না কোনওদিন তো ট্রেন পাবেনই। ততদিন এখানেই থাকুন। যদ্দিন না ট্রেন পাচ্ছেন, এখানেই থেকে যান। এ বাড়িটাও তো আপনারই!'

'আমার বাড়ি! মা-নে!' স্তম্ভিত ভাবে বললেন অসিতবাবু।

জাদুকর কোনও উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসলেন। বোঝা গেল, তিনি স্বল্প কথার মানুষ। স্টেশনমাস্টারকে বললেন, 'ওঁকে ওঁর ঘরটা দেখিয়ে দিন।'

'নিশ্চয়ই...নিশ্চয়ই...!' স্টেশনমাস্টার অসিতবাবুকে আর কোনও কথা বলতে না দিয়েই ওঁর ব্যাগদুটো তুলে হাঁটা দিলেন। অগত্যা অসিতবাবুকেও যেতে হল। তবে যাওয়ার আগে আড়চোখে দেখে নিলেন যে জাদুকর সাহেব ফের হাওয়ায় ভাসতে শুরু করেছেন!

পুরোনো আমলের বড় বড় থামওয়ালা মার্বেলের বারান্দা। তার বাঁ দিকে সারি সারি ঘর। কোনওটা খোলা, কোনওটা বন্ধ। একটা খোলা ঘরের ভেতরে উঁকি মেরে দেখলেন, সব সাহেবি আমলের আসবাব ভরা! মেহগনি কাঠের বিরাট পালঙ্ক! উল্টোদিকে বেলজিয়াম গ্লাসের ভারী আয়না। দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর অয়েলপেইন্টিং। একপাশে টেবিল-চেয়ার। টেবিলে বই, লেখার সরঞ্জাম। তার মধ্যেই একটি ছেলে দেওয়ালে পায়চারি করছে!

গোটা দৃশ্যটা দেখেই চলে যাচ্ছিলেন অসিতবাবু। হঠাৎ তাঁর মাথায় বজ্রাঘাত হল! কী! একটা ছেলে দেওয়ালে হাঁটছে! তাঁর রক্ত যেন হিম হয়ে এল। আতঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, 'ও কী! ও কী!'

'কী হল?' স্টেশনমাস্টার পেছনে ফিরলেন।

'ওই যে!' তিনি আঙুল তুলে ঘরের ভেতরে নির্দেশ করলেন, 'দেওয়ালে হাঁটছে!'

'দেওয়ালে হাঁটছে! কে দেওয়ালে হাঁটছে?'

'ওই তো!'

স্টেশনমাস্টার এগিয়ে গিয়েছিলেন। এবার খানিকটা পিছিয়ে এসে দৃশ্যটা দেখলেন। পরক্ষণেই এক ধমক, 'এই বাবু! দেওয়ালে হাঁটছিস কেন?'

ছেলেটি নীচে নেমে এসে কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'আমার ভালো লাগছিল কাকু!'

'তাই বলে দেওয়ালে হাঁটবি! এতবড় বারান্দা আছে, ছাত আছে, বাগান আছে। সেখানে হাঁটাহাঁটি না করে দেওয়ালে হেঁটে বেড়ানোটা কী জাতীয় ভদ্রতা? যা! বাগানে গিয়ে হাঁট!'

বকা খেয়ে ছেলেটি মুখ চুন করে চলে গেল। অসিতবাবু তখনও ভয়ে কাঁপছেন। স্টেশনমাস্টার ওঁকে আশ্বস্ত করেন, 'ওরা সব জাদুকর সাহেবের চ্যালা। এসব ট্রিক খুব সহজ! চাইলে আপনিও পারেন! ভয় পাবেন না।'

মাথার ঘাম মুছে ঢোঁক গিললেন অসিতবাবু। বললেন, 'জল!'

'জল খাবেন? একটু দাঁড়ান!' স্টেশনমাস্টার হাঁকাড় পাড়লেন, 'ওরে ভোলা...!'

হঠাৎ ভোজবাজির মতো কোথা থেকে একটা মুষকো কালো লোক এসে হাজির। যেন হাওয়া থেকে প্রকট হল! অথবা মাটি ফুঁড়ে! লোকটার চোখ দুটো লাল লাল। দেখলেই ভয় করে। খসখসে গলায় বলল, 'কী বাবু?'

'একগ্লাস জল নিয়ে আয় তো!'

সে বিনম্র ভাবে মাথা ঝাঁকায়, 'এই তো, এক্ষুনি আনছি বাবু!'

বলল বটে 'আনছি', কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার! লোকটা ওখান থেকে এক পাও নড়ল না। বরং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল একটা রুপোলি রঙের ট্রে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আসছে। তার ওপর কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল!

অসিতবাবুর মনে হল সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর চতুর্দিকে চক্কর দিচ্ছে! যা ঘটছে তা কি সত্যিই ঘটছে? না পুরোটাই কল্পনা! প্রথমে হাওয়ায় ভাসমান জাদুকর! তারপর দেওয়ালে হেঁটে বেড়ানো ছেলে! এখন আবার শূন্যে ভাসমান জলের গ্লাস! তিনি ভয়ে প্রায় স্টেশনমাস্টারকে জড়িয়ে ধরেছেন! স্টেশনমাস্টার ওঁর ভয়ের কথা বুঝতে পেরে লোকটাকে ছোট্ট একটা ধমক দিলেন, 'আঃ! ভোলা, কী করছিস এসব?'

'কেন? জল আনছি বাবু!' লোকটা নির্লিপ্ত মুখে বলে।

'এটা জল আনার একটা কায়দা হল?' ভদ্রলোকের মুখে স্পষ্ট বিরক্তি, 'কেন? কিচেনে গিয়ে জলটা নিজের হাতে করে নিয়ে এলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হত? একটু গতর নাড়াতে কি কষ্ট হয়?'

ভোলা মুখ কাঁচুমাচু করে চলে গেল। স্টেশনমাস্টার স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'ভয় পাবেন না। এসব ব্যাটাদের ম্যাজিক-ট্রিক। খুব সোজা। কিছুদিন দেখিয়ে দিলে আপনিও পারবেন।'

'পেরে আমার কাজ নেই।' তখনও ঠকঠক করে কাঁপছেন অসিতবাবু, 'আমাকে আমার ঘরে নিয়ে চলুন প্লিজ।'

'নিশ্চয়ই। আসুন।'

৩

নিজের ঘরটা দেখে বেশ ভালো লাগল অসিতবাবুর। বিরাট বিরাট জানলা দিয়ে সুন্দর আলো-বাতাস ঢোকে। মেহগনির পালঙ্কটাও চমৎকার। ভীষণ কোমল ও নরম। তার বিপরীতেই সেগুন কাঠের বিশাল আলমারি। সেখানে নিজের জামা-কাপড় সাজিয়ে রাখলেন তিনি। এক ফাঁকে টয়লেটটাও দেখে নিলেন। নাঃ, বলতেই হচ্ছে; ব্যবস্থাপনা চমৎকার! পুরোনো আমলের বাড়িতে অত্যাধুনিক টয়লেট। গিজার আছে। এমনকি একটা দুধসাদা বাথটবও রয়েছে। আস্তানাটা সত্যিই ভালো।

মনে মনে স্টেশনমাস্টারকে কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি। যদিও মনটা আবারও খুঁতখুঁত করতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে, এই ঘরটা, এই টয়লেট তিনি আগেও দেখেছেন! কিন্তু কোথায়, কবে, কেন দেখেছেন মনে পড়ছে না! মাঝে মাঝে নিজের দুর্বল স্মৃতিশক্তির জন্য আফসোস হয় অসিতবাবুর। সাধে তাঁর বৌ-মেয়ে চেঁচামেচি করে না। অতি সাধারণ জিনিসও মনে রাখতে পারেন না! বৌ-মেয়ের জন্মদিন, অ্যানিভার্সারি তো কোনওদিনই মনে থাকল না ওঁর! এমনকি মেয়ে এখন কী পড়ে, জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে পারবেন না তিনি।

এই তো, সপ্তাহ দুয়েক আগেকার কথা! তাঁর এক অফিস কলিগ সস্ত্রীক এসেছিলেন বাড়িতে। কথায় কথায় মেয়ের কথা উঠল। কলিগ ভদ্রলোক সগর্বে জানালেন, তাঁর ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। শুনে খুব খুশি হলেন অসিতবাবু। বললেন 'বেশ! বেশ! এই তো চাই! আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের মুখ উজ্জ্বল করুক; এইটুকুই তো চাওয়া।'

‘আপনার মেয়ে কী পড়ে?’ ভদ্রলোক হেসে বললেন, ‘কোন স্ট্রিমে যাওয়ার কথা ভাবছে?’

প্রশ্নটা শুনে বিপন্ন বোধ করলেন অসিতবাবু। তবু বিন্দুমাত্রও না ঘাবড়িয়ে বললেন, ‘আগে তো এইচ এস-টা পাশ করুক। তারপর দেখা যাবে।’

মেয়ে সে কথা শুনে ফের মা’কে নালিশ করল, ‘মা, বাবা আবার ভুলভাল বকছে! বলছে, এইচ এস পাশ করার পর নাকি স্ট্রিম ঠিক হবে আমার! বাবার মনেই নেই যে কিছুদিন আগেই আমাদের বাড়িতে আমার ‘মেডিক্যালে’ র‍্যাঙ্ক করার পার্টি হল!’

ভাবতে ভাবতেই আপনমনে হেসে ফেললেন অসিতবাবু। তিনি একটু ভুলো মানুষ। কিন্তু তাঁর ফ্যামিলিটি বড় সুন্দর। স্ত্রী, মেয়ে নিয়ে ভরভরন্ত সংসার। ভুলে যাওয়ার বদভ্যাস আছে বলেই মা, মেয়ে তাঁকে আগলে রাখে। মেয়ে রোজ অফিসে যাওয়ার সময় বলে, ‘আর সব যত খুশি ভুলে যাও বাবা। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথটা ভুলো না কিন্তু।’

‘না রে মা!’ তিনি হাসতে হাসতে বলেন, ‘বাড়ির পথ কি কেউ ভোলে?’

‘ভোলে।’ মেয়ে বলে, ‘অন্তত তুমি ভোলো। মনে নেই? সেবার এবাড়িতে আসার বদলে তুমি তেঁতুলপাড়ার বাড়িতে চলে গিয়েছিলে!’

তেঁতুলপাড়ার বাড়িতে একসময় অসিতবাবুরা ভাড়া থাকতেন। বেশ কয়েকবছর ছিলেন ওখানেই। পরে নিজের বাড়ি তৈরি করে অন্যপাড়ায় চলে আসেন। সবই ঠিকঠাক চলছিল। একদিন কথা নেই বার্তা নেই, অসিতবাবু ভুল করে চলে গেলেন তেঁতুলপাড়ার সেই ভাড়া বাড়িতে! যেই কলিংবেল বাজাতে যাবেন, ঠিক তখনই মনে পড়ল; এটা তো তাঁর বাড়ি নয়! এখন তো ওঁরা এখানে থাকেন না! ভাগ্যিস সময়মতন মনে পড়েছিল। নয়তো কেলেঙ্কারির একশেষ হত!

ভাবতে ভাবতেই অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। চারদিন হল বাড়িতে কোনও খবর দিতে পারেননি। কে জানে, বাড়িতে কী হচ্ছে! স্ত্রী হয়তো ঘাবড়ে গিয়ে কান্নাকাটি করছেন। মেয়ে হয়তো অস্থির হয়ে এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে! হয়তো ফোন করার চেষ্টাও করছে। ওরা তো আর জানে না যে ফোনটা অসিতবাবু হারিয়ে ফেলেছেন! হয়তো ভাবছে, বাবা এবার ফেরার পথটাই ভুলে গেল...!

আচমকা একটা গুনগুন শব্দে সংবিৎ ফিরল তাঁর! একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে পাশের ঘর থেকেই। তিনি কৌতূহলী হয়ে ঘর থেকে বেরোলেন। নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন দরজার সামনে।

একটি কিশোরী মেয়ে ঘরের ভেতরে আয়নার সামনে বসে গুনগুন করে গান গাইছে। তার কোমর ছাপিয়ে নেমে এসেছে চুলের ঢল। মেয়েটি গান গাইছে আর আপনমনে রুপোর চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। অসিতবাবু মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলেন তাকে। মেয়েটি ওঁর মেয়ের বয়েসিই হবে। খেঁদিও এরকম আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে গান গায়।

ভাবতেই বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল তাঁর। কে জানে, খেঁদি এখন কী করছে! আর পারা যাচ্ছে না। যে করেই হোক, কালকের ট্রেনটা তাঁকে ধরতেই হবে...।

‘কাকাবাবু।’

যে মেয়েটি এতক্ষণ চুল আঁচড়াচ্ছিল সে এবার ওঁর দিকে ফিরেছে। তার মিষ্টি রিনরিনে গলায় আদুরেপনা, 'আমার একটা হেল্প করবেন? কতক্ষণ ধরে চুল ঠিকমতো আঁচড়ানোর চেষ্টা করছি, কিছুতেই হচ্ছে না।'

অদম্য স্নেহের বশে এগিয়ে গেলেন অসিতবাবু, 'বলো মা, কী করতে হবে?'

'এইটা একটু ধরুন তো!'

বলতে বলতেই মেয়েটি হঠাৎ তার মুন্ডুটা খুলে ধরিয়ে দিল অসিতবাবুর হাতে!

'মু...মু...মুন্ডু...!' অসিতবাবুর মুখ থেকে কথা সরে না! ভয়ে তাঁর রক্ত হিম হয়ে গিয়েছে! কোনওমতে বললেন, 'ভূ...ভূ...ভূ-ত!'

'ন্যা-কা!' মেয়েটির মুন্ডুটি ভয়ানক খেপে গেল। কড়া ভ্রূকুটি করে বলল, 'যেন কিছুই জানেন না! এ কাজ তো আপনিও পারেন। দেখবেন?'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটির ধড়টি হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল অসিতবাবুর মাথার চুল। তিনি কিছু বোঝার আগেই পটাং করে টেনে নামাল অসিতবাবুর মাথাটা। ওঁরই হাতে মাথাটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন। এটা আপনার মুন্ডু! এবার খুশি তো!'

অসিতবাবু দেখলেন তাঁর ধড়টা দু-হাত ছড়িয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে! গলার কাছটা কাটা!

'ভূ-উ-ত! ভূ-উ-ত! ভূ-উ-উ-উ-ত!'

চিৎকার করতে করতেই কাটা কলাগাছের মতোন ধড়াস করে পড়ে গেলেন অসিতবাবু। তাঁর হাতে তখনও নিজের মুন্ডুটি ধরা!

চেঁচামেচি শুনে 'কী হল! কী হল!' করতে করতে দৌড়ে এলেন স্টেশনমাস্টার। এসে অসিতবাবুর অবস্থা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পরম মমতায় তাঁর ধড়ের সঙ্গে মুন্ডুটা জুড়ে দিতে দিতে বললেন, 'কী যে করিস তোরা! এমন ভীতু মানুষটাকে ভয় দেখানোর কোনও মানে হয়!'

মেয়েটি ততক্ষণে নিজের মুন্ডুটি জুড়ে নিয়েছে, 'ভূতের আবার ভয় কী! ও তো আমাদের মতোই একজন!'

এখানেই তো যত গণ্ডগোল। স্টেশনমাস্টারের অসিতবাবুর জন্য দুঃখবোধ হয়। লোকটা বড্ড ভুলো। ওঁর মনেই নেই যে আজ থেকে চারদিন আগে চলন্ত জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস ধরতে গিয়ে স্লিপ করে পড়ে গিয়েছিলেন রেললাইনে! ট্রেনের চাকা দু-টুকরো করে কেটে দিয়ে চলে গিয়েছিল তাঁকে। ওঁর মনে নেই যে, চারদিন আগেই মারা গিয়েছেন তিনি। শুধু মনে আছে, বাড়ির লোকেরা তাঁর প্রতীক্ষায় বসে আছে। সেই সংসারের মায়ায়, স্ত্রী-কন্যার টানেই প্রতিদিন তিনি চেষ্টা করেন ট্রেনটা ধরার। কিন্তু কোনওদিনই ট্রেন ধরা হয় না। আর কখনও হবে না! জীবনের ট্রেন তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। তবু হার মানেন না অসিতবাবু। রোজ চলন্ত ট্রেনের পেছন পেছন ছোটেন! আর ব্যর্থ হন। আর প্রত্যেকদিন স্টেশনমাস্টার ওঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনেন জাদুকর সাহেবের বাড়িতে! এই বাড়িতেই সব ট্রেনে কাটা পড়া আত্মাদের বসতি। দুর্ভাগ্যবশত চারদিন আগে থেকেই এই বাড়ি তাঁর

স্থায়ী ঠিকানা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সকালে উঠেই আবার আগের দিনের কথা সব ভুলে যান অসিতবাবু। ফের চলে যান ট্রেন ধরতে।

স্টেশনমাস্টারের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ওঁর আর দোষ কী! তিনি নিজেও তো দেহান্তের পর স্টেশনের মায়া ছাড়তে পারেননি। রোজ সকালে স্টেশনে গিয়ে বসে থাকেন, আর অসিতবাবুর মতোন হতভাগ্যদের নিয়ে আসেন জাদুকর সাহেবের বাড়িতে। এখানে ওরা আশ্রয় পায়! মনের আনন্দে থাকে!

তিনি পরম মমতায় তাকালেন অসিতবাবুর দিকে। প্রাণের টান, বড় টান! সব কিছু ভুলে গেলেও সেই টানটা ভোলেননি তিনি। ভুলো মানুষটা আবার সেই টানেই কাল দৌড়বে ট্রেন ধরতে। তারপর পরশু...পরশুর পর তরশু...তারপর আবার...আবার...আবার!

—

মেগালোম্যানিয়াক

১

'উই ক্যান ইজিলি ফরগিভ আ চাইল্ড, হু ইজ অ্যাফরেইড অফ দ্য ডার্ক; দ্য রিয়েল ট্র্যাজেডি অব লাইফ ইজ হোয়েন মেন আর অ্যাফরেইড অফ দ্য লাইট।'

দার্শনিক প্লেটোর বিখ্যাত উক্তিটি হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল মানুষটার। এক চিলতে আলো ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে সরলরেখায় এসে পড়ছে তাঁর চোখের ওপরে। তিনি একটু বিরক্ত দৃষ্টিতেই আলোর উৎসের দিকে তাকালেন। এই মুহূর্তে কোনওরকম আলো অভিপ্রেত নয়। একটু অন্ধকার প্রয়োজন ওঁর। অথচ এই সামান্য নরম রশ্মিটুকু তাঁকে বড়ই বিরক্ত করছে।

অন্ধকারের একটা অদ্ভুত নেশা আছে। আলোর তীব্রতার পাশে অন্ধকারের পেলব যৌন আবেদন যেন আরও বেশি আকর্ষণীয়। এমন মায়াবী আবেশে জড়িয়ে ধরে, যেন রহস্যময়ী প্রেমিকা! তার প্রেমে চাপল্য নেই, তীব্রতা নেই। বরং রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য প্রশান্তি।

অর্ধ-নিমীলিত চোখে নিজের আশপাশটা অন্ধকারের মধ্যেই দেখে নেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। অন্ধকারে সব কিছুই কেমন যেন অদ্ভুত দেখায়! এই বহু পরিচিত ঘরটাও আজ অচেনা লাগছে! দেওয়ালের ঝকঝকে ব্লকবাস্টার ফিল্মের বাঁধানো পোস্টারগুলোও অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আছে। তার উল্টোদিকের কাচের আলমারিতে থরে থরে ট্রফি সাজানো! কিন্তু এই আঁধার তাদের সমস্ত গৌরব কালো রং দিয়ে লেপে পুঁছে দিয়েছে। এই মুহূর্তে অন্ধকার আর বিস্মৃতি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নেই। আর নিতান্তই যদি কিছু থেকে থাকে; তবে সে নৈঃশব্দ্য!

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এমন নৈঃশব্দ্য আর অন্ধকার বিগত দু-দশক ধরে তাঁর বড়ই গা সওয়া হয়ে গিয়েছে! এসেছিলেন এই নীরবতার হাত ধরেই। কিন্তু তারপর চতুর্দিকে আলো, আর শব্দের বাহুল্যে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম যখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিলেন তখনও তৎকালীন তারকাদের আর তথাকথিত বিখ্যাত প্রযোজকদের নীরব উপেক্ষা পেতে পেতে একসময় নিজেকে বেমানান ও পরিত্যক্ত বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু থেমে থাকেননি তিনি। সাধারণ সেট ডেকোরেটরের কাজ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে এক বিখ্যাত পরিচালকের এ ডি, তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পর্যন্ত হয়েছেন। স্বপ্ন দেখতেন, নিজের ফিল্ম বানানোর। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনতে গুনতে ভেবেছিলেন, 'একদিন এরাই আমার দরজায় লাইন দেবে!'

বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। সুযোগ যখন এল, তখন তার সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্রও পিছ-পা হননি তিনি। বড় হতে গেলে যেমন অনেক ভালো কাজ করতে হয়, তেমন অনেক খারাপ কাজও করা আবশ্যিক। তিনি দুটোই সমান তালে করেছিলেন। ফলস্বরূপ ভাগ্যলক্ষ্মী একেবারে বরমালা নিয়ে এসে তাঁর বাড়ির দোরগোড়ায় হাজির! একের পর এক হিট! বক্স অফিসের রেকর্ড ভেঙেচুরে

একশা! লাইমলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল! চতুর্দিকে হই হই রব! সমালোচকদের প্রশস্তি, ভক্তদের চিৎকার, সিনেমাহলের বিরাট দালানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হওয়া করতালির প্রচণ্ড আওয়াজ! গোটা অডিটোরিয়াম কাঁপছে কয়েক হাজার পায়রার ডানা ঝাপ্টে উড়ে বেড়ানোর শব্দে! ব্লকবাস্টার! ব্লকবাস্টার! ব্লকবাস্টার!

আচমকা তাঁর কপালে অসন্তোষের ভাঁজ পড়ল। কুড়ি বছর হয়ে গেল, সেই পায়রা ওড়ার আওয়াজ আর শোনেননি তো! 'ব্লকবাস্টার' থেকে কবে যে 'ফ্লপমাস্টার' হয়ে গেলেন, তা নিজেও বুঝতে পারেননি। পরপর কয়েকটা ছবি বক্স-অফিস কাঁপানোর পরেই দুনিয়াটা বড় বেশি রঙিন মনে হয়েছিল তাঁর। মনে হয়েছিল, এই গোটা পৃথিবীটাই তাঁর করায়ত্ত! গোটা মানবজাতি তাঁর গুণগান গাইতে বাধ্য, তাঁর সৃষ্টির স্তুতি করতে বাধ্য! তখন ব্যারিটোন কণ্ঠস্বরের ধমকের চোটে কাঁপত গোটা স্টুডিও। তাঁর ফ্ল্যাটে অভিসারে আসত সুন্দরীরা! তাদের মধ্যে কয়েকজনকে জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রেকটা তিনিই দিয়েছেন। তারপর 'স্ট্রাগলিং অ্যাকট্রেসের' তকমা ছাড়িয়ে তারা 'স্টারের' পর্যায়ে চলে গিয়েছে। তৃতীয়তম জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পরে নেশাজড়িত কণ্ঠস্বরে মিডিয়ার সামনে বলেছিলেন, 'হোয়াট টু সে! আই অ্যাম দ্য গড!'

আই অ্যাম দ্য গড!...আই অ্যাম দ্য গড!...বাক্যগুলো শূন্য অন্ধকার ঘরে যেন ব্যঙ্গ করতে করতে ফিরে এল! একটা সময় পর্যন্ত তিনি যত ফিল্ম বানিয়েছেন, জনতা হই হই করে দেখেছে। আড়ালে-আবডালে অবশ্য নিন্দুকেরা 'মেগালোম্যানিয়াক' বলতে ছাড়েনি, এমনকি তার নিজের স্ত্রী সোমদত্তাও বলেছিলেন, 'তুমি আসলে রাংতায় মোড়া একটা জোকার! একটা দুশ্চরিত্র, স্কামবাগ!' কিন্তু নিজের ঈশ্বরত্বে এতটাই বিশ্বাস ছিল যে কারোর কোনও কথা শোনেননি তিনি। সোমদত্তাকে প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। প্রবল দম্ভের সামনে হেরে গিয়েছিল প্রেম, বন্ধুত্ব, মমতা, ভালোবাসা; জীবনের ছোট ছোট সুখের মুহূর্তগুলো!

কিন্তু তারপরেই ফ্লপ! একটা নয়, দুটো নয়; পরপর ফ্লপ! একের পর এক শোচনীয় পরাজয়! বক্স অফিসে বারবার মুখ থুবড়ে পড়ল তাঁর বিগ বাজেট ও বহু নক্ষত্র খচিত ফিল্মগুলো। বন্ধু প্রোডিউসার বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'ফিল্মের ধারা এখন পাল্টাচ্ছে। মানুষ এখন আর সম্পর্কের জটিলতা আর কেমিস্ট্রি সর্বস্ব ফিল্ম নিচ্ছে না। দেখছেন না, সবাই এখন অন্যধরনের ফিল্ম বানাচ্ছে!'

তিনি নেশাজড়িত বড় বড় লাল চোখে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে বলেছিলেন, 'সবার সঙ্গে আমার তুলনা করছেন?'

প্রোডিউসার একটু বিব্রত, 'তা নয়। কিন্তু বাস্তবটা তো মেনে নিতে হবে। মানুষ এখন ফিল্মে পুরোপুরি এন্টারটেইনমেন্ট খুঁজছে। সামথিং থ্রিলিং! সামথিং ডিফারেন্ট—!'

কথাটা শুনেই প্রায় গর্জন করে উঠেছিলেন তিনি, 'হো-য়া-ট! আমাকে এখন শিং ভেঙে বাছুরদের দলে ঢুকতে হবে? আমি আধুনিক হিট বাংলা সিনেমার জনক! আমিই প্রথম ফিল্মের ধারা চেঞ্জ করেছি! আই অ্যাম দ্য ওয়ান অ্যান্ড ওনলি! এখন আমায় ভাবতে হবে যে কতগুলো 'ডাম্ব-হেড'

পাব্লিক কী চায়! ওসব বস্তা-পচা থ্রিলারের পেছনে দৌড়তে পারব না। আমি শিল্পী, আপনাদের মতো বেনে নই। আই অ্যাম দ্য গড! হু আর ইউ? আ মেয়ার ফাকিং বিজনেসম্যান!'

বলাই বাহুল্য, সেই প্রোডিউসারের সঙ্গে আর বন্ধুত্ব ছিল না তাঁর। কিন্তু তাতেও অহঙ্কার ও মেজাজ কমেনি। ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন নতুন হিট পরিচালকদের আগমনে আস্তে আস্তে প্রযোজকরাও সরে গিয়েছেন তাঁর পাশ থেকে। হাতে যত কাজের সংখ্যা কমেছে, ততই মদ্যপানের মাত্রা বেড়েছে। আর বেড়েছে স্ক্যান্ডালের বহর! নিজের গার্লফ্রেন্ড, মডেল-কাম-অ্যাকট্রেস, মধুপর্ণার জন্মদিনের পার্টিতে আচমকা রেগে গিয়ে সর্বসমক্ষে একটা গোটা হুইস্কির বোতল ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর মাথায় ও মুখে। অভিযোগ, মধুপর্ণা নাকি তাঁকে যথেষ্ট মনোযোগ দেননি! মধুপর্ণা অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ফুঁসে উঠে বলেছিলেন, 'ইউ আর সিক! তুমি একটা আস্ত মেগালোম্যানিয়াক সাইকো! নিজেকে কী ভাবো? গড? তুমি একটা ফসিল! স্রেফ ফসিল; আর কিচ্ছু নও! ইউ আর ফিনিশড!...জাস্ট ফিনিশড!'

'অ্যাম আই?'

অন্ধকারের মধ্যে বসে নিজেকেই নিজে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি। সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি আর তাঁর কোনও অস্তিত্ব নেই এ পৃথিবীতে?

তাহলে অন্ধকারই কি তাঁর শেষ আশ্রয়! নাঃ, হতে পারে না। কারণ তিনি এখনও অমিত শক্তিশালী। চাইলে ছিঁড়ে দিতে পারেন সমস্ত অন্ধকার! চাইলেই আলোকিত করে দিতে পারেন গোটা পৃথিবীটাকে। তাঁর মুখ থেকেই স্টুডিও বারবার শুনে এসেছে সেই শব্দ! লা-ই-ট!

টানটান ঋজু লম্বা দেহটা উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারের মধ্যেই হাসলেন তিনি। পরক্ষণেই তাঁর গমগমে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল অন্ধকার ঘরে!

'লেট দেয়ার বি লাইট!'

২

স্টুডিওর সমস্ত আলো একসঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সোনালি আলোর বন্যায় ভেসে গেল গোটা ফ্লোর! সুসজ্জিত সেট ঝলমলিয়ে উঠেছে। এখন কোথাও কোনও অন্ধকার নেই। বরং চতুর্দিকে শুধু আলোর বিচ্ছুরণ!

লাইটম্যান গিরীশ আপনমনেই আলো ঠিক করতে করতে বিড়বিড় করে, 'শা-লা, কার মুখ দেখে আজ সকালে উঠেছি! গোটা দিন ওই পাগলটার সাথে কাজ করতে হবে!'

ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডিওপি বা সিনেমাটোগ্রাফার, সহদেব মালি ডিজিটাল মুভি ক্যামেরাগুলো চেক করছিল। হোয়াইট ব্যালান্সিং, ফ্রেম আর ফোকাস রেডি করতে করতে রুক্ষ চোখে গিরীশের দিকে তাকায় সে। মেজাজ তারও তিরিক্ষি হয়ে আছে। বিরক্তস্বরে বলে, 'আ-স্তে! রাগের মাথায় ক্যামেরাটা বরবাদ করিস না! যেটার মাথার ওপরে উঠে তুই লাফাচ্ছিস, সেটার দাম জানিস! ভাঙলে কি তোর বাপ দাম দিতে আসবে?'

গিরীশ মুখভঙ্গি করেছে, 'যত দামি ক্যামেরা দিয়েই ছবি তোল না কেন; শেষ পর্যন্ত ও মাল যাবে ওই গাধার গাঁ...!'

'আঃ!'

সে বলতে যাচ্ছিল যে 'শেষ পর্যন্ত ফিল্মটা ফ্লপই হবে' কিন্তু তার আগেই সহদেব বিরক্তিসূচক শব্দে তাকে থামিয়ে দিল। তারপর ড্রোন-অপারেটর নিখিলের দিকে তাকিয়ে একটু কৌতূহলী ভাবেই জানতে চায়, 'আজকে ড্রোন-শট আছে নাকি?'

'রাম জানে!' ড্রোন-অপারেটরের নির্লিপ্ত জবাব, 'তুমি মামা ডিওপি—ডাইরেক্টর অব ফোটোগ্রাফি। তুমি যদি না জানো, তবে কে জানবে?'

'মানে!' সহদেব বিস্মিত, 'ড্রোন শট না থাকলে তুই এখানে কী করছিস?'

নিখিল জব্বর হাই তুলে জানায়, 'হাপু গাইছি! সাহেব বলেছেন, উনি নাকি লাস্ট মিনিটে স্ক্রিপ্ট চেঞ্জ করতে পারেন। তাই এসেছি। শট থাকলে ভালো। না থাকলে আরও ভালো। আমার ভাড়াটা ঠিকঠাক পেলেই হল।'

'হ্যাত্তেরি!' ডিওপি বিরক্তিসূচক শব্দ করে বলে, 'আসলে শুটিংটা হচ্ছে কীসের? স্ক্রিপ্ট-রাইটার কোথায়? অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কারা? এ ডি?'

নিখিল চুপ করে থাকে। এ ব্যাপারে সেও কিছু জানে না। শুধু তাকে বলা হয়েছে মাত্র তিনদিনের জন্য ফ্লোরে উপস্থিত থাকতে। তার জন্য যত টাকা দরকার, তার কিছুটা অগ্রিমও পেয়ে গিয়েছে। সেইজন্য সকাল থেকেই এসে বসে আছে। কিন্তু কেন, কী বৃত্তান্ত; কিছুই তার জানা নেই।

সহদেব নিখিলের অবস্থা কিছুটা বুঝতে পারে। কারণ তারও দশা খানিকটা একই। তার ক্যামেরার দাম সে তিনদিনের জন্য পেয়ে গিয়েছে। বাকিটা শুটিঙের শেষে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কাস্টিং বা স্টোরির ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। সচরাচর ফিল্ম শুট হওয়ার আগে ডিওপিকে স্ক্রিন-প্লের একটা কপি দিয়ে দেওয়া হয়। যাতে সে বুঝতে পারে ক'টা ক্যামেরা লাগবে, কোথায় ট্রলি লাগবে কিংবা কোথায় ড্রোন। ক্যামেরা প্যান করবে, টিল্ট হবে; সবই মোটামুটি বোঝা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে এসব কিছুই হয়নি! বেচারির পুরো নিধিরাম সর্দারের দশা! ক্রু'-দের ডাকা দরকার কি না তাও বুঝতে পারছে না! তাই তাদের 'স্ট্যান্ড বাই'-এ রেখেছে। ফোন করলেই আধঘণ্টার মধ্যে এসে যাবে তারা।

'এই বিলুপ্ত ডাইনোসোরের পাল্লায় পড়াই শালা পনৌতি!' গিরীশ লাইট সেট করা শেষ করে এবার লাইট রিফ্লেক্টর বা বাউন্সারগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেছে, 'এক ছোকরা এসে আমায় মোটামুটি লাইট কীরকম হবে বুঝিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু ওখানেই শেষ। সে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর না স্ক্রিন-প্লে রাইটার, কিছুই বুঝলাম না'।

'ওটা অসিত।' সহদেব একটু আস্তে আস্তে বলে, 'সাহেবের ল্যাংবোট কাম সাউন্ড রেকর্ডিস্ট! কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কী হচ্ছে বল তো? এরকম শুটিং আগে কখনও দেখিনি। এখানে আমরা শুধু তিনজন আছি। তুই, আমি আর নিখিল। এখন শুনলাম অসিতও আছে। সব মিলিয়ে চারজন! আর কেউ নেই!

অ্যাকটর-অ্যাকট্রেস, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, এডিটর, রাইটার, মেক-আপ ম্যান; কেউ না! তাহলে বেসিক্যালি এখানে হচ্ছেটা কী? প্রোডিউসই বা কে করছে?'

গিরীশ নির্লিপ্ত মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার যত উৎসাহ, সবটাই পেমেন্টের ব্যাপারে। বাকি কোনও বিষয়ে তার কোনও কৌতূহল নেই। এমনকি যে মানুষটিকে সে 'ডাইনোসোর' বলে গালাগালি দিচ্ছে, তিনি যে কোনও একসময়ে ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম নামকরা পরিচালক ছিলেন, সে বিষয়েও তার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। এই ইন্ডাস্ট্রির এমনই নিয়ম। যতক্ষণ ব্যাগে হিট আর টাকা উপচে পড়ছে, ততক্ষণই সম্মান! ব্যাগ খালি হয়ে গেলে এখানে কেউ কাউকে চেনে না! পাত্তাও দেয় না।

কিন্তু সহদেব চাইলেও মানুষটাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তার বাবা একসময়ে এই মানুষটির সঙ্গে প্রচুর কাজ করেছেন। ওঁর বেশির ভাগ ব্লকবাস্টার ফিল্মেরই সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন সহদেবের বাবা সুধীর মালি। তাঁর মুখেই শুনেছে, মানুষটা একটু মেজাজি আর অহংকারি বটে, কিন্তু জিনিয়াস। ক্যামেরা, লাইট, সাউন্ড এমনকি এডিটিঙেও মাস্টার লোক। সুধীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, 'কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির চড়া আলোয় অনেকেরই মাথা ঘুরে যায়। সাহেবেরও গেল! নয়তো তাঁর এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাওয়ার কথা নয়!'

সহদেব একটু আত্মমগ্নদৃষ্টিতে আলোয় উদ্ভাসিত সেটের দিকে তাকায়। মাত্র চার মাস আগেই বাবা মারা গিয়েছেন। বেঁচে থাকলে জানতে পারতেন যে তাঁর 'সাহেব' ফের ফ্লোরে আসতে চলেছেন। এ খবরে নিশ্চয়ই খুশি হতেন সুধীর। তিনি ওই মানুষটার প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন। সহদেব একরকম বাবার কথা ভেবেই কাজটা করতে রাজি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ভুল করেছে। এখানে আদৌ কোনও শুটিং হবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে তার।

সে ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকায়। কলটাইম দশটায় ছিল। সাড়ে বারোটা এর মধ্যেই বেজে গিয়েছে। অথচ ফ্লোর এখনও শুনশান! সহদেব মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে। আর বড়জোর আধঘণ্টা দেখবে। তার মধ্যে যদি আর কেউ না এসে পৌঁছয়, তবে ধরে নিতে হবে এটা ওই আধপাগল 'মেগালোম্যানিয়াকের' খামখেয়ালিপনা! আর অপেক্ষা করবে না ও। পাততাড়ি গুটিয়ে সোজা কেটে পড়াই ভালো। গিরীশ ঠিকই বলেছে। ও লোকটার মাথার কোনও ঠিক নেই!

আই অ্যাম দ্য গড! হুঃ!

৩

'স্যার—স্যার! ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন—!'

অনেকক্ষণ ধরেই একটা সিগারেট খাওয়ার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল সহদেবের। ও ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেলেই একটু নিকোটিনের ধোঁয়া চায়। এখন অবসর পেয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বাইরের দিকে গেল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে ক্যামেরা নিয়ে শুধু জাগলিংই করে চলেছে বেচারি। অথচ কী করতে হবে,

কেমন করে করতে হবে, ড্রোনটা কোন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে লাগবে, কিছুই জানা নেই! এভাবে শুটিং করা যায়! বিরক্তিকর!

কিন্তু বাইরে আসতেই তার চক্ষু চড়কগাছ! এ কী! এখানে তো রিপোর্টাররা এসে হাজির! সহদেব সবে ঠোঁটে সিগারেটটা গুঁজেছিল। কিন্তু হতবিহ্বল হয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করতে ভুলে গেল সে! বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল, বাইরে প্রেসের লোকেরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! তাদের কারোর হাতে 'বুম', কারোর কাঁধে ক্যামেরা! কেউ বা রেকর্ডারে বাইট নিতে ব্যস্ত। আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—

সেই এক ও অদ্বিতীয় তিনি! সহদেবের চিনতে ভুল হল না। ওনাকে সে বহুবার টিভিতে বা কাগজে দেখেছে। সেই লম্বা ঋজু দেহ, খড়গের মতো নাক, দু-চোখের শানিত দৃষ্টিতে যেন মূর্তিমান দম্ভ এবং তীব্র অসন্তোষের ছোঁয়া। কণ্ঠস্বর এখনও গম্ভীর ও কম্যান্ডিং। পার্থক্য একটাই। মাথার চুলগুলো এখন সব সাদা হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া বিশেষ কোনও পরিবর্তন নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কী? উনি প্রেসকে ডেকেছেন!

'দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে আবার ফ্লোরে ফিরলেন। কেমন লাগছে?'

এক মহিলা সাংবাদিকের প্রশ্নে ডানদিকের ভুরুটা সামান্য তুলে তাকালেন তিনি, 'কেমন লাগার কথা? ব্রাইট অ্যাজ আ নিউ পেনি।'

'তাহলে স্বীকার করছেন যে কুড়ি বছর ধরে আপনি 'ওল্ড পেনি' ছিলেন?'

সহদেব প্রমাদ গুনল! সর্বনাশ! প্রেসের লোকেরা এবার একটা ডেডলি বাউন্সার ছুড়ে দিয়েছে! সোজাসুজি ভীমরুলের চাকে ঢিল! একবার এক প্রেস কনফারেন্সে এমনই একটি প্রশ্ন করার জন্য এক সাংবাদিককে সপাট এক ঘুসিতে ফ্ল্যাট করে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। এবার না জানি কী করবেন!

'নো। গোল্ড পেনি ছিলাম।' এবার কিন্তু আর 'আপারকাট' ধেয়ে এল না। বরং স্মিত হাসলেন তিনি, 'ওল্ড ইজ গোল্ড; জানেন তো?'

'এতদিন ধরে আপনি মানুষের সম্পর্কের জটিলতা, ভালোবাসা, রিরংসা নিয়েই ফিল্ম করেছেন।' অন্য একজন সাংবাদিক জানতে চাইল, 'এবার আপনার ফিল্মের সাবজেক্ট কী?'

'সামথিং ডিফারেন্ট...সামথিং থ্রিলিং...অ্যান্ড অফকোর্স আ ব্লকবাস্টার।' সপাটে উত্তর এল, 'এবারের সাবজেক্ট আমি স্বয়ং!'

সহদেব স্পষ্ট দেখতে পেল, সাংবাদিকদের চোয়াল প্রায় আস্ত প্রাকৃতিক গুহার মতো হাঁ হয়ে ঝুলে পড়ল। লোকটা বলে কী! এবারের ফিল্মের সাবজেক্ট স্বয়ং উনিই! মানে?

সে লক্ষ করেনি, তার পেছন পেছন কখন যেন গিরীশও এসে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ সব চুপচাপ দেখছিল। এবার সহদেবের কানের কাছে ফিসফিস করে মন্তব্য করল, 'লাও ঠ্যালা! এবারের সাবজেক্ট ডাইনোসোর! উনি জুরাসিক পার্ক বানাতে চলেছেন।'

সাংবাদিকেরা আর কিছু বলার আগেই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন তিনি, 'এবার ফুল লেংথ ফিল্ম নয়, একটা ডকুমেন্টারি বানাচ্ছি। সেটা অবশ্য আমার ওপরই। অর্থাৎ আমারই ডকুমেন্টারি।

আমার জীবনের ওপর বেস করে। আ ব্লকবাস্টার ইনডিড।'

'অ্যাঁ!' এবার সাংবাদিকরাও নিজেদের বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না। একজন পরিচালক নিজের ওপরই ডকুমেন্টারি বানাচ্ছেন! এ আবার কী কথা! একজন ফিল্ম ডিরেক্টর অন্য আরেকজন সিনিয়র ফিল্ম ডিরেক্টরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁদের ডকুমেন্টারি বানিয়েছেন, এমন নিদর্শন প্রচুর রয়েছে। কিন্তু কেউ নিজেই নিজের ওপর তথ্যচিত্র বানাচ্ছেন; এমন ঘটনা বোধহয় তারা জীবনেও শোনেনি! একজন কোনওমতে ঢোঁক গিলে প্রশ্ন করল, 'আপনি নিজের ওপরে তথ্যচিত্র নিজেই বানাচ্ছেন স্যার! এমন কাজ তো স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও করেননি!'

'তিনি করেননি, কিন্তু আমি করছি।' মানুষটি জবাব দিলেন, 'সবাইকে সব কিছু করতে হবে এমন কোনও মানে নেই। আমি এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম মাইলস্টোন। অতএব একটা ডকুমেন্টারি আমি অবশ্যই ডিজার্ভ করি। তা ছাড়া স্বয়ং কবিগুরু যদি নিজেই নিজের জন্মদিনের ও মৃত্যুদিনের গান এবং কবিতা লিখে যেতে পারেন, তবে আমি কি নিজের ওপর একটা ডকুমেন্টারি বানাতে পারি না?'

মহান পরিচালকের এই বিবৃতির সামনে আর কী বলার থাকে! সাংবাদিকরা ঘাবড়ে গিয়ে পরস্পরের মুখ দেখছে। সম্ভবত এটা 'মেগালোম্যানিয়ার' চূড়ান্ত নিদর্শন! 'নার্সিসিজমের', ও বটে। সহদেবের মনে হল, শুটিং ফ্লোর নয়, এই লোকটির রাঁচিতে থাকা উচিত।

'এখানে আপনার সহ-অভিনেতারা কারা?' একজন সংবিৎ ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করল, 'মানে আপনার ইন্টারভিউ কে নেবে? কিংবা আপনার রোলে কে—!'

প্রশ্নটা শেষ হওয়ার আগেই উত্তর এল, 'কেউ নেই। গোটা ফিল্মে আমি একাই অভিনয় করব! নিজেই নিজের ইন্টারভিউ নেব। সবক'টি চরিত্রে আমিই অভিনয় করছি।'

'আপনার এ তথ্যচিত্রের প্রোডিউসার কে?'

এমনিতেই সাংবাদিকদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যেই সাহস করে একজন প্রশ্নটা করেই ফেলেছে। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'প্রোডিউসারও নিঃসন্দেহে আমিই!'

'আপনি! আপনিই ডিরেক্টর, আপনিই অ্যাক্টর, আপনিই প্রোডিউসার!'

'শুধু তাই নয়, আমিই সেট ডেকোরেটর-প্রপমাস্টার, আমিই আমার মেক-আপম্যান, আমিই স্ক্রিপ্ট-স্ক্রিন প্লে লিখেছি এবং আমিই আমার এডিটর। ইনফ্যাক্ট বলতে পারেন, আমিই হচ্ছি সর্বময়কর্তা! অল ইন অল!' এবার ভদ্রলোক সজোরে হেসে উঠলেন, 'হোয়াট টু সে! ইয়েস! আই অ্যাম দ্য গড!'

বলতে বলতেই স্তম্ভিত বিমূঢ় সাংবাদিকদের ওখানেই ছেড়ে তিনি এগিয়ে এলেন সহদেবের দিকে। তার ঠোঁটে তখনও ঝুলছে সিগারেটের স্টিক। মানুষটা ফস করে নিজের লাইটার জ্বালিয়ে অগ্নিসংযোগ করলেন তার সিগারেটে। তারপর ফিসফিস করে বললেন,

'লেট দেয়ার বি লাইট!'

৪

‘ভাই, এটা ব্লকবাস্টার নয়, ডিজাস্টার হতে চলেছে!’

ড্রোন-অপারেটর নিখিল প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে, ‘কুড়ি বছর আগে যে লোকটাকে ইন্ডাস্ট্রি ডাম্প করে দিয়েছে, তার জীবনের একঘেয়ে কাঁদুনি কে শুনবে বলো তো! আর লোকটা সত্যিই পাগল! কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না! এক একটা ড্রোন শট নিতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে আমার!’

সহদেব তার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারও মনের প্রায় একই অবস্থা। স্বঘোষিত মহান ও তালেবর পরিচালকের ডকু-ফিচারের ঠ্যালায় তাদের সবারই নাভিশ্বাস উঠছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, উনি কী চান, তা নিজেই জানেন না! শুরুতেই ঘোষণা করেছেন ক্যামেরা ক্রুয়ের দরকার নেই। অথচ মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর স্ক্রিপ্ট পালটে যাচ্ছে। কাজ শুরু হওয়ার আগে ওরা জানত শুটিংটা ইনডোরেই হবে। এখন দেখছে আউটডোরের শেষ নেই! কখনও তাঁর মনে হচ্ছে, ছোটবেলায় যে পুকুরের জলে সাঁতার কাটতেন সেটাকেও দেখাতে হবে! আবার কখনও বা মনে হচ্ছে, বটানিক্যাল গার্ডেনে যে বিরাট গাছটার তলায় বসে তিনি আর সোমদত্তা প্রেম করতেন সেটা এই তথ্যচিত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট! কারণ সোমদত্তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে না উঠলে তিনি নাকি জানতেই পারতেন না যে ‘সম্পর্ক’ জিনিসটা অত্যন্ত জটিল। পুকুর তাঁকে গভীর হতে শিখিয়েছিল, সোমদত্তা জটিলতা শিখিয়েছিলেন, আর তৎকালীন প্রখ্যাত অভিনেত্রী অধীরা তাঁকে পরকীয়া প্রেমের অর্থ শিখিয়েছিলেন। এরকম বহু খুঁটিনাটি শিক্ষা তাঁর ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে যাচ্ছে, আর স্ক্রিপ্ট, লোকেশন সঙ্গে সঙ্গেই বদলে যাচ্ছে। তার ওপর অজস্র বায়নাক্কা! কথা নেই বার্তা নেই, আচমকা বলে বসলেন, ‘আঃ সহদেব! এখানে ট্রলি নয়, ক্রেন শট লাগবে।’ বেচারি সহদেব হাঁই হাঁই করে দৌড়ল ক্রেনের খোঁজে। একরকম প্রায় তাকে বাঁদর নাচ নাচিয়েই ছাড়ছেন পরিচালক।

একবার-দুবার তারা একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মহান পরিচালক বিরক্ত হয়ে প্রায় গর্জনই করে উঠেছেন, ‘ইমপ্রোভাইজেশন বোঝো? ক্রিয়েটিভিটি বোঝো? এসব প্ল্যান্ড ওয়েতে আসে না; অন দ্য স্পট হয়! একজন মজুর বড়জোর সাজিয়ে-গুছিয়ে ইঁট, পাথর বয়ে আনতে পারে, কিন্তু তাজমহল তৈরি করার জন্য একখানা অনবদ্য ব্রেইন লাগে; যে মস্তিষ্কটি একজন শিল্পীর। আমি শিল্পী, লেম্যান নই; বুঝেছ?’

‘বুঝলাম!’ গিরীশ গগর করে ওঠে, ‘আপনি তাজমহল তৈরি করছেন!’

গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে ওরা ভদ্রলোকের সঙ্গে কাজ করছে। আর এই আটচল্লিশ ঘণ্টায় যতখানি হতাশ হওয়া সম্ভব, ঠিক ততটাই হয়ে বসে আছে। কিছুতেই বুঝতে পারছে না যে আসলে ডকুমেন্টারিটা ঠিক কীসের ওপর হচ্ছে! পরিচালক একেবারে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করেছেন! সব ক্ষেত্রেই তাঁর নাকি ডিটেলিং চাই! সব মিলিয়ে ব্যাপারটা প্রায় সাত কাণ্ড রামায়ণই হতে চলেছে সম্ভবত। কিন্তু এই ফিল্ম দেখবে কে? তিনি গোটা স্ক্রিপ্টেই খালি ‘আমি এই....আমি সেই’ করে চলেছেন! এত ‘আমি আমি’র ঠ্যালায় পাব্লিক বিরক্ত তো হবেই, উপরন্তু যে পরিচালককে নতুন প্রজন্ম চেনেই না, যাকে দর্শক প্রায় ভুলতেই বসেছে, তিনি মেলায় গিয়ে সাবুর পাঁপড় খেতে ভালোবাসতেন না চিনেবাদামভাজা, তা নিয়ে কার মাথাব্যথা আছে! অথচ সে কথা বলার উপায়

নেই। তাহলেই তিনি বলবেন, 'বুঝবে না! সবটাই মোটিভেশন! যে মানুষটার কাছে একসময় মেলায় যাওয়াটাই প্রায় বিদেশ ভ্রমণের মতো ছিল, সে-ই যখন বিদেশি চলচ্চিত্রোৎসবে নিজের ফিল্ম নিয়ে পাড়ি দিল; তখন তার মনের অবস্থাটা বোঝো! সে মানুষটা তখন যে বিশালত্ব নিজের মধ্যে অনুভব করেছিল, সেটাই তো আগামী প্রজন্মকে মোটিভেট করবে।'

তবে একটা কথা মানতেই হবে। লোকটা অসাধারণ অভিনেতা। গোটা স্ক্রিপ্টটাকে অনেকটা একাঙ্ক নাটকের মতো করে সাজিয়েছেন। একাই সবক'টা চরিত্রের কথা এমন অবলীলায় বলে চলেছেন, যেন এই স্ক্রিপ্ট বহু বছর ধরে, বহু রাত জেগে জেগে প্র্যাকটিস করেছেন। বিশেষ করে সোমদত্তা আর তাঁর প্রেম ও দাম্পত্যজীবনের সমাপ্তির অংশটা এমন ফাটিয়ে অভিনয় করলেন, যে তিনি 'কাট' বলার পরেও সহদেব নির্বাক হয়ে তাকিয়েছিল ওঁর দিকে। তার খেয়ালই ছিল না যে ক্যামেরা তখনও চলছে! কী দুরন্ত অভিনয়, কী অদ্ভুত এক্সপ্রেশন! সহদেব অবাক হয়ে দেখছিল আর ভাবছিল, উনি পরিচালক না হয়ে অভিনেতা হলে এতদিনে অনেকের ভাত মারতেন। মনে পড়ে গেল বাবার বলা শব্দটা। 'জিনিয়াস!'

শটটা দিয়ে যখন তিনি এডিটিঙে বসলেন, তখন সহদেব গুটিগুটি পায়ে তাঁর কাছে গেল। মনিটরে তখন তাঁরই আবেগময় মুখের বেদনার্ত অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে। পরিচালক আলগোছে সেদিকে দেখতে দেখতেই বলে উঠলেন; 'ব্রিলিয়ান্ট! পারফেক্ট টাইমিঙে জুম ইন, জুম আউট করেছ। একদম ফ্ল'লেস; কোনও জার্ক নেই।'

প্রশংসা পেয়ে এই প্রথম একটু হাসল সহদেব। সে কী বলবে বুঝতে পারে না। একটু ইতস্তত করে বলল, 'ডলি শটটা আমার বাবা নিজের হাতে শিখিয়েছিলেন!'

'হুঁ! ডলি শট সবার হাতে সমান মসৃণ হয় না। গুড!' তাঁর কঠিন মুখ যেন একটু নরম হল, 'সুধীরদা আমার দেখা সেরা সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন! তবে এরপর থেকে যখন টিল্ট করবে তখন আরও একটু স্লোয়ার আপ অ্যান্ড ডাউন মুভ করবে। ওটা দেখতে বেশি ভালো লাগে।'

সহদেব অন্যমনস্কভাবেই সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকায়। সে তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে। যেখানে ভদ্রলোক সোমদত্তার কথা থরথর আবেগে বলে চলেছেন। দুরন্ত প্রেমিক না হলে এমনভাবে কেউ নিজের স্ত্রীয়ের কথা বলতে পারে! উনি কি তবে এখনও ম্যাডামকে— ?

তার অনুচ্চারিত প্রশ্নটা যেন ধরে ফেললেন পরিচালক। এক ঝটকায় চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে শীতল ঔদাসীন্য ফিরে এল। সেই দুর্বিনীত কণ্ঠে বললেন, 'নো ওয়ে! এটা স্রেফ অ্যাকটিং! আই ডোন্ট মিস হা! আর তার জন্য অনুতাপও নেই।'

কথাটা ছুড়ে দিয়েই গটগট করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে তাকালেন সহদেবের দিকে। তর্জনী তুলে বললেন, 'ইয়েস ইউ! তুমি কাল একটা ক্যামেরা নিয়ে আমার বাড়ি আসবে। কালকেই শুটিং শেষ। লোকেশন, আমার বাড়ি। লাইট, সাউন্ড বা ড্রোনের দরকার নেই। ওকে?'

বলেই উদ্ধত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন। নিখিল একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, 'ওঃ! বাঁচা গেছে! পুরো মূর্তিমান ডিজাস্টার মাইরি!'

৫

'চা খাবে?'

গলফ গ্রিনে তাঁর বিলাসব্যহুল ফ্ল্যাটে ঢুকতে না ঢুকতেই প্রথম প্রশ্নটা ধেয়ে এল সহদেবের দিকে। সে তখনও ঠিকমতো পরিবেশটা বুঝে উঠতে পারেনি। দিনের বেলাতেও ভদ্রলোক ঘরটাকে আশ্চর্যরকমের আলো-আঁধারি করে রেখেছেন! ঘরে কোনও আলো জ্বলছে না এবং জানলাগুলোও বন্ধ। কিন্তু কোনও একটা উৎস থেকে নম্র আলো চুঁইয়ে আসছে এই ঘরে। তাই সম্পূর্ণ অন্ধকারও নয়। খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা যায় না।

এই আলো-ছায়াময় পরিবেশে অদ্ভুত রহস্যময় লাগছিল লোকটাকে। তার মুখের আদল কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা অন্ধকারেই ডুবে আছে। যেন মানুষটাকে দেখেও দেখা যায় না! রক্তমাংসের দেহ; তবু যেন অধরা সিল্যুয়েট! পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। কিন্তু রংটা কী? কালো?

'লাইটিংটা মজাদার; নয়?'

এই প্রথম সম্ভবত একটু আন্তরিক সুরে কথা বললেন ভদ্রলোক। তাঁর গমগমে কণ্ঠস্বর অনুরণিত হল দেওয়ালে দেওয়ালে।

'মজাদার কি না জানি না। তবে মিস্টিরিয়াস!'

সহদেবও এবার একটু সহজ স্বরে কথা বলার চেষ্টা করে, 'এমন লাইট পেলে শুট করার ইচ্ছেটা আরও বেড়ে যায়।'

'জানতাম তোমার পছন্দ হবে।' অবিকল অন্তর্যামীর মতোই বললেন তিনি, 'সেজন্যই ওপাশের ঘরে আয়নার মাধ্যমে সেকেন্ডারি লাইট সোর্স বানিয়ে আর বাউন্সার দিয়ে এমন পরিবেশ তৈরি করেছি। ইউ নো, ইজিপশিয়ান মিরট্রিক। ব্যাটারা পিরামিডের অন্ধকার চেম্বারেও হাল্কা আলো আনত, আর আমি তো স্রেফ ওঘর থেকে এঘরে এনেছি! বাই দ্য ওয়ে, চা খাবে না কফি?'

এই নিয়ে প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করলেন পরিচালক। সহদেব একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি চা খাই না।'

'মদ খাও?'

প্রশ্নটা এবার বিপজ্জনক ভঙ্গিতে আছড়ে পড়ল। সে একটু সামলে খেলল, 'খাই। তবে দিনের বেলায় আর কাজের সময়ে নয়।'

তিনি উত্তরটা শুনে একটু ভুরু কুঁচকে তাকালেন। যদিও সেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি স্পষ্ট দেখা যায় না। তবে কপালের সামান্য কুঞ্চনে হাল্কা আলো পিছলে পড়ে স্পষ্ট বলে দিল ভদ্রলোক যথারীতি তাঁর পেটেন্ট ভ্রূকুটিটি করেছেন। সহদেব প্রায় ভয়ে কাঠ হয়ে ছিল যে এরপর দুধের অফার আসে কি না! কিন্তু

উনি আর কথাই বাড়ালেন না। বরং উলটে বললেন, 'ফাইন, অ্যাজ ইউ উইশ। তুমি ক্যামেরা রেডি করো। আমি আসছি!'

বলেই হনহনিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। সহদেব যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পরিচালকের উপস্থিতিটাই বড় অস্বস্তিদায়ক। ওঁর প্রোফাইলটা খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। ইমেজে দম্ভ আর পাগলামি দুয়েরই প্রাবল্য। কোনটা বেশি বলা মুশকিল। হয়তো বা সমানে সমানে।

সে ক্যামেরা সেট করতে শুরু করল। ক্যামেরায় গোটা ঘর দেখতে দেখতে মানুষটার আলো বিষয়ক জ্ঞানের মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না! সত্যিই হলিউড ফিল্মে ইজিপশিয়ান পিরামিডের নীচে ঠিক যে আলো-আঁধারি খেলা দেখা যায়, অবিকল সেই এফেক্ট এনেছেন! ক্যামেরায় দেখতে দারুণ লাগছে।

'আজ তোমার কাছে ট্রলি নেই, বাট—'। সম্ভবত পাশের ঘর থেকেই ভেসে এল ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর, 'হয়তো তোমায় ক্যামেরা মুভ করাতে হবে। আমি ব্যাপারটা যথাসম্ভব ন্যাচারাল করতে চাই। তোমার বাবার কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে দৌড়বার অভ্যেস ছিল। তোমার আছে কি?'

কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে দৌড়তে হবে! প্রায় আকাশ থেকে পড়ল সহদেব। এতদিন পুকুরপাড়ে, বাগানে ছোটাছুটি করেও শান্তি হয়নি ওনার! এখন নিজের ফ্ল্যাটেও দৌড়োদৌড়ি করবেন! এ কী অদ্ভুত সিন!

'কী হল?'

এবার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকট। সঙ্গে একটা ধাতব শব্দও শোনা গেল। বোধহয় আলমারি জাতীয় কিছু খুললেন তিনি, 'পারবে? না পারবে না?'

যথারীতি সেই কম্যান্ডিং টোনে ফিরে গিয়েছেন ভদ্রলোক। একটু আগের আন্তরিক সুরটা আর নেই।

'কোনও অসুবিধে হবে না।' সে আমতা আমতা করে বলে, 'কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে আমিও শুট করতে পারি। কিন্তু ইন্ডোরে কোথায় দৌড়ব?'

'কোথায় দৌড়বে সেটা পরের কথা।' এবার ওনার পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এ ঘরে এসে বললেন, 'যদি কোনওক্রমে দৌড়নোর প্রয়োজন পড়ে, পারবে তো?'

আজও আউটডোরের প্ল্যানিং আছে! এবার আর অবাক হল না সহদেব। গত কয়েকদিন ধরে এত অবাক হয়েছে যে বিস্ময়সূচক চিহ্নেরও কোটা শেষ হতে চলল। আড়চোখে একবার দেখে নিল, তিনি একটা 'ল্যাপেল' পরে এসেছেন। অর্থাৎ রেকর্ডিঙের বন্দোবস্ত করেই এসেছেন! এই লোকটার কখন কী বাই ওঠে তার ঠিক নেই। নির্ঘাৎ ফের মাথায় লাস্ট মিনিট ইম্প্রোভাইজেশন এসে ঘাঁই মেরেছে! তাই এখন ঘাড়ে ক্যামেরা নিয়ে দৌড়তে হবে সহদেবকে।

'ওকে স্যার।'

সে আর কথা বাড়াল না। ওনার সঙ্গে তর্ক করা আর বেড়ালকে বর্ণপরিচয় পড়ানো; দুটোই সমান! উনিও হয়তো আর দেরি করতে চাইছিলেন না। তাই একটা মোটা খাম তার হাতে ধরিয়ে

দিয়ে বললেন, ‘শুরু করা যাক? এটা একটা বিপজ্জনক টুইস্ট। আশা করি, তুমি যথেষ্ট প্রোফেশনাল?’

প্রথম প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া বাহুল্য। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের অর্থ ঠিক বুঝল না সহদেব। তবে এ লোকের সব প্রশ্নের অর্থ খুঁজতে যাওয়াই বৃথা। শুধু এটুকু বুঝেছে যে ওই মোটা খামের মধ্যে তার সম্পূর্ণ পেমেন্ট আছে। এই একটা দিকে এই পরিচালকের চিরকালই সুনাম রয়েছে। তিনি সমস্ত কলা-কুশলীদের যথাযোগ্য মূল্য দেন ও যথাসময়ে দেন। কুড়ি বছর আগেও তাঁর কোনও প্রোডিউসারের সাহস ছিল না পেমেন্ট পেন্ডিং রাখার। গিরীশ এবং নিখিলও গতকালই সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক পেয়েছে। পেশাদারি দিক দিয়ে অভিযোগের কোনও জায়গা নেই। ওনার যে কোনওরকম টার্ন আর টুইস্টই বিপজ্জনক! টাকাটা পকেটে এলেই হল। এরপর ফিল্ম ব্লকবাস্টার হোক কী ডিজাস্টার; কী এসে যায়!

‘রেডি?’

‘রেডি’।

‘লাইট ওকে, ক্যামেরা?’

সহদেব বলল, ‘রোলিং’।

আলতো করে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন তাঁর মিনিবারের দিকে। ক্যামেরা প্যান করল সহদেব। ক্যামেরায় চোখ রেখেই বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল, পরিচালক হাতে একটি পানীয়ের বোতল তুলে নিয়েছেন!

‘কুড়ি বছর! কুড়ি বছর ধরে এই অন্ধকারে আছি আমি!’ সেই অদ্ভুত রহস্যময় রশ্মি পড়ে সামান্য চিকচিকিয়ে উঠল পরিচালকের চোখ। মুখ আবছা অন্ধকারে ঢাকা। অভিব্যক্তি বোঝা দায়। খুব ধীরেসুস্থে ফের এদিকেই হেঁটে আসতে আসতে বললেন, ‘বাইরের দুনিয়া বার বার বলেছে, আমি বিলুপ্তপ্রায়! আমি ডাইনোসোর! আই অ্যাম ফিনিশড! আই অ্যাম ডেড!...অ্যাম আই?’

এই মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠস্বর অদ্ভুত রকমের অলৌকিক লাগছিল! একেবারেই লাউড নয়। অতিনাটকীয় নয়। আবেগে কাঁপছে না। বরং বরফের মতো শীতল ও কঠিন। সহদেব চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে ক্যামেরায় ধরছে তাঁর রহস্যমাখা মূর্তিকে। তিনি অদ্ভুতভাবে এগিয়ে আসতে আসতেই একটি বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন! যেখানে নরম আলোর আভাস এসে ঠিক মুখের ওপরে পড়ছে। দেহ অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু মুখটা আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে।

‘আজ পর্যন্ত কেউ ঠিক করে বলতে পারেনি, আসলে আমি কে! আমি কী! কেউ বলেছে, পাগল! মেগালোম্যানিয়াক, স্কামবাগ; আরও কত কী! কিন্তু আমি জানি আমি কে! সবাই বলে আমি অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছি। কিন্তু তারা ভুল বলে—!’

বলতে বলতেই তাঁর মুখের প্রতিটা ভাঁজ পালটে গেল! এবার যেন ভীষণ অপ্রকৃতিস্থ লাগছে তাঁকে! চোখদুটো আরও নিষ্ঠুর! হাতের অ্যালকোহলের বোতলটার মুখ সশব্দে খুলে দিয়ে সমস্ত পানীয় বিদ্যুৎগতিতে নিজের গায়ে ঢেলে দিলেন তিনি! সহদেব কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফস করে

জ্বলে উঠল লাইটার! সেই লাইটারের নীলাভ লকলকে শিখায় ঝিকিয়ে উঠল মানুষটার শ্বদন্ত। হিংস্র হেসে বললেন তিনি :

'হোয়াট টু সে! আই অ্যাম দ্য গড! লেট দেয়ার বি লাইট!'

৬

সত্যিই ব্লকবাস্টার!

যখন এই বিস্মৃতপ্রায় চিত্রপরিচালকের ডকুমেন্টারি ফিল্ম একটি ভিডিও শেয়ারিং সাইটে প্রকাশিত হল, তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল এই ভিডিওটি। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই প্রায় টোয়েন্টি মিলিয়ন ভিউ পেয়ে গিয়েছিল এই তথ্যচিত্র। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওয়ান বিলিয়ন ভিউ ছুঁয়ে ফেলেছিল। আরেকটু হলেই হয়তো সবচেয়ে বেশি ভিউ পেত এই ভিডিও! কিন্তু মারাত্মক ভায়োলেন্সের জন্য ভিডিও শেয়ারিং সাইটটি তথ্যচিত্রটিকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হল!

তবে যতক্ষণ সেটি অ্যাভেইলেবল ছিল, ততক্ষণ লোকে বিস্ময়ে, আতঙ্কে, উৎসাহভরে দেখেছে একজন মেগালোম্যানিয়াকের শুরু থেকে শেষ মুহূর্তটুকু! জীবনের শেষ মুহূর্তেও পাগলের মতো আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে খেতে, এদিক-ওদিক দৌড়তে দৌড়তে, জ্বলতে জ্বলতে, পুড়তে পুড়তে লোকটা একটা কথাই বারবার বলে গিয়েছে—!

'লেট দেয়ার বি লাইট!...লেট দেয়ার বি লাইট!...লেট দেয়ার বি—!'

আর ক্যামেরা নিখুঁতভাবে ফলো করে চলেছে সেই জ্বলন্ত মানুষটাকে! আদ্যোপান্ত প্রোফেশনালভাবে ধরেছে মুহূর্তগুলোকে।

শুধু সহদেব এখন অন্ধকার কারাগারের মধ্যে বন্দি! যতবার তার মনে পড়ে মুহূর্তগুলো ততবারই আফসোসে মাথা ঠোকে দেওয়ালে! ওই জ্বলন্ত মানুষটা যতক্ষণ না প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে, ততক্ষণ সে মূর্খের মতো ভেবেছিল, এটা নির্ঘাৎ একটা বিপজ্জনক স্টান্ট! ভেবেছিল—এই কারণেই সতর্কবাণী দিয়ে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, ও পেশাদার কি না! সহদেব ক্যামেরার মাধ্যমে নানারকম স্টান্ট দেখেই অভ্যস্ত! স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ঘটনাটা বাস্তবেই ঘটছে! ভেবেছিল, এটাও তাঁর দুরন্ত অ্যাক্টিঙের অন্যতম!

যখন বুঝল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এক ঘণ্টায় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন ভিউ! তথ্যচিত্র নিঃসন্দেহে ব্লকবাস্টার, কিন্তু সহদেবকে এখন পুলিশ ইন্টারোগেট করছে। একটা জলজ্যান্ত মানুষ পুড়তে পুড়তে শেষ হয়ে গেল আর সে বিনা দ্বিধায় প্রথম থেকে শেষ অবধি ক্যামেরাবন্দি করল, এমনকি ভিডিও শেয়ারিং সাইটে সেটা প্রকাশিতও হল! যতই সহদেব বলুক না কেন যে সে শেষ অবধি এটা ওই পরিচালকের বিপজ্জনক স্টান্টই ভেবেছিল; পুলিশ তা মানতে রাজি নয়। তারা এখন তদন্ত চালাবে। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করার জন্য সে আফসোসে মাথা ঠোকে, কাঁদে।

আজ সহদেব আলোকেও ভয় পায়!

‘উই ক্যান ইজিলি ফরগিভ আ চাইল্ড, হু ইজ অ্যাফরেইড অফ দ্য ডার্ক; দ্য রিয়েল ট্র্যাজেডি অব লাইফ ইজ হোয়েন মেন আর অ্যাফরেইড অফ দ্য লাইট।’

—

ওস্তাদ

আর কয়েকদিন পরেই মহালয়া। চতুর্দিকে পুজো পুজো গন্ধ। শরৎকালের নিয়ম মেনেই আকাশ গভীর নীল! বেশ কিছু মাখন রঙের ছেঁড়া মেঘের নরম টুকরো শ্লথগতিতে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের কোনওরকম ব্যস্ততা নেই। শুধু আপনমনে ধীরগতিতে কোন নিরুদ্দেশের ঠিকানায় চলেছে কে জানে! হয়তো বা কোনও প্রেয়সীর বার্তা বয়ে নিয়ে চলেছে তার দূরপ্রবাসী প্রিয়তম'র জন্য। মা আসছেন। তাই প্রবাসের মানুষদের এখন ঘরে ফেরার আমন্ত্রণ জানাতে চলেছে ওরা!

মেঘগুলো আজ যতই রোম্যান্টিক মুডে থাকুক না কেন, সূর্যদেব কিন্তু যথারীতি রুদ্রমূর্তিতে আছেন! এমনিতেই পুরাণে কথিত আছে যে এই দেবতার তেজের চোটে স্বয়ং তাঁর অর্ধাঙ্গিনী, দেবী সংজ্ঞা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন! দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর নগণ্য প্রাণীদের সে উপায় নেই! সুতরাং চাঁদির ওপরে সূর্যের অনাবিল আশীর্বাদ গ্রহণ করতে করতে মানুষগুলোর প্রাণ ওষ্ঠাগত! তবু যাঁদের মাথায় চমৎকার বাবরি চুল আছে, তাঁরা কিঞ্চিৎ ছাড় পেয়েছেন। কিন্তু যাঁদের ব্রহ্মতালু জুড়ে চকচকে 'দর্পণসদৃশ ইন্দ্রলুপ্ত', তাঁদের অবস্থা শোচনীয়!

'দাদা, ক'টা বাজে?'

যাঁকে বলা হল, সেই 'দাদা' বিরক্ত হলেন। ভদ্রলোক বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছেন প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল। কিন্তু বাসের পাত্তাই নেই! কপালদোষে তাঁরও গোটা মাথা জোড়া কপাল! যেভাবে অবাধে সোলার এনার্জি গ্রহণ করে চলেছেন, তাতে আশঙ্কা হয়, রাতে চাঁদের বদলে তাঁর টাকটিই না আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে! মস্তিষ্কের ভেতর ঘিলু টগবগিয়ে ফুটছে! যেটুকু ধূসর বস্তু আছে, তাও বাষ্পীভূত হওয়ার উপক্রম! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু-পায়ে দুব্বো গজিয়ে গেল! আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে সম্ভবত হেরিটেজে পরিণত হবেন! এমন পরিস্থিতিতে কেউ যদি আহ্লাদি গলায় সময় জানতে চায় তখন আর ধৈর্য থাকে!

দাদা একঝলক প্রশ্নকর্তাকে দেখে নিলেন। লোকটাকে দেখতে অবিকল একটা ভোঁদড়ের মতো! সাদা ঝকঝকে দাঁত বের করে আবার জানতে চাইল, 'বারোটা বেজে গিয়েছে?'

বারোটা তো তাঁর নিজেরই বেজে গিয়েছে! এবং বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটি মানুষেরই বাজছে। তা সত্ত্বেও 'দাদা' যথাসম্ভব শান্ত গলায় বললেন, 'সাড়ে বারোটা।'

'বা-বা!' ভোঁদড়মার্কা লোকটা বলল, 'এর মধ্যেই এত বেলা হয়ে গেল! আমি তো বুঝতেই পারিনি!'

তিনি লোকটার দিকে রাগত চোখে আবার তাকালেন। লোকটার মুখে এখন কান এঁটো করা হাসি। ফের সেই আহ্লাদি মিহি গলায় জানতে চাইল, 'কদ্দূর যাবেন?'

'দাদা'র উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তবু নিমপাতা গেলার মতো মুখ করে একটি বিরাট শপিংমলের নাম করলেন।

লোকটার পিটপিটে চোখ নেচে উঠল। ব্যাটা নির্ঘাৎ পুজোর শপিং করতে যাচ্ছে! অত বড় শপিংমলে যাচ্ছে মানে মালদার পার্টি। আড়চোখে একবার তাঁর প্যান্টের পকেটে রাখা ওয়ালেটটা দেখে নিল সে। যথেষ্ট পেটমোটা! এক ঝলকেই বুঝে নিল, শুধু ক্রেডিট কার্ড নয়, এ পাব্লিক যথেষ্ট ক্যাশ নিয়েই বেরিয়েছে। এখন শুধু সুযোগ বুঝে হাত মারতে পারলেই কেল্লা ফতে। আর যেভাবে ওয়ালেটটা অসতর্ক ভাবে আধখানা বেরিয়ে আছে, তাতে কোনও অসুবিধেই হওয়ার কথা নয়।

যখন সে মনে মনে এসব অঙ্ক কষছিল, ততক্ষণে বাস এসে দাঁড়িয়েছে স্টপেজে। তার হাবভাব অবিকল আস্ত হরিণ গিলে আসা অজগরের মতো। নড়াচড়ার কোনও ইচ্ছেই নেই! সেফটিপিনের গোছার মতো যত্রতত্র মানুষ ঝুলছে! বেচারি কন্ডাক্টরেরও দাঁড়াবার জায়গা নেই। ধ্যানস্থ বকের মতো একপায়ে কোনওমতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'আসুন...আসুন...! তাড়াতাড়ি উঠে আসুন। যাবে, যাবে...!'

বাসের মধ্যে প্রচণ্ড ভিড়! লোকগুলো একে অন্যের সঙ্গে লেপ্টে আছে! আহা, এরই নাম তো মহামিলন! এর হাত ওর কাঁধে! ওর ঠ্যাং আরেকজনের ঠ্যাঙের তলায়! কারোর ফরাসি সুগন্ধের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে অন্য কারোর ঘামের দুর্গন্ধ! কারোর শখের শার্টের ওপরে পেছনের লোকটির মুখের পানের রস বাটিকপ্রিন্ট তৈরি করেছে! সবমিলিয়ে পুরো 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' কেস!

এরকম ভিড় দেখলেই 'দিল গার্ডেন গার্ডেন' হয়ে যায় ওস্তাদের! হ্যাঁ, ওই ভোঁদড়মুখো লোকটার নামই ওস্তাদ! বলাই বাহুল্য, যে এটা ওর পিতৃপ্রদত্ত নাম নয়। কিন্তু ওর হাতের কাজ এমন মাখনের মতো যে ওর লাইনের সবাই ওকে ওস্তাদ বলেই ডাকে! সবাই জানে যে সে এ তল্লাটের 'কনৌসার অব পিকপকেট'! চ্যাম্পিয়ন সমাজসেবী বলে কথা!

কোনওমতে ভিড় ঠেলেঠুলে, একে গুঁতো মেরে, ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে, টপাটপ গোটা দুয়েক হাত মেরে ওস্তাদ এসে দাঁড়াল ঠিক সেই 'বাসস্ট্যান্ডতুতো দাদা'টির পিছনে। শুরুতেই ভিড়ের ধাক্কাধাক্কির সুযোগে দুটো উইকেট তুলে নিয়েছে। তাই এইমুহূর্তে সে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে! এই তো, কয়েক ইঞ্চি সামনেই তার বহু ঈপ্সিত ওয়ালেট! একটু হাত বাড়ালেই...!

'আ-রে দা-দা...!'

এক প্যাসেঞ্জারের চিৎকারে সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিল ওস্তাদ! বাস চলতে শুরু করেছে ঠিকই। কিন্তু এত মন্থরগতিতে যে কচ্ছপও বোধহয় ওভারটেক করে যাবে। বাসের সামনের দিকের এক অধৈর্য প্যাসেঞ্জার বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বাসটাকে এবার টানুন! কতক্ষণ এরকম ক্যাটওয়াক চালাবেন!'

'মনে হচ্ছে এবার নেমে ঠেলতে হবে।' পাশ থেকে মন্তব্য ভেসে এল।

ওস্তাদ কথাগুলো শুনে সামনের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায়। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল ওকে!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে ওঠে সে। আরে, সেই লোকটা না! একদম সামনের মুখোমুখি সিটটায় বসে আছে! তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আগের দিনেরই মতো! মুখে সেই সাঙ্ঘাতিক রহস্যময় হাসি! যেন ওস্তাদের সব রহস্য জানে ও! অপলকে দেখছে তাকে। বলা ভালো, মাপছে তার গতিবিধি! ভাবটা এমন, যেন বলতে চাইছে, 'আমি সব জানি।'

সঙ্গে সঙ্গেই চোখ সরিয়ে নেয় ওস্তাদ! আবার! আবার সেই লোকটা। একেবারে মূর্তিমান শনি! দু-দিন আগেই এই রুটের বাসে দেখেছিল। একেবারে শুরু থেকেই ওর দিকে এমনভাবে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল যে হাতটা একটু নাড়াতেও পারছিল না সে। দু-একবার অগ্রসর হয়েও পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল ওস্তাদ! কারণ লোকটার চোখ তো নয়, যেন একজোড়া হ্যালোজেন লাইট! সেই দপদপে অপলক দৃষ্টির সামনে স্বয়ং কৃষ্ণও বোধহয় হাতসাফাই করে ননী খেতে পারতেন না! ওস্তাদ তো মানুষ!

সে টের পেল বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করছে। এই লোকটার জন্যই আগের দিন বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি! হাতে যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও দামি দামি ভ্যানিটি ব্যাগ, পেটমোটা পার্স, ওয়ালেটগুলোকে অক্ষতই ছেড়ে দিতে হয়েছিল। আজও কি তবে কপালে ব্যর্থতাই নাচছে! চোখের সামনে দামি চামড়ার পেটমোটা ওয়ালেটটা তখনও ভালোবেসে হাতছানি দিয়ে ডেকে চলেছে। ওটাকে আলগোছে তুলে নেওয়া ওস্তাদের কাছে প্লেট থেকে রসোগোল্লা তুলে নেওয়ার মতোই সহজ কাজ। অথচ এই অলপ্পেয়ে লোকটার জন্য কি সেটাও পারবে না? মরিয়া হয়ে হাতটা অতি সন্তর্পণে বাড়িয়ে দিল সে...!

'আরে, পেয়েছেন কী মশাই!'

ওস্তাদ প্রায় ব্যাগটাকে ছুঁয়েই ফেলেছিল। কিন্তু ফাঁক বুঝে তুলে নেওয়ার আগেই ব্যাগের মালিক সেই 'দাদা' নড়েচড়ে উঠলেন। তাঁর সামনে দাঁড়ানো লোকটির দিকে প্রায় তেড়ে গিয়ে বললেন, 'তখন থেকে আপনি আমার টাকে খোঁচা মেরে চলেছেন! এটা আমার টাক! বারোয়ারি ঢাক নয় যে, যার যখন খুশি এসে পিটিয়ে যাবে!'

ভিড়ের মধ্য থেকেই কোনও এক সুরসিক ফোড়ন কাটলেন, 'নিজের জিনিস নিজের দায়িত্বে রাখুন! তা না পারেন তো অতকিছু নিয়ে ভিড় বাসে ওঠার দরকার কী?'

'আমি আমার টাক আগলেই রেখেছি।' 'দাদা' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছেন, 'কিন্তু ওঁকে বলুন নিজের হাত সামলে রাখতে...উফফফ!'

তিনি হাঁউমাউ করে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ একখানা পেল্লায় লম্ফ মেরে উঠলেন। না, নিজের ইচ্ছেয় নয়। বাসটা সম্ভবত স্পিড বাম্পে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে বাসযাত্রীরা মহাকাশযাত্রীদের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। অর্থাৎ শূন্যে ভাসমান হলেন। 'দাদা'র মাথাটা প্রায় আরেকটু হলেই বাসের ছাতে ঠুকে যাচ্ছিল। সেই দৃশ্য দেখে আবার উড়ে এল ফোড়ন, 'আহা! ফেটে গেল বুঝি?'

'দাদা' ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। চোখ গোল গোল করে বললেন, 'কী ফাটল?'

‘ইয়ে...। মানে...!’ ফ্যাঁচফ্যাঁচে হাসির সঙ্গে ভেসে এল শব্দগুলো, ‘কালীরামের ঢোল!’

ভদ্রলোক প্রায় দাঁত কিড়মিড়িয়ে উঠেছেন। গোল গোল ভাঁটার মতো চোখ করে সম্ভবত ঝগড়া করার প্রস্তুতিই নিচ্ছেন। অন্যদিকে বিশেষ মন নেই। এই সুযোগ! প্যান্টের পকেটে ওয়ালেটটা...!

কিন্তু নাঃ! ওস্তাদের কপালই খারাপ! এবারও হল না। এমন নয় যে সে চেষ্টা করেনি। কিন্তু হাত বাড়াতে গিয়েই দেখল, লোকটা ফের তার দিকেই তাকিয়ে আছে! মুখে সেই রহস্যময় মিটিমিটি হাসি! নিষ্পলকে দেখছে তাকে। এমন করে দেখছে যেন ওস্তাদকে সে খুব ভালোভাবেই চেনে। আর তার মনের অন্ধকার গলিঘুঁজিগুলো ওই দুটো চোখের সামনে একদম দিনের আলোর মতো স্পষ্ট!

ওস্তাদের মনে সন্দেহ ঘনায়। কে এই লোকটা? সাধারণ প্যাসেঞ্জার? কিন্তু হাবে-ভাবে ওকে মোটেই সাধারণ মনে হচ্ছে না! ওর পরপর দু-দিন আবির্ভাবটা কি নিতান্তই কাকতালীয়? তাই যদি হয়, তবে এরকমভাবে তাকিয়ে আছে কেন? মুখে স্মিত হাসিটাই বা কেন লেগে আছে? ও কি ওস্তাদের পরিচিত? আগে কখনও দেখেছে?

ভাবতে ভাবতেই ঘেমে ওঠে সে। এমনও তো হতে পারে এই লোকটা ওর ভূতপূর্ব শিকার। কোনওদিন হয়তো ওরই পকেটসাফা করেছিল ওস্তাদ। সেইজন্যই...!

সে-ও এবার চোখ সরু করে দেখতে থাকে লোকটাকে। দেখলে তো নিরীহ বলেই মনে হয়! নিতান্তই সাধারণ পাঞ্জাবি-পাজামা পরে আছে। কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনি ঝোলা। শান্ত সৌম্য চেহারায় বেশ অহিংস ভাব! কোনও দিক থেকেই ওকে বিপজ্জনক মনে হয় না। অথচ চাউনিটা অদ্ভুত! আশ্চর্য বরফশীতল! মনে হয় অর্ধনিমজ্জিত হিমশৈল! চোখদুটো নেহাতই আইসবার্গের উপরের অংশ। বাকিটা লুকিয়ে রয়েছে আরও গভীরে। সে অংশটা হয়তো আরও রহস্যময়। আরও বিপজ্জনক!

ওস্তাদ ওকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাপছিল। কিন্তু ঠিকমতো ওকে মেপে নেওয়ার আগেই আরও একটা বিপজ্জনক ঝাঁকুনি! এবার ‘দাদা’টি ওস্তাদের ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েছেন! একদম লুজ বল! এই সুযোগে ছক্কা মারতেই হবে! ওয়ালেটটা এবার ওর কোমর স্পর্শ করেছে। এটা তুলে নেওয়ার জন্য কোনও যন্ত্রেরই দরকার নেই। ওস্তাদের হাতই যথেষ্ট। শুধু একবার টুক করে তুলে নিলেই হয়!

তার সাঁড়াশির মতো আঙুলদুটো মুহূর্তের জন্য চেপে ধরল ব্যাগটাকে। ওই মুহূর্তের ভগ্নাংশের স্পর্শেই সে বুঝতে পারল, তার আন্দাজই সঠিক। ওয়ালেটটার ভেতরে ভালোই মালপত্র আছে! তুলে নিতে পারলে কয়েকদিনের ইনকাম একসঙ্গে হয়ে যাবে! এবার মালটাকে তুলেই ছাড়বে ওস্তাদ! কিন্তু অভ্যস্ত হাতে ব্যাগটাকে টান মেরে বের করতে করতেই ফের পাথর হয়ে গেল সে! লোকটা আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এদিকেই! যথারীতি মিটমিট করে হাসছে! মুখ তুলে তাকাতেই একদম চোখে চোখ পড়ে গেল।

ওস্তাদের মনে হল তার আঙুলগুলো বরফ হয়ে গিয়েছে। অথবা একদম অসাড়! তার মনের অবস্থা বলার মতো নয়! একটু আগেই মনে হয়েছিল, লুজ বল পেয়েছে। এখন বুঝতে পারছে, লুজ বলের

ছদ্মবেশে বডিলাইন চলছে! চতুর্দিকে শিকারির মতো ছড়িয়ে আছে চতুর ফিল্ডাররা! পুরো জন্টি রোডসের ফিল্ডিং! স্কোর করা তো দূর, নড়তে-চড়তেই পারছে না!

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই পর্বই চলল। সেই আগের দিনেরই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। যতবারই সে ওয়ালেটটাকে কব্জা করার জন্য হাত বাড়ায় ঠিক ততবারই অব্যর্থ টাইমিঙে লোকটার মুন্ডু ঘুরে যায় তার দিকে! ওরকম গোল গোল চোখের সামনে কেউ পকেট মারতে পারে! বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দেয় ওস্তাদ।

'দাদা কি আগে পাইলট ছিলেন নাকি?'

বাস ড্রাইভারের দিকে কোনও এক প্যাসেঞ্জারের প্রশ্নবাণ ধেয়ে গিয়েছে। ড্রাইভার এবার খোঁচা খেয়ে এদিকেই তাকায়। প্রশ্নকর্তা মৃদু হেসে বলে, 'আসলে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে হাওয়ায় বেশি উড়ছি কিনা!'

ড্রাইভার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টিপাত করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। পাশ থেকে আরেকজন বলে উঠল, 'না না, পাইলট নয়, উনি অ্যাস্ট্রোনট ছিলেন। রকেট চালাতেন। দেখছেন না, কেমন মাধ্যাকর্ষণের বাপ-ঠাকুর্দা মায় চোদ্দো পুরুষের শ্রাদ্ধ করে ছাড়ছেন!'

এসব মন্তব্য শুনলে যে কেউ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়বে! বাস ড্রাইভার কতটা ফ্রাস্ট্রেটেড হল কে জানে। কিন্তু তার চেয়েও একটি দুঃখী আত্মা নিজের ব্যর্থতার হতাশায় ডুবে ছিল। ওস্তাদের হঠাৎই মনে পড়ে গেল কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে পড়া খবরটা। পুজোর আগে পকেটমারি, কেপমারি, ছিনতাইয়ের প্রকোপ দূর করার জন্য কলকাতা পুলিশ সব জায়গায় সাদা পোশাকের ছদ্মবেশী পুলিশ ছড়িয়ে দিয়েছে! দ্বিগুণ উৎসাহে মাঠে নেমে পড়েছে ইনফর্মাররাও। দাগি অপরাধী, তথা হিস্ট্রি শিটারদের চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ খবরটা আগেই তার চোখে পড়েছিল। তখন বিশেষ পাত্তা দেয়নি। বরং ভেবেছিল, এসব নিতান্তই কলকাতা পুলিশের মিথ্যে আশ্বাস! অথচ এখন মনে হচ্ছে, খবরটা ঠিকই ছিল।

ওস্তাদ নিশ্চিত হয়। হ্যাঁ, লোকটা নির্ঘাৎ সাদা পোশাকের পুলিশ। অথবা ওদের ইনফর্মার। সেজন্যই তাকে এভাবে চোখে চোখে রাখছে। কোনওরকম বেগড়বাঁই করলেই সোজা ক্যাঁক করে ধরে পাঠিয়ে দেবে শ্রীঘরে। তারপর চলবে 'কচুয়া ধোলাই'! সে মনে মনে বুঝতে পারছিল আজ তার দিনটা মাটিই হতে চলেছে। আস্তে আস্তে নিরাশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল ওস্তাদ...।

'কা-লী-বা-ড়ি! কা-লী-বা-ড়ি'! চিৎকার করে সামনের স্টপেজের নাম ঘোষণা করল কন্ডাক্টর। আর তখনই ঘটল এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা!

লোকটা ওস্তাদকে অবাক করে দিয়ে আচমকা সটান উঠে দাঁড়াল! তারপর ঝোলার ভেতর থেকে বের করে আনল একটা ফোল্ডিং ব্লাইন্ড ওয়াকিং স্টিক! লাঠি ঠুকঠুকিয়ে আন্দাজে এগিয়ে এল তার দিকেই। সম্ভবত পিছনের দরজা দিয়ে নেমে যাবে পরের স্টপেজে। তার হাঁটাচলাতেই স্পষ্ট যে মানুষটি দৃষ্টিহীন!

ওস্তাদের মনে হল, বহুবছর দ্বীপান্তরে থাকার পরে সে বুঝি এতদিনে দেশের মাটিতে পা রাখল! লোকটা অন্ধ! তার মানে ও কিছুই দেখছিল না। স্রেফ শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল। ওস্তাদের কীর্তি দেখার কোনও সুযোগই ছিল না ওর। অথচ সে কিনা এতক্ষণ ভয়ে সিঁটিয়ে মরছিল...!

লোকটা এগিয়ে আসতে আসতেই বাসের ঝাঁকুনিতে একটু বেসামাল হয়ে উলটে পড়ল ওস্তাদের ঘাড়ের ওপরে! পরক্ষণেই সামলে নিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'সরি!'

'কোনও ব্যাপার না দাদা!' ভীষণ আনন্দে ও শান্তিতে ওস্তাদ তখন করুণার সাগর, 'আসুন, আপনাকে নামিয়ে দিই।'

'থ্যাঙ্কস ভাই...মেনি মেনি থ্যাঙ্কস! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

অন্ধ লোকটাকে হাত ধরে স্টপেজে নামিয়ে দিল সে। তারপর ফুরফুরে মনে এসে দাঁড়াল নিজের জায়গায়। এখন আর কোনও বাধা নেই। ওই পেটমোটা ওয়ালেটটা এখন তার!...শুধু তারই...! আর কেউ তাকে আটকাতে পারবে না।

'আমার ও-য়া-লে-ট...!'

এতক্ষণ বাসস্ট্যান্ডের 'টাকদাদা'টি চুপচাপই দাঁড়িয়েছিলেন। নীরবে দাঁড়িয়ে বাসের ঝাঁকুনি সহ্য করছিলেন। কিন্তু বাস কন্ডাক্টর তাঁর কাছে ভাড়া চাইতেই বিপত্তিটা ঘটল! পকেটে হাত ঢুকিয়েই চরম হাঁকাড় পাড়লেন, 'আমার ওয়ালেট নেই!'

ওস্তাদ এবার যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খায়! ওয়ালেট নেই মানে! এই তো, একটু আগেই ছিল। সে স্বচক্ষে দেখেছে। ওটার ওপর থেকে একবারের জন্যও চোখ সরায়নি। শুধু যখন সেই লোকটা ওর ঘাড়ে এসে পড়ল...!

মুহূর্তটা মনে পড়তেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। কী এক কুটিল সন্দেহে ওর হাতদুটো বিদ্যুৎবেগে নিজের দু-পকেটে ঢুকে গেল! নেই! সেখানে কিছু নেই! ওর নিজের পার্সটা তো বটেই, এমনকি শুরুতেই যে দুটো ব্যাগ তুলেছিল, সেগুলো সব হাওয়া! ওর খালি পকেটদুটো যেন সজোরে ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠল!

ওস্তাদ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! তার মানে লোকটা অন্ধও ছিল না...!

সে ওস্তাদ ছিল! তার চেয়েও বড় ওস্তাদ!

—

পোশাক

১

‘তোর বর কি জীবনে কখনও প্যান্ট পরা মেয়ে দেখেনি?’

জানকীর দিকে তাকিয়ে অসম্ভব রাগে কাঁপতে কাঁপতে শব্দগুলো ছুড়ে দিল বৈদেহী। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই কথাটা বলল সে। তার সুন্দর মুখ রাগে থমথম করছে। রেগে গেলেই ওর ঠোঁটের ওপরে আর নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যায়। ঘরে এসি চললেও সে ঘামতেই থাকে! জানকী তরকারি কুটতে কুটতেই আড়চোখে দেখল বৌদি ফের ঘামছে! মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে মেয়েটি! সর্বনাশ! শিউশরণ আবার নতুন করে কী অসভ্যতা করল! এতবার বলেছে লোকটাকে—!

সুমন বসার ঘরে সোফার ওপর আড়কাত হয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে ল্যাপটপে কাজ করছিল। সে রোজ বৈদেহীর আগেই বাড়ি ফেরে। ডিনারের আগে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে কিছু জরুরি ই-মেল পাঠাচ্ছিল। বৌয়ের রাগতস্বর শুনে সটান উঠে বসে বলল, ‘কী হল? শিউশরণ ফের কিছু করেছে?’

শিউশরণ ওদের সোসাইটির সিকিউরিটি গার্ড। জানকীর পতিদেব। ওরা বিহারের আদি বাসিন্দা হলেও আজন্ম কলকাতায় থেকে আপাদমস্তক বাঙালি হয়ে গিয়েছে। জানকী কাজেকর্মে চটপটে। ঘরের সমস্ত কাজে পারদর্শী। ফলে কাজ পেতে তার অসুবিধে হয়নি। কিন্তু শিউশরণের কোনও চাকরিই ছ’মাস, একবছরের বেশি টেঁকে না। মূল কারণ তিন ‘ম’য়ের সমাহার। মদ-মাংস ও মেয়ে! অবশ্য জানকী শিউশরণের চাকরির জন্য সুমন ও বৈদেহীর কাছে তদ্বির করার সময়ে তৃতীয় ‘ম’টির কথা বেমালুম চেপে গিয়েছিল। বৈদেহীর প্রায় পা চেপে ধরেছিল সে। করুণ কণ্ঠে বলেছিল, ‘বৌদি, ও কথা দিয়েছে আর নেশা করবে না। তোমরা একটু দেখো। ঘরে বেকার মরদ বসে থাকলে কোন মেয়েছেলের ভালো লাগে!’

প্রথম প্রথম একটু আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত জানকীর কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল ওরা। শিউশরণকে নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কিন্তু জানকী ওদের দুজনের ছোট্ট সংসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সকাল ছ’টায় রোজ এসে হাজির হয়। সুমন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। একটি নামী-দামি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করে। আর বৈদেহী ফ্যাশন ডিজাইনার। তার নিজস্ব একটা নামকরা বুটিক আছে। সকালে বেরোয়, ফেরে অনেক রাতে! দুজনের কারোরই মরার সময় নেই! সুতরাং জানকীই সংসারের সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলা সামলায়। সে একা হাতেই রান্না-বান্না, ঝাড়-পোঁছ, বাজার-হাট সব করে। একদিন যদি কামাই করে তবে কর্তা-গিন্নি, দুজনেই চোখে সর্ষেফুল দেখবে! তার ওপর অত্যন্ত বিশ্বস্তও। যা দিনকাল পড়েছে, তাতে এমন কাজের লোক পাওয়া রীতিমতো ভাগ্যের বিষয়!

অগত্যা তার মুখের দিকে তাকিয়েই শিউশরণকে কাজে রাখা। সুমন এই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। তার সুপারিশেই সিকিউরিটি গার্ডের চাকরিটা পেয়েছিল শিউশরণ। যেদিন সুসংবাদটা পেল, সেদিন আবেগে, কৃতজ্ঞতায় প্রায় কেঁদে ফেলেছিল মেয়েটা। বৈদেহীর হাত ধরে বলেছিল। 'তোমরা আমায় বাঁচালে বৌদি!'

কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে বাঁচলেও পুরোপুরি রক্ষা পেল না জানকী! কারণ সেই এক ও অদ্বিতীয় শিউশরণ!

কয়েকদিন পর থেকেই নতুন সিকিউরিটি গার্ডের নামে নালিশ আসতে শুরু করল! সে নাকি পারভার্টেড! মেয়ে দেখলেই যেন ওর নোলা সকসকিয়ে ওঠে। অশ্লীল ইঙ্গিত করে, ছোট ছোট জামা পরা মেয়েদের দিকে কুৎসিত দৃষ্টিতে তাকায়, নোংরা কমেন্ট ছুড়ে দেয়। বৈদেহী নিজেও লক্ষ করেছে ওর চোখে অবিকল মেছো বেড়ালের দৃষ্টি! চাউনিটা একদম ভালো লাগে না তার। এমন লোভাতুরভাবে আপাদমস্তক দেখে যে মনে হয়, তার গায়ে বোধহয় কোনও পোশাক নেই!

সুমন অবশ্য সেসব কথায় বিশেষ পাত্তাই দেয়নি। বরং উলটে বলেছে; 'ওসব তোমাদের মনের ভুল। লোকটার চোখটাই ওরকম। শুধু তোমার দিকে নয়, ও আমার দিকেও ঠিক ওভাবেই তাকায়। শুধুমাত্র তাকিয়ে থাকার জন্য কি কাউকে দোষ দেওয়া যায়? তুমিও না! বড় অল্পেই উত্তেজিত হও!'

ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ অল্পেই থেমে থাকল না। শিউশরণের সাহসও ক্রমাগত বাড়তে থাকল, যার পরিণাম আজকের ঘটনা!

২

এমনিতে কোনওদিনই শাড়ি-টাড়ি পরার অভ্যেস ছিল না বৈদেহীর। বিয়ের পর পোশাক নিয়ে আপত্তি করার জন্য কোনও জাঁদরেল শ্বশুর ছিলেন না। শাশুড়ি ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সুমনের মা এ বিষয়ে অত্যন্ত আধুনিকমনস্কা। যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন বৈদেহীর স্বাধীনতায় কোনওরকম হস্তক্ষেপ করেননি। তিনি অন্যান্য শাশুড়িদের মতো পুত্রবধূকে কখনই শাড়ি প্যাঁচানো কলা-বৌও বানিয়ে রাখতে চাননি। অতএব সে বিয়ের পরও মনের আনন্দে কুর্তি-লেঙ্গিস, বা টপ-জিন্সের সদ্ব্যবহার করেছে। এখনও করে। বাড়িতে অবশ্য হাউসকোট পরে থাকতেই ভালোবাসে। আর বুটিকে, শপিঙে বা পার্টিতে গেলে নানাবিধ আধুনিক পোশাক। তার যৌবনোদ্দীপ্ত যুগল জয়স্তম্ভ সেই পোশাকে প্রকট হচ্ছে কি না, টাইট জিন্স বা ট্রাউজারে উরু বা নিতম্ব কতখানি আবেদনময় কিংবা ব্যাকলেস টপে পেলব পিঠের খাঁজ কতটা দৃশ্যমান তা নিয়ে সে একটুও চিন্তিত ছিল না।

কিন্তু শিউশরণের কল্যাণে চিন্তা করতে হল!

এমনিতে লোকটা সম্পর্কে একটা বিতৃষ্ণা ছিলই ওর। জানকীর কাছে শুনেছে যে শিউশরণ মধ্যরাতে মদ গিলে এসে তার ওপর অত্যাচার করে। 'বাঁজা' বলে বৌকে খিস্তি করে। অথচ জানকীর শরীরে কোনও ত্রুটি নেই। সমস্যাটা শিউশরণেরই। কোনওদিন সন্তানের জনক হতে পারবে না এই চরম সত্যটি জানার পরেও তার গালাগালি বা মারধোর তো কমেইনি, উলটে আরও বেড়েছে। আর

সেই চিহ্ন সারা দেহে বয়ে নিয়ে বেড়ায় জানকী! বৈদেহী যতবার মেয়েটার মুখে, গায়ে কালশিটে দেখেছে, ততই গভীরভাবে ঘৃণা করেছে শিউশরণকে। ওকে পরামর্শ দিয়েছে, 'পুলিশের কাছে যাস না কেন! জানিস, এভাবে বৌয়ের গায়ে হাত তোলা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তুই আমার সঙ্গে এখনই থানায় চল।'

জানকী ম্লান হেসে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, 'ও আমার ঘরওয়ালা!'

বৈদেহীর রাগ হয়। স্বামী হয়েছে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে? এভাবে মারবে! লোকটার মধ্যে কি আদৌ মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই?

এ হেন লোককে যে সে আন্তরিক ঘৃণা করবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও জানকীর জন্য মেনে নিতে হয়েছে। প্রথম প্রথম শিউশরণকে একদম এড়িয়ে যেত। সিকিউরিটি গার্ডের উর্দি পরা একটা লোক যে উপস্থিত রয়েছে, তা যেন ও লক্ষই করত না! বুটিকে যাওয়ার সময় শিউশরণ যখন গেট খুলে দেওয়ার জন্য ব্যস্তসমস্ত ভাবে এগিয়ে আসত, কিংবা সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে দিত, তখন বিতৃষ্ণায় তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিত বৈদেহী।

কিন্তু এমনই কপাল যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একদিন লোকটার অসভ্যতা চোখে পড়ে গেল! ড্রাইভিং সিটে বসে সেদিনই স্পষ্ট আয়নায় দেখল সে, লোকটার কামাতুর দৃষ্টি ওর টাইট টপের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে! দুটো ঘোলাটে চোখ নির্লজ্জভাবে আমেজ নিচ্ছে এক কুৎসিত কামনার। ঠোঁটে ঘোর লাগা হাসি! মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এই অশ্লীল হাসি খুব ভালোভাবেই চেনে!

মুহূর্তের মধ্যে গা ঘিনঘিন করে উঠল তার। প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে বলল; 'অ্যাই! হাঁ করে কী দেখছিস তুই? হ্যাঁ?'

একজন মেয়ে তার সঙ্গে এরকম প্রবল ঔদ্ধত্যে তুই-তোকারি করে কথা বলবে, তা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি শিউশরণ। তার হিসেবমতো নারী স্রেফ অত্যাচার করার সামগ্রী! তার ওপর যত খুশি জোর ফলিয়ে যাও, টুঁ শব্দটিও করবে না। অথচ এই মুহূর্তে তার সামনে এক সামান্য মহিলা রীতিমতো চেঁচিয়ে কথা বলছে! বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে যায়! কী বলবে ভেবে পায় না।

ততক্ষণে রাগে জ্বলতে জ্বলতে গাড়ি থেকে নেমে এসেছে বৈদেহী। শিউশরণের নাকের সামনে তর্জনী উঁচিয়ে বলল, 'স্কাউন্ড্রেল! সবাইকে নিজের বৌ পেয়েছিস? মেয়েরা তোর বাপের মাল! অসভ্যতার একটা লিমিট আছে! জানোয়ার কোথাকার—!'

লোকটা পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ক্রুদ্ধ বৈদেহী টের পেল ওর দৃষ্টি এখন তার স্লিভলেস টপের বাইরে থাকা উন্মুক্ত কোমল বাহু চেটে বেড়াচ্ছে! যুগটা প্রস্তরযুগ হলে বোধহয় তৎক্ষণাৎ শিউশরণের মাথা পাথর দিয়ে থেঁতো করে দিত সে! ওর ওই অশ্লীল চোখদুটো উপড়ে ফেলত। কিন্তু এখন আবার আইন-কানুনের যুগ। তবু হয়তো শিউশরণের কপালে দুঃখ ছিল। কারণ বৈদেহীর চিৎকার-চেঁচামেচিতে সচকিত হয়ে সোসাইটির কিছু লোকজন দৌড়ে আসে তার দিকে।

'কী হয়েছে ম্যাডাম?' একটি চেনা মুখ প্রশ্ন করে, 'অসভ্যতা করছে নাকি?'

সে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে, অনেক পুরুষই রণং দেহী মূর্তিতে হাতা গোটাতে শুরু করেছে। এখন যদি একটুও উস্কানিমূলক কিছু বলে, তবে শিউশরণকে আড়ং ধোলাইয়ের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

বৈদেহীর চোখের সামনে ভেসে উঠল জানকীর অসহায় মুখ! সে সজোরে শ্বাস টানে। তা ছাড়া শহরের একটি বড়সড় ফ্যাশন শো উপলক্ষ্যে তার বেশ কিছু জরুরি মিটিং আছে। তার ওপর গোটা রাস্তাটা ড্রাইভ করে যেতে হবে ওকে। তাই মাথা গরম করে কোনওরকম সিনক্রিয়েট করতে চায় না। সে ব্যাপারটাকে হাল্কা করেই মিটিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'না—না! তেমন কিছু নয়।'

তখনকার মতো ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়লেও গায়ের জ্বালা মেটেনি বৈদেহীর। একটা গোটা কর্মক্লান্ত দিন কাটানোর পর রাত্রে বাড়ি ফিরে এসেই সে সটান হাজির হল কিচেনে। জানকীকে বলেছিল ওই কথাটাই, ''তোর বর কি জীবনে কখনও প্যান্ট পরা মেয়ে দেখেনি?'

মেয়েটা তখন রুটি বেলছিল। আটা মাখা হাতে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অসহায় চোখদুটো জলে ভরে আসে। ঠোঁটদুটো থির্থিরিয়ে কেঁপেও উঠেছিল হয়তো কিছু বলার জন্য। ক্রুদ্ধ বৈদেহী তার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে চলে যায়।

সেদিনও সুমন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী হল!'

সেদিন তার প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয়নি সে। কিন্তু আজ—!

'কী হয়েছে বলবে তো!'

রাগে তখন থরথর করে কাঁপছে বৈদেহী! এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে শিউশরণ এমন করতে পারে! ক্ষিপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো তার ভেতরে জ্বলন্ত লাভা উথালপাথাল করছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে কোনওমতে বলল, 'ফিল্দি অ্যানিমল! ছোটলোক কোথাকার!'

'আরে!' সুমন তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে, 'কাম ডাউন হানি! এমনিতেই হাইপারটেনশনের রোগী! তার ওপর—!' বলতে বলতেই জানকীর দিকে ফিরল সে, 'এখনই একগ্লাস ঠান্ডা জল নিয়ে আয়। কুইক!'

জানকী তটস্থ হয়ে বৈদেহীর দিকে তাকিয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই তার শরীরটা খুব জুতের নেই। খাবার খেতে ইচ্ছে করে না, বমি পায়। মাথাটাও কেমন টলমল করে। মাঝখানে বেশ কয়েকদিন কাজে আসেনি। ওর চেহারাটাও কেমন রক্তশূন্য লাগে। এই মুহূর্তে সে অসহায়ভাবে তার বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, শিউশরণের এ চাকরিটাও গেলে কী হবে! সংসার চলবে কী করে?...

সুমন আবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'কী রে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস? জল আনতে বললাম না—!'

'না!' সুমনকে থামিয়ে দিয়ে ফুঁসে উঠল বৈদেহী, 'তুই শোন, তোর বর ঠিক কী করেছে! ওর এত বড় সাহস যে—!'

৩

আজ রাতে অফিস থেকে ফিরে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎই জুতোর হিলটা ভেঙে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় টাল সামলাতে পারেনি বৈদেহী। সোসাইটির গ্যারাজেই মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল সে। হাতের ফাইলগুলো নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। যতটা না ব্যথায়, তার চেয়েও বেশি বিস্ময়ের অভিঘাতে কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। যে পায়ের হিলটা ভেঙেছে সে পা-টা ভালোই মচকেছে। তার ওপর পড়েছে বেকায়দায়। সে পায়ের ওপর জোর দিয়ে একবার ওঠার চেষ্টা করেই কাতরে ওঠে!...

শুনশান গ্যারাজে তখন কোনও লোক ছিল না। শুধু শিউশরণ সম্ভবত কাছে-পিঠেই ছিল। নিয়মমতো রাউন্ড দিয়ে বেড়াচ্ছিল। সে বৈদেহীকে পড়ে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে আসে।

'ম্যাডাম—ঠিক আছেন?'

কথাটা বলার সময়ই ওর মুখ থেকে ভক করে মদের গন্ধ নাকে এসে ঝাপ্টা মারল। বৈদেহী বিরক্ত হয়! ডিউটির সময়েও মদ খেয়ে বসে আছে লোকটা! আজই সুমনকে বলতে হবে।

'আসুন, উঠে আসুন ম্যাডাম।'

হাত বাড়িয়ে দেয় শিউশরণ। বৈদেহী ওর সহায়তার বাড়িয়ে দেওয়া হাত সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে নিজেই ফের ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু গোড়ালিটা যেন শক্ত হয়ে আছে! সে কঁকিয়ে উঠল, 'ওঃ! মা-গো!'

'কোথায় লাগল আপনার? পায়ে নাকি? কই! দেখি—দেখি—!'

বলতে বলতেই বৈদেহীর প্রবল আপত্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সে তার পা স্পর্শ করেছে। সাবধানে নেড়েচেড়ে দেখল গোলাপি পা দুটোকে। তার চোখদুটোয় অদ্ভুত জান্তব উল্লাস। বৈদেহী টের পেল, একটা ঘৃণ্য সরীসৃপ তার পায়ের ওপর কিলবিল করে বেড়াচ্ছে! ঠিক যেন একটা কালসাপ! আস্তে আস্তে উঠে আসছে হাঁটুতে, তারপর উরুর ওপরে, তারপর—!

বিপন্ন, ভয়ার্ত নারী টের পায় সেই সাপটা হিসহিস করে বলছে, 'আপনার পা দুটো কী সুন্দর ম্যাডাম! কী সেক্সি—!'

আর সহ্য করতে পারেনি সে। সপাটে এক চড় বসিয়ে দিয়েছে শিউশরণের গালে। তারপর ওই ব্যথা পা নিয়ে কী করে যে ওপরে উঠে এসেছে—!

'কী!'

তড়িদাহত মানুষের মতো তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সুমন। দাঁতে দাঁত পিষে উচ্চারণ করল একটাই শব্দ, 'শুয়োরের বাচ্চা!' তারপরই বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেল বাইরে!

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। পরক্ষণেই নীচের কম্পাউন্ডে শোনা যায় সুমনের উন্মত্ত চিৎকার, 'আমার বৌকে সেক্সি লাগে তোর! হা-রা-ম-জা-দা!'

তার সঙ্গেই ভেসে এল ক্ষিপ্ত জনতার উত্তেজিত কোলাহল! একজন নয়, বহুজন চেঁচিয়ে বলছে, 'মার শালাকে! ঘরের বৌ-মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া—!'

নিজের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছে বৈদেহী। শিউশরণ মার খাচ্ছে! অজস্র লাথি, ঘুসি খেয়ে যাচ্ছে মুখ বুঁজে। উন্মত্ত জনগণ পাগলের মতো পেটাচ্ছে তাকে। গণধোলাইয়ের ফলে ঠোঁট, কপাল চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে! মাথাও ফেটে গিয়েছে বোধহয়। সুমন তার পেটে একের পর এক লাথি কষাতে কষাতে বলছে, 'আমার পা-টা এখন সেক্সি লাগছে না তোর! বাঞ্চোত শা-লা!'

বৈদেহীর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। ও লোকটার মারই খাওয়া উচিত! জানকীকে সুযোগ পেলেই মেরে পাট পাট করে। আজ অন্তত জানুক, মার খেতে কেমন লাগে।

আচমকা পিছন থেকে একটা জোরালো শব্দ ভেসে এল। সে সচকিতে তাকিয়ে দেখে, জানকী মেঝের ওপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে!

৪

'কিচ্ছু হয়নি। ন্যাচারাল ফেনোমেনা।'

ডাক্তারবাবু সহাস্যদৃষ্টিতে একবার জানকীকে, আরেকবার বৈদেহীকে মেপে নিয়ে বললেন, 'সুখবর আসছে! বাচ্চার বাবাকে বলুন মিষ্টি খাওয়াতে।'

বৈদেহী স্তম্ভিতের মতো ডাক্তারবাবুর দিকে তাকায়। অস্ফুটে বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলে, 'আপনি বলছেন ও—।'

তার অসম্পূর্ণ কথাটাকে সম্পূর্ণ করে দিলেন ডাঃ সিনহা, 'প্রেগন্যান্ট। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি নিজের হাতেই আলট্রাসাউন্ড করে দেখে নিয়েছি। তবু একবার ইউরিন টেস্ট করিয়ে নিতে পারেন।'

সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায় জানকীর দিকে। মাতৃত্বের আনন্দে তার মুখে যে অপার্থিব আলো থাকার কথা, সেই লজ্জারুণ আভার বিন্দুমাত্র লেশও নেই! বরং অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে আছে সে। রক্তহীন পাণ্ডুর মুখ বুঝি আরও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। যেন গর্ভে সন্তান নয়, পাপের বোঝা বাড়ছে।

ওই মুহূর্তে আর কোনও কথা বাড়ায়নি বৈদেহী। একটা অস্বাভাবিক নীরবতায় গুম মেরে গিয়েছিল। ডাঃ সিনহার ক্লিনিক থেকে শুধু বেরোনোর অপেক্ষা করছিল। তার টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ক্লিনিকের বাইরে পা দিয়েই ফেটে পড়ল সে।

'তুই যে বলেছিলি, শিউশরণ কখনও বাপ হতে পারবে না! তার নাকি ক্ষমতা নেই! তবে এই বাচ্চাটা কোথা থেকে এল?'

জানকী মাথা নত করে নিরুত্তর হয়েই থাকে। তার চিবুক বুকে ঠেকেছে। দৃষ্টি নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে নিবদ্ধ! তার নিস্তব্ধতার পেছনে যেন কোনও কলঙ্কিত ইতিহাস আছে যা বলার নয়!

জবাব না পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বৈদেহীর ক্ষোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সে প্রায় হিতাহিতজ্ঞান হারিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে, 'তোদের মিয়াঁ-বিবির চরিত্র তো দেখছি সোনায় বাঁধানো! একজন মেয়েদের গায়ে হাত দেয়, অন্যজন কার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে পেটে বাচ্চা নিয়ে ঘুরছে কে জানে! এসব আমি

কিছুতেই সহ্য করব না। সব কিছু সহ্য করা যায়; কিন্তু দুশ্চরিত্র মানুষ নয়! তুই আজকেই সব টাকাপয়সা বুঝে বেরিয়ে যাবি! আর আসার দরকার নেই। তোর ওই পোড়া মুখ আমি আর দেখতে চাই না—!'

জানকীর চোখে জল আর রক্ত, দুই-ই জমল। যে নারী শিউশরণের শত অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করেছে, বৈদেহীর তীব্র অপমানের কোনও জবাব দেয়নি, আজ তারই চোখে যেন জ্বলে উঠল আগুন!

সে একটু চুপ করে থেকে নীচু অথচ রুক্ষ স্বরে, রাগে ও তীব্র ঘৃণায় বলে, 'কী করে জানব যে দাদা কখনও শাড়ি পরা মেয়েছেলে দেখেনি!'

শীতালি পাখির মতো আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল! কিন্তু তা 'নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়' ছিল না! হয়তো বা প্রলয়ের আগের অখণ্ড নৈঃশব্দ্য!

—

রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস

১

বাচ্চা মেয়েটা অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে বসেছিল।

আজ বড় ভয় করছে তার। কচি কচি নিষ্পাপ চোখদুটো কেঁদে কেঁদে ফুলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে হিমালয়ান্তিক পাপের ভার তার ছোট্ট মাথায়। অথচ 'পাপ' শব্দটা আসলে ঠিক কী, তা ওর বোঝার কথা নয়। এখনও সে আট বছরের শিশু। পাপ-পুণ্যের হিসাব করার সময় আসেনি। আপাতত তার খেলা-ধুলো করে, নেচে-কুঁদে-গেয়ে বেড়ানোর কথা। এমনভাবে বাড়ির এককোণে, দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যাওয়ার কথা নয়! তবুও সে কোনও এক অজ্ঞাত লজ্জায়, ভীষণ গ্লানিতে নিজের নিষ্পাপ মুখখানা অন্ধকারের কোলে গুঁজে বসেছিল।

ছোট্ট মানুষটা হাতের পিঠ দিয়ে মুছে নেয় অশ্রুস্নাত ভিজে মুখ। কোথায় যেন আরশোলা কিংবা অন্য কোনও পতঙ্গ খড়খড় করে উঠল। শিশু চমকে ওঠে! ভয় পায়। গলা চিরে বেরিয়ে আসে অস্ফুট কান্না! বেচারির সারা শরীর কান্নার দমকে কাঁপছে। সে জানে, আজ চিৎকার করে আকাশ ফাটালেও কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না। পেটের মধ্যে হিংস্র খিদে থাবা বসিয়ে চলেছে। কিন্তু আট বছরের শৈশবকে আজ ক্ষুধার্ত থাকতেই হবে। বাবা তাকে এই অন্ধকার স্টোররুমে আটকে রেখেছে। মাকে চিৎকার করে বলেছে, 'এই পাপের এমন শাস্তিই হওয়া উচিত! কেউ খেতে দেবে না ওকে! একগ্লাস জলও না! যদি দাও, তবে তোমার একদিন কি আমার একদিন! বাড়ি থেকে মা-মেয়েকে স্রেফ লাথি মেরে বের করে দেব।'

শাস্তি! শব্দটা মাথায় আসতেই বাচ্চা মেয়েটি শুকনো ঠোঁট চেটে নেয়। ঠোঁটের ওপর জিভ বোলাতেই একটা কাতর ধ্বনি ফের উঠে আসতে চাইল কণ্ঠনালি বেয়ে। বাবার রুক্ষ হাতের শক্তিশালী চড়ে নরম ঠোঁটটা কেটে গিয়েছে। সামান্য রক্তের কষাটে স্বাদও পেল সে। ডান গালটা এখনও ব্যথা! বোধহয় কালশিটেই পড়ে গেল।

চোখ থেকে অবিরল ধারায় জল পড়তে পড়তে এখন শুকিয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট আছে শুধু শুকনো জলের ক্ষীণ দাগ। মেয়েটা কাতরদৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকায়। এ দরজা কি আর খুলবে না? মা খাবারের থালা আর জলের বোতল নিয়ে একবারও আসবে না? সারারাত কি এমনভাবেই কাটবে!

ভাবতেই আবার ভীষণ কান্না পেয়ে গেল তার। এখনও কানের কাছে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বাবার কঠিন গর্জন—

'অসভ্য মেয়ে! ছেনালিপনার শখ হয়েছে? মুখে রং মেখে পোজ মেরে ছবি তুলছিস! সর্বক্ষণ মায়ের মোবাইলটা নিয়ে ঘোরা হচ্ছে! সেলফি; তাই না? খুব রংঢং! আজ তোর সমস্ত রং ঘোচাচ্ছি।'

আট বছরের শিশু স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়েছিল বাবার দিকে। আজ সে এমন কী করেছে যাতে বাবা এমন রাগ করল! বাবার এমন ভয়ংকর রাগ সে আগেও অনেকবার দেখেছে। মারও কম খায়নি। পরীক্ষায় কম নম্বর পেলে মার! স্কুল থেকে রিপোর্ট এলে মার! আট বছরের মেয়েটা সারাদিন স্কুল, টিউশন, সুইমিং ক্লাস, মিউজিক ক্লাস নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে। সন্ধেবেলা পড়তে বসে ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে এলেও মার! গান গাইতে তার ভালো লাগে না। বরং নাচ শেখার খুব শখ ছিল। সে কথা বলতেই ফের সেই আদি ও অকৃত্রিম মার! বাবা চিৎকার করে বলল, 'অঙ্গভঙ্গি করতে তো ভালোই লাগবে! যা! রেডলাইট এরিয়ায় গিয়ে মুখে রং মেখে হাত-পা বেঁকিয়ে নাচ! মা-মেয়ে মিলে আমার সর্বনাশ না করলে তো শান্তি হচ্ছে না। দেব ঠিক একদিন লাথি মেরে বের করে!'

নাচের সঙ্গে বাবার কী শত্রুতা তা আজও বোঝেনি সে। 'রেডলাইট এরিয়া' কী জিনিস তা ভগবানই জানেন। কিন্তু 'লাথি মেরে বের করে দেব' বাক্যটা তার অতি পরিচিত। বাবা রেগে গেলেই এই কথাটা বলে। তখন মাকে খুব অসহায় লাগে। মা যেন ভয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যায়। ও জানে যে বাবা বাড়ি থেকে বের করে দিলে ওদের আর কোথাও থাকার জায়গা নেই। মা বলে, বাবা তাড়িয়ে দিলে গাছতলায় যেতে হবে। গাছতলায় যাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। সবার কাছে শুনেছে, গাছতলা খুব খারাপ জায়গা।

মেয়েটা হতাশ দৃষ্টিতে ফের বন্ধ দরজার দিকে তাকায়। এখন অদ্ভুত ক্লান্তিতে তার দেহ ভেঙে আসছে। ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ঘুম। তার ক্লান্ত দু-চোখ তখনও সেই কালিঝুলিমাখা অন্ধকার স্টোররুমে একটা প্রশ্নের উত্তরই খুঁজে বেড়ায়।

আজ ঠিক কী অন্যায় করেছিল সে? শুধু একটা ছবিই তো তুলেছে! আর সেই ছবিটা 'রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস' নামের সাইটটায় পোস্ট করেছে। ওটা তো খুব সুন্দর একটা জায়গা। কত সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়েরা সেজেগুজে ছবি তুলে পোস্ট করে ওখানে। তারও তো সাজতে ইচ্ছে করে। তাই চুপিচুপি মায়ের লাল লিপস্টিকটা একটু ঠোঁটে ঘষে, নাচের ভঙ্গিতে একটা সুন্দর সেলফি তুলে দিয়ে দিয়েছে ওখানে।

সেলফি তোলা কি পাপ? পাপ কাকে বলে?

২

'চাবকে দুটোরই পিঠের ছাল তুলে নেওয়া উচিত! সব গত্তের দোষ! মা যদি বদরক্তের হয়; তবে ছা-ও তাই হবে!'

ঐশানী রক্তজবার মতো রক্তিম চোখ দুটো তুলে একবার শাশুড়ির দিকে তাকায়। তিনি এমনভাবে বিশেষজ্ঞের মতামত পেশ করলেন যেন তাঁর কথাই আই পি সি সেকশনের ধারাবিশেষ। অপরাধীরা কিছু বলার আগেই বিচারক মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বসে আছেন! মহিলা চিরকালই পুত্রবধূর 'গর্ভের দোষ' দেখে গেলেন! ওদিকে 'গর্ভ' শব্দটাও সঠিকভাবে বেরোয় না মুখ থেকে! অথচ নিজের গর্ভের

অহঙ্কারেই বাঁচেন না। সে দম্ভের বাস্তবিক কোনও ভিত্তি নেই। না তিনি রূপে লক্ষ্মী, না গুণে সরস্বতী, না রন্ধনে দ্রৌপদী। বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই তবু কীসের যে এত অহঙ্কার কে জানে!

ঐশানীর শ্বশুর তখন বাচ্চাদের নাচের রিয়্যালিটি শো দেখছিলেন। এটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় প্রোগ্রাম। টিভির পর্দায় একটি দশ বছরের মেয়ে তখন পিঠখোলা জামা পরে, কচি পিঠ, নিতম্ব এবং সদ্য উন্নত বক্ষদেশ কাঁপিয়ে মাধুরী দীক্ষিতের 'ধক ধক করনে লগা' নাচছে। এতক্ষণ সেদিকেই মন ছিল। এবার একটু রাগতদৃষ্টিতেই এদিকে তাকিয়েছেন। ভাশুর অনির্বাণ বাবার পাশে বসে একখানা ফিল্ম ম্যাগাজিনের মধ্যে ডুবে ছিল। মায়ের কথা শুনে ঈষৎ মাথা নেড়ে তাঁকে সমর্থন করে বলল, 'ঠিক—ঠিক!'

এই সংসারে অনির্বাণের ভূমিকা এই পর্যন্তই। উঠতে বসতে মায়ের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া তার আর বিশেষ কোনও কাজ নেই। মা যদি বলেন, সূর্যটা আজ পশ্চিমদিক থেকে উঠেছে, তবে সেও এই একটা শব্দই বলবে, 'ঠিক—ঠিক!' না বলেও উপায় নেই। কারণ সে কথায় কথায় রাজা-উজির মারা ছাড়া আর কোনও কাজই করে না। ঐশানী শুনেছে যে প্রথম জীবনে অনির্বাণ ফিল্ম পরিচালনা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। কিন্তু যে কোনও সৃষ্টিশীল কাজ করতে গেলে প্রথমেই যেটা দরকার, তা হল বিনম্রতা। এই বিনম্রতা নামক শব্দটি এই পরিবারের রক্তেই নেই! এককথায় বলতে গেলে, প্রত্যেকেই একেকটি মেগালোম্যানিয়াক! তাই অনির্বাণের আর ফিল্মের দুনিয়ায় সোনার অক্ষরে নিজের নাম লেখা হল না! অগত্যা তাকে বাপের হোটেলেই থাকতে হয়। বিয়েটা অবশ্য ঠিকসময়েই করেছিল। তবে বিয়ের একবছরের মাথাতেই ডিভোর্স! আপাতত বাপ-মায়ের ফাই-ফরমাশ খাটা এবং কথায় কথায় মাকে তোয়াজ করে ঠান্ডা রাখাই তার প্রধান কাজ। ঐশানী আড়চোখে দেখল, কথাটা বলেই অনির্বাণ ফের ফিল্ম ম্যাগাজিনের খবরে মগ্ন হয়ে গেল। অর্থাৎ তার ভূমিকা ওখানেই শেষ। এখন নতুন কোনও চরিত্রের ডায়লগবাজি শুরু হবে!

'দেখছি কত দেখব আর, চিকার গলায় চন্দ্রহার!' ঐশানীর শাশুড়ি এবার পদকর্তার দায়িত্ব নিলেন। মিটিয়ে মিটিয়ে নাকি সুরে বললেন, 'আগেই বলেছিলাম যে এ মেয়েছেলের জাত ভালো নয়! এমন নিখুঁত ছেলের জন্য খুঁতো মেয়ে ঘরে আনা ঠিক নয়। তখন কেউ কথাই শোনেনি! গরিবের কথা বাসি হলে ফলে কি না! সব হুন্দুরী দেখে মজেই মোলো! আগেই বলেছিলাম, যে নিজের বাপ-মাকেও খেয়েছে, সে সোয়ামিকেও খাবে!'

অনির্বাণ ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই ফের বলল, 'ঠিক—ঠিক!'

ঐশানী স্থির দৃষ্টিতে শাশুড়ি মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ পরিবারে তিনিই মূল গায়েন। বাকিরা তাঁর পোঁ ধরার জন্যই আছে। একঝলক শ্বশুরের দিকেও দেখল সে। তাঁর মুখ ইস্পাতকঠিন। সে মুখে কোনও দয়া, মায়া, মমতা নেই। 'খুঁতো' অর্থাৎ ঐশানী মাঙ্গলিক। তার জন্মলগ্নের ওপরে নিজের কোনও হাত ছিল না। তার ওপর আবার অনাথ! তাতেও তার কোনও দোষ নেই। তা সত্ত্বেও সেই খুঁতের খোঁটা শুনতে শুনতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

অনিমেষ, অর্থাৎ তার স্বামী এতক্ষণ ঘরের মধ্যে ক্রুদ্ধ আত্মার মতো প্রায় 'হা রে রে রে' করতে করতে পায়চারি করছিল। এবার ভ্রূকুটি করে গর্জন করে উঠল; 'শুধু মেয়েই কি ব্যবসায় নামছে? না সঙ্গে সঙ্গে তুমিও?'

কথাটা যেন গরম তরল সিসার মতো তার সর্বাঙ্গ জ্বালাতে জ্বালাতে গেল! ঐশানী দুর্বলস্বরে কিছু বলার আগেই শ্বশুরের ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ কথা ভেসে এল, 'দুজনেই নামলে ক্ষতি কী! খুঁজে দ্যাখ অনি, ওই সব সাইটে হয়তো মেয়ের মায়ের ছবিও আছে। ভিডিও থাকাও আশ্চর্যের নয়। কে বলতে পারে!'

'ওই সব সাইট' অর্থাৎ পর্ণসাইট। যেখানে সোনার দরে বিকোয় নারীত্বের লজ্জা। বেচারি তিতলি আর কী করে জানবে যে 'রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস' নামক সাইটটি আসলে চাইল্ড পর্নোসাইট! সে দেখেছিল যে অনেক বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সুন্দর সুন্দর ছবি, ভিডিও আছে ওখানে। তার কী মনে হয়েছিল কে জানে। নিজের একখানা সেলফি তুলে পোস্ট করে দিয়েছিল সবার অজান্তেই!

আর তারপর থেকেই বাড়িতে চূড়ান্ত মারমার কাটকাট চলছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিতলির ছবিটা ভাইরাল হয়ে গেল! প্রথম জানিয়েছিলেন পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস উমা দত্ত। আচমকা সন্ধ্যাবেলায় এসে একগঙ্গা কথা শুনিয়ে দিয়ে বললেন; 'নিজেদের মেয়েকে যারা ব্যবসায় নামায়, তাদের সঙ্গে এক ফ্লোরে থাকাও পাপ! আমি এখনই আপনাদের নামে কমপ্লেন করব।'

তারপর আরও অনেকেই দায়িত্ব নিয়ে 'ছি ছি' করে গেলেন। হাউজিঙের সবাই একযোগে কমপ্লেন করবেন ওদের বিরুদ্ধে। এরকম বিকৃতমনস্ক প্রতিবেশীর সঙ্গে থাকা অসম্ভব! অনিমেষ, ঐশানী এবং ওদের পরিবারের লোকজন সেই ক্ষিপ্ত মানুষগুলোকে কিছুতেই বোঝাতে পারল না যে এটা নিতান্তই একটা অ্যাক্সিডেন্ট। একটি আট বছরের বাচ্চা মেয়ে ভুল করে পোস্টটা করে ফেলেছে। তার পক্ষে বোঝা সম্ভবই ছিল না যে ওটা পর্নোসাইট! কিন্তু কেউ এটাকে একটি শিশুর অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে মানতে রাজিই নয়! এ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ! শাস্তি তো পেতেই হবে!

শাস্তি বলে শাস্তি! ওই একরত্তি মেয়েটাকে কী মারই না মারল অনিমেষ। এমনিতেই কথায় কথায় মেয়ে-বৌয়ের গায়ে হাত তুলতে সে অভ্যস্ত। আজ তার মাথায় এমনিতেই আগুন জ্বলছিল। তার ওপর শ্বশুর আর শাশুড়ির একনিষ্ঠ ঘৃতাহুতি। বাচ্চা মেয়েটা বেদম মার খেতে খেতে হাউ হাউ করে কেঁদে বলেছিল, 'আমি আর কখনও এমন করব না....প্লিজ বাবা! ....আমি আর করব না!'

'তুই জানিস না যে ওটা একটা চাইল্ড পর্নোসাইট!' পাগলের মতো মারতে মারতে বলেছিল তার বাবা, 'ফেসবুক বুঝিস, সেলফি বুঝিস; আর পর্নোসাইট বুঝিস না? বেশি পেকেছিস তাই না? নিজে উচ্ছন্নে যাচ্ছিস, আমাদেরও বরবাদ করে ছাড়বি—।'

ঐশানী তাকে থামানোর চেষ্টা করে, 'ওকে আর মেরো না! ও বুঝতে পারেনি—!'

'কী বুঝতে পারেনি?' তিতলির নরম ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছিল। লোকটা যেন রক্ত দেখে আরও হিংস্র, আরও উন্মত্ত হয়ে যায়, 'তুমি জানো? এখন চাইল্ড পর্নোসাইটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি! মেয়েকে আদর দিয়ে দিয়ে সর্বনাশ করা হচ্ছে! এই শিক্ষা দিয়েছ? এরপর রেপড হলে শান্তি হবে তোমার!'

ঐশানীর মনে হয়েছিল, এই মুহূর্তে মরে যেতে পারলে হয়তো ভালো হত! বাবা হয়ে কেউ মেয়ের সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারে! তিতলি দুই চোখে কাতর প্রার্থনা আর বিভীষিকা নিয়ে তাকিয়েছিল তার বাবার দিকে। পর্নোসাইট কী জিনিস তা এখনও ধরতে পারেনি আট বছরের মস্তিষ্ক। শুধু গড়াগড়ি খেতে খেতে পায়ে পড়ছিল, 'বা-বা! আর করব না, মে-রো না!'

তবুও থামেনি অনিমেষ! পাশ থেকে শাশুড়ি চেঁচিয়ে বলছিলেন, 'মার! আরও মার! মেরে ফ্যাল ওই গন্তের পাপকে!'

এখন ছোট্ট মেয়েটার শাস্তি হয়েছে। পুরোপুরি প্রাণে না মারলেও প্রায় আধমরা করে ছেড়েছে তাকে। কিন্তু প্রধান আসামি এখনও বাকি!

ঐশানীর মোবাইলটা আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখেছে অনিমেষ। যে করেই হোক, ডিলিট করতে হবে তিতলির ছবিটাকে। কিন্তু 'রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস'-এর কোনও অস্তিত্ব তার মোবাইলে নেই! ফেসবুক, আর কিছু মোবাইল গেম, অ্যাপস আছে ঠিকই। কিন্তু কোনও পর্নোসাইটের দেখা মিলল না। ওই সাইটটা ঐশানীর মোবাইলে অনেক ঘেঁটেঘুঁটেও খুঁজে না পেয়ে রাগে চিৎকার করে উঠল সে, 'মুছে দিয়েছ? সব মুছে দিয়েছ তাই না? কী ভেবেছ? সমস্ত রেকর্ড মুছলেই পার পাবে? দেখাচ্ছি মজা!'

বলতে না বলতেই জবরদস্ত একটা লাথি এসে পড়ল তলপেটে! ঐশানী প্রায় কঁকিয়ে ওঠে, 'মা-গো!'

'মায়ের নাম নিবি না!' সে দাঁত খিঁচিয়ে বলে, 'তোর মা-ও নির্ঘাৎ একটা বেশ্যা ছিল। জন্মের আগেই তোর বাপ মরে রক্ষা পেয়েছে! তুই কার মেয়ে কে জানে! এখন মেয়েটাকেও লাইনে নামাচ্ছিস!'

রেগে গেলে অনিমেষের হিতাহিতজ্ঞান থাকে না। এই সময় তাকে দেখলে ঠিক মানুষ বলে মনে হয় না। বরং যেন কোনও প্রাগৈতিহাসিক দানব! চোখদুটো করমচার মতো লাল টকটকে, মুখে ফেনা ভাঙছে, কথার সঙ্গে থুতু ছিটছে—সব মিলিয়ে বড় কদর্য মূর্তি তার! ঐশানী প্রথম আঘাতটা সামলে নিয়ে ক্ষীণ প্রতিবাদ করে, 'মা তুলে কথা বলবে না!'

'আলবাৎ বলব।' এবার তার চুলের মুঠি ধরে ঠাসঠাস করে পরপর কয়েকটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল অনিমেষ, 'সা-লি! সবসময় দেখি মা আর মেয়ে মোবাইল ফোন নিয়ে খুটুর খুটুর লাগিয়েই রেখেছে! কী করিস মোবাইলে? শালা, সারারাত ধরে মোবাইল বাজছে তো বাজছেই। মেয়ে পর্নোসাইটে রং মেখে ছবি দেয়! আর তুই কী করিস? ফেসবুকে সারারাত ধরে কোন নাগরের সঙ্গে চ্যাট করিস?—হ্যাঁ? শুধু চ্যাট না সেক্স চ্যাট?'

'মেয়েকে তো এই শিক্কেই দিচ্ছে!' শাশুড়ি ফের চিড়বিড়িয়ে ওঠেন, 'মোমের মতো বন্ন দেখলে হাবাতে পুরুষগুলো গলে যায়! মা-মেয়ের ওই সাদা রঙেরই গুমোর। আজ ওই বন্ন কালি করেই ছাড়বি—!'

শাশুড়ির কথার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বশুর ইতিবাচক মাথা নাড়লেন। অনির্বাণ বলে উঠল, 'ঠিক—ঠিক।'

৩

'রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস/পকেট ফুল অব পোজেস/আ হুশা, আ বুশা/উই অল ফল ডাউন'—! অনেকগুলো শিশু হাত ধরাধরি করে খেলা করছে। তার মধ্যে তিতলিও পা মিলিয়ে মিলিয়ে চক্রাকারে ঘুরছে। হাসছে খিলখিল করে। যেন সত্যি সত্যিই একরাশ গোলাপ নরম সোনালি রোদ্দুরের আলোতে ঝলমলিয়ে উঠছে। তার কাচের মতো স্বচ্ছ ত্বকের ওপর রোদ পড়ে পিছলে যাচ্ছে। তিতলি সত্যিই যেন একটা আস্ত প্রজাপতি! ছোট্ট একটা সোনালি রঙের পরি। হাওয়ায় কেমন উড়ছে দেখো—!

ঐশানী তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতেই যাচ্ছিল। না ধরলে ও উড়ে যাবে যে! কিন্তু তার আগেই উচ্চারিত হল 'উই অল ফেল ডাউন'! আর অমনিই ধপাস করে পড়ে গেল তিতলি! একদম কাদার মধ্যে চিতপাত! কর্দমাক্ত, ক্লেদাক্ত ছোট্ট পরি কেঁদে উঠল, 'মা-আ-আ-আ—!'

ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়েও যন্ত্রণায় কাতরে উঠল ঐশানী। পিঠের ওপরে জ্বলন্ত ইস্ত্রির ছ্যাঁকার জ্বালা! সঙ্গে সঙ্গেই সোনালি রোদকে মুছে দিল একরাশ গাঢ় কালো অন্ধকার! একটা জমাট ব্যথার মতো আঁধার ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। ব্যথিত সজল দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। ক্রমাগতই উচ্ছ্বসিত কান্না তার বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে উঠে আসতে চাইছে। জীবনে কখনও কি এমন কাদায় পড়তে হয় যে শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারেই মুখ ঢাকতে হবে? তিতলি কী করে পড়ে গেল! এমনভাবে পড়ল যে তাকে তুলতে গিয়ে ঐশানীও পড়ে যাচ্ছে বারবার। এ কেমন পতন!

তার মুখের ব্যথিত রেখাগুলো একটু নড়েচড়ে ওঠে। একটু দূরেই একটা জন্তুর জোরালো নিঃশ্বাসের শব্দ! আজ তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে মাংসাশী প্রাণীটা। সুযোগ পেলেই এমন করে। দেহের প্রতিটা যন্ত্রণার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণাও তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে তার অন্তরমহলে। তিতলিরা কখনও পড়ে যায় না! এই লোকগুলোই তাদের টেনে নামায় চূড়ান্ত কর্দমাক্ত পথে! 'রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস' একটা কবিতা! একটা নার্সারি রাইম। কিন্তু তাকেও পর্নোসাইট বানিয়ে ছেড়েছে কিছু নোংরা লোক। গোলাপের বুকে কাদা ছিটিয়েছে!

ভাবতে ভাবতেই একটা অসহায়তা তাকে ঘিরে ধরে। মায়ের মন ব্যাকুল আশঙ্কায় গুড়গুড় করে উঠল। তিতলির ছবিটা কি সত্যিই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে! নিশ্চয়ই হয়েছে। নয়তো মিসেস উমা দত্ত দেখলেন কী করে?

কথাটা মাথায় আসতেই একটা বিবমিষার সঙ্গে প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করল সে। এ ক্ষেত্রে দুটো সম্ভাবনাই হতে পারে। হয় স্বয়ং মিসেস উমা দত্ত তিতলির ছবি দেখেছেন, অথবা মিঃ দত্ত তাঁকে দেখিয়েছেন! অর্থাৎ মিসেস দত্ত বা মিঃ দত্তর মোবাইলে আছে ওই বিশেষ সাইটটা! ওঁদের মধ্যে কেউ একজন শিশুদের যৌনতায় তৃপ্তি খুঁজে পান! আচমকাই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল

মিঃ দত্তর ঘোলাটে চোখদুটো। ঠিক পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে লোকটা! তিতলিকে অনেকবার আদর করে চকলেটও দিয়েছে। যদি কখনও চকলেট দেওয়ার নাম করে ডেকে নিয়ে গিয়ে—!

মুহূর্তের মধ্যে ঐশানীর গোটা শরীর 'রি রি' করে ওঠে! তার মানে যে পাপকে মিসেস দত্ত এড়াতে চান, সেই পাপ তাঁর ঘরের মধ্যেই বসে আছে! শুধু কি তাই? তার চোখের সামনে একে একে ভেসে ওঠে সেই লোকগুলোর চেহারা, যারা ওদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে চলেছে। ওদের চোখের চাউনিগুলোও তো স্বাভাবিক ছিল না! ওরাও কেমন কামাতুরভাবে তাকাচ্ছিল না তিতলির দিকে? যেন একটা বাচ্চা মেয়ে নয়—বেওয়ারিশ একপ্লেট মাংস। যখন খুশি থাবা বসালেই হল! ওদের চোখগুলো কী পরম লালসায় চেটে যাচ্ছিল না তিতলির উন্মুক্ত বাহুমূল; উরু? ওরাও কি তবে ওই সাইটটা দেখে?

ঐশানী অনুভব করল চতুর্দিকে হাজার হাজার শ্বাপদের সবুজ চোখ যেন ক্রমাগত জ্বলছে আর নিভছে। শ্বাপদও নয়; আসলে নরপিশাচ। ওরা তিতলিকে দেখেছে, দেখছে! ওত পেতে বসে আছে শিকারের জন্য। কখন কামড় বসাবে এই আশায় লোভাতুর দৃষ্টিতে মেপে নিচ্ছে শিকারের পুরুষ্টু দেহ। পরম লালসায় ঠোঁট চেটে নিচ্ছে—!

কিন্তু শুধুই কি ওরা? ঐশানী জানে যে তার নিজের মোবাইলে 'রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস' কখনই ছিল না! যদি থাকত, তবে কখনও না কখনও নজরে ঠিকই পড়ত। তিতলি নিজে থেকে বড়জোর শুধু গেম ডাউনলোড করে। এরকম একটা পর্নোসাইটের খবর তার পাওয়ার কথাই নয়! তবে? ও নিজের ছবিটা ওই সাইটে দিল কী করে? কীভাবেই বা সাইটটার খোঁজ পেল সে! বাইরের কারোর মোবাইল তিতলি কখনই ঘাঁটে না! তাহলে কি—!

এতক্ষণে সবচেয়ে মারাত্মক সম্ভাবনাটার কথা মাথায় এল ঐশানীর! ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতেই তার সারা দেহে একটা হিমেল স্রোত বয়ে যায়! মুহূর্তের ভগ্নাংশে কেঁপে উঠল সে। এতক্ষণ বাইরের শ্বাপদদের কথা ভেবেই অস্থির হয়ে পড়েছিল। ভাবছিল, যদি কেউ শিশুর সারল্যের সুযোগ নিয়ে তিতলির ওপর অত্যাচার করে! কিন্তু এতক্ষণে যা বুঝল, তা হয়তো আরও মারাত্মক!

বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, নরপিশাচ তার তীক্ষ্ণ নখ আর দাঁত নিয়ে ঘরের মধ্যেই বসে আছে!

৪

তখন স্টোররুমে বন্দি হয়ে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল আট বছরের বিপন্ন শৈশব। তার চতুর্দিকে কীট-পতঙ্গের ডানার শব্দ! কোথাও ইঁদুরের খুটখুট। কোথাও বা আরশোলার ফড়ফড়। এতক্ষণ ধরে অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে তাকে ক্রমাগতই ভয় দেখিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ক্লান্তির কাছে, বেদনার কাছে হার মেনে যায় সব ভয়।

তিতলি ঘুমোচ্ছিল। তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রুবিন্দু, দুই ভুরুর মধ্যে স্পষ্ট একটা ভাঁজ বলে দেয় যে কোনওরকম নিশ্চিন্তির মধ্যে সে নেই। কোনওরকম সুখস্বপ্ন তাকে আলিঙ্গন করেনি। একেবারে চূড়ান্ত ভয়ের মধ্যেই ওর রাত কাটছে।

তার অজান্তেই কখন যেন খুট করে খুলে গেল স্টোররুমের দরজা! আস্তে আস্তে, অতি সন্তর্পণে একটা ছায়া ঘনিয়ে এল মেয়েটির খুব কাছে! হাঁটু গেড়ে বসল তার পাশে। কানের কাছে যেন দুঃস্বপ্নের মতো ফিসফিস করে গাইল সেই অস্ফুট গান :

'রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস/পকেট ফুল অব পোজেস—!'

গানটা শ্রবণেন্দ্রিয়ে আঘাত করতেই তিতলি তড়িদাহতের মতো লাফিয়ে উঠল! আট বছরের বাচ্চা মেয়ে ঘুম ভাঙামাত্রই বুঝে উঠতে পারেনি যে ঠিক কোথায় আছে। প্রতিটি বিপন্ন ও ব্যথিত শিশুর মতোই স্বাভাবিক প্রতিবর্তক্রিয়ায় সে ডেকে উঠল;

'মা!'

এক বিস্রস্তবসনা নারী বুকে জড়িয়ে ধরল তাকে; 'এই তো তিতলি! এই তো আমি!'

মাকে জড়িয়ে ধরে ঝড়ে বিপর্যস্ত প্রদীপের শিখার মতো কেঁপে উঠেছে সে। মায়ের হৃদস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের প্রতিটি কোষ, প্রতিটা শিরা-উপশিরা থরথরিয়ে উঠছে। আগ্রাসী কান্না আর কাঁপুনিকে কোনওমতে বুকের মধ্যে চেপে রেখে আর্তকণ্ঠে বলল তিতলি, 'মা, আমার ভয় করছে!'

অন্ধকারেই হাসল ঐশানী, 'ভয় কী মা? গান তো!'

'বাবা শুনতে পেলে মারবে—!'

'কেউ মারবে না!' সে দু-হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল নিজের আত্মজাকে, 'আয় আমরা গান গাই —রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস/পকেট ফুল অব পোজেস— তারপর?'

মেয়ে তখনও ভয়ে কাঁপছে, 'ওই গানটা গেও না মা! বাবা বলেছে পাপ—!'

তিতলি বাক্যটা অসমাপ্ত রেখেই চুপ করে যায়। ঐশানীর বুকে একটা জোরদার ধাক্কা লাগে। এই আট বছরের শিশুটার মনেও তবে শেষ পর্যন্ত পাপ ঢুকল! মারের দাগ তো একসময় মিলিয়ে যাবে। কিন্তু পাপবোধ! শৈশবের রেশমি কমনীয়তায় একবার যে ভাঁজ পড়ে, তা তো আর কখনই মিলিয়ে যেতে চায় না। তিতলি কি ভুলে যেতে পারবে এই দিনগুলোর কথা? নাকি আজীবন তাকে তাড়া করে বেড়াবে সেই অনন্ত পাপবোধ!

মা মৃদু হেসে সন্তানের উশকোখুশকো চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। চাপা সুরেলা স্বরে বাকিটুকু গেয়ে দেয়, 'আ হুশা, আ বুশা/উই অল ফল ডাউন/ফিল দ্য লাভলি সানশাইন/ফ্লাওয়ারস অল অ্যারাউন্ড/জাম্প আ লিটল জাম্প রাইট অফ দ্য গ্রাউন্ড—।'

মেয়েটা গভীর বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঐশানী আদর করে তার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'পড়ে তো সকলেই যায়। কিন্তু পড়ে গেলেও লাফিয়ে উঠতে হবে যে!'

তিতলি কী বলবে বুঝতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই ঐশানীর কথার মাথামুন্ডু বুঝতে পারছে না। কিন্তু তার মায়ের চোখে চকচক করছে রহস্যের আলো-আঁধারি খেলা। সে একে একে চারখানা মোবাইল ফোন এগিয়ে দেয় মেয়ের দিকে। গভীর রাতে, সবার ঘুমের সুযোগ নিয়ে, অতিকষ্টে চুরি

করে আনা মোবাইলগুলোকে যেন অসীম কৌতুকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এর মধ্যে কোনটা দিয়ে তুই ছবি তুলে পোস্ট করেছিলি বল তো!'

তিতলি নীরব। অপ্রস্তুতের মতো তাকিয়ে থাকে। তার বুকের ভেতর আবার সেই 'পাপ' নামের জীবটা আড়মোড়া ভাঙছে।

'কোন মোবাইলটা বল। তারপর আর আমরা এ বাড়িতে থাকব না। চুপিচুপি চলে যাব।' ফিসফিস করে বলে কৌতুকময়ী।

সে বিস্ময়বিহ্বল স্বরে প্রশ্ন করে, 'কোথায় যাব?'

ঐশানী ফিক করে হেসে ফেলল, 'গাছতলায়।'

৫

পরদিন সকালবেলায় মা এবং মেয়েকে আর সে বাড়িতে পাওয়া গেল না!

কখন যে তারা নিশ্চুপে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে, তা কেউ টের পায়নি। আলমারির লকার থেকে টাকা-পয়সা কিংবা গয়নাগাঁটি কিছুই নিয়ে যায়নি ওরা। সব কিছুই যথাস্থানে আছে, শুধু মানুষ দুটোই নেই! তারা এমনভাবে অদৃশ্য হয়েছে যেন আদৌ কোনওদিনই এখানে ছিল না!

মানুষ দুটোকে অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু পাওয়া গেল একটা চিরকুট! তাতে শুধু একটাই বাক্য লেখা আছে :

'পারলে নিজের মায়ের গর্ভে একটা লাথি মেরো!'

দুই ভাইয়ের দু-জোড়া চোখ পরস্পরের দিকে তাকায়! ওদের মধ্যে একজন অত্যন্ত বিপন্নভাবে কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু তার শব্দগুলোকে বেমালুম কেড়ে নিয়ে একটা বে-আক্কেলে টিকটিকি ডেকে ওঠে :

'ঠিক—ঠিক!'

—

সীতা

১

অবশেষে বনোয়ারিলাল শ্রীঘরে গেল!

সংবাদটা শুনে আদৌ বিস্মিত হইনি। বরং এতদিন কেন যে ও জেলে যায়নি, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার! গত কয়েক বছর ধরেই হাজতবাসের ফাঁড়াটা ওর মাথার ওপর খাঁড়ার মতো ঝুলছিল। কিন্তু কোনওবারই জেলের ভাত খেতে হয়নি ওকে। এই প্রথমবার ব্যতিক্রম ঘটল!

খবরটা পেলাম সুখিয়ার কাছে। সুখিয়া বনোয়ারিলালের দাদা বংশীলালের বৌ। ওরা দুই ভাই-ই কয়লাখনির অস্থায়ী শ্রমিক। বলাই বাহুল্য, সকালে বেরোলে বিকেলে ফিরে আসবে কিনা, সে গ্যারান্টি ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না। তার ওপর একা রামে রক্ষা নেই, দোসর লক্ষ্মণ! ওই বিপজ্জনক কাজের ফাঁকেই দুই ভাই মিলে আবার সুযোগ পেলেই কয়লা চুরি করে। তাতে সংসারে দুটো পয়সা বেশি আসে ঠিকই, কিন্তু কয়লা চুরি করায় প্রাণের ঝুঁকি আছে। যে কোনও সময় মারা পড়তে পারে। উপরন্তু ধরা পড়লে জেলের ভাত খেতেও হতে পারে।

বনোয়ারিলালের শ্রীঘরে গমনের স্বপক্ষে কয়লাচুরি ও বে-আইনিভাবে বিক্রি করার কারণই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু শুধু এটুকুতেই তার কার্যকলাপ থেমে থাকেনি। জেলে যাওয়ার রাস্তাটা সে আরও বেশি প্রশস্ত করেছিল নিজের বৌ রামদুলারিকে নিয়মিত ঠেঙিয়ে! যার শহুরে ও পোশাকি নাম, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স! কিন্তু রামদুলারি বা সুখিয়ারা জানে না ফোর নাইন্টি এইট কাকে বলে। বরং তাদের ধারণা, মরদ যখন, তখন তো পেটাবেই! খেতে, পরতে দেয়, আর 'লুগাইকে' একটু পেটাবে না?

একটি নামকরা এন জি ও-র পক্ষ থেকে যখন আমি বিহারের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে এসে পৌঁছই তখন প্রথমদিকে জায়গাটাকে শান্তিপ্রিয় বলেই মনে হয়েছিল। এখানকার বেশির ভাগ লোকই কয়লাখনিতে দিন-মজুর হিসাবে খাটে। আবার কেউ বা অন্যের জমিতে মাটি কোপানো, লাঙল চালানোর কাজ করে। যখন কাজ থাকে, দিনান্তে পয়সা পায়, তখন বাড়িতে দু-বেলা হাঁড়ি চড়ে। অন্যথায় পেটে কিল মেরে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। বিনোদন বলতে বিড়ি, বা গাঁজার ছিলিমে সুখটান। সঙ্গে উৎকট গন্ধওয়ালা দেশি মদ! কখনও কখনও মুরগি লড়াই, কিংবা ছোটখাটো 'নৌটঙ্কি' বা কুস্তির 'দঙ্গল'। এর বেশি ফূর্তি করার সামর্থ্য ওদের নেই। ইলেক্ট্রিসিটি থাকলেও সারি সারি ঝুপড়িগুলোয় তার চোখ ধাঁধানো আলোর অনুপ্রবেশ এখনও হয়নি। বরং সন্ধে হলেই তেলের কুপি জ্বলে ওঠে। আমার আজন্ম শহুরে চোখ সেই শান্ত আলোয় বড় আরাম পায়। মনে হয়, একমুঠো জোনাকির স্নিগ্ধ আলো কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে চতুর্দিকে। ঝুপড়িগুলোয় যেন নেমে এসেছে এক অদ্ভুত ঠান্ডা দীপ্তি! প্রায় রাতেই এন জি ও-র সবেধন নীলমণি গেস্টহাউসের বারান্দায় বসে তাকিয়ে থাকতাম ওই বিন্দু বিন্দু আলোর দিকে। বড় ভালো লাগত।

কিন্তু সপ্তাহখানেক ঘুরতে না ঘুরতেই বুঝলাম অশিক্ষা আর কুসংস্কারের আড়তের মধ্যে এসে পড়েছি। আমাদের এন জি ও এই গ্রামে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রাণপণ খাটছিল। কিন্তু আখেরে কোনও লাভ হয়নি। স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, রোগী নেই। থাকবে কী করে? এখানে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারের কাছে যায় না, বরং দৌড়য় জনৈক জংলিবাবার কাছে। ডাক্তারবাবু একদিন আফসোস করে বলছিলেন, 'কেন যে মরতে এখানে এলেন! কখনও কখনও আমারও সেই জোকটার মতো মনে হয় যে, নরক থেকে এখানে ফোন করলে নির্ঘাৎ লোক্যাল কলই হবে! আমি এখানে ট্রিটমেন্ট করার জন্য বসে আছি, কম্পাউন্ডার আছে, ওষুধ আছে, টেবিল-চেয়ার; সব আছে। কিন্তু পেশেন্ট নেই।'

'কেন? পেশেন্ট থাকবে না কেন?' অবাক হয়ে বলি, 'ট্রিটমেন্ট তো ফ্রি-তে দেওয়া হচ্ছে! এমনকি ওষুধও ফ্রি! এক পয়সাও লাগবে না! তবে?'

ডাক্তারবাবু হাসলেন, 'ওইখানেই মার খা গিয়া ইন্ডিয়া! আমি শুধু ওষুধই দিতে পারি। জংলিবাবার মতো হাত ঘুরিয়ে 'নিম্বু' বা শূন্য থেকে 'বিভূতি', আই মিন ছাই তো আমদানি করতে পারি না!'

তাই তো! কঠিন সমস্যা! ডাক্তারবাবু ওষুধ দিতে পারেন, লেবু বা ছাই আমদানি করবেন কী করে! অতএব স্বাস্থ্যকেন্দ্র ফাঁকাই পড়ে থাকে। কম্পাউন্ডার ও ডাক্তার সম্মিলিত ভাবে মশা ও মাছি তাড়ান!

ডাক্তারবাবু আপনমনেই বিড়বিড় করে বলেন, 'এই তো! কিছুদিন আগেই একটা বাচ্চা মেয়ের জ্বর হয়েছিল! পুরো হলুদ হয়ে গিয়েছিল। ক্লিয়ার কেস অব জন্ডিস! কিন্তু তাকে ডাক্তারখানায় আনা তো দূর, সবাই মিলে জংলিবাবার কাছে নিয়ে গেল! জংলিবাবা পরীক্ষা করে বললেন, 'ভূতে ধরেছে।' তারপর তিনদিন ঝাঁটাপেটা, লোহার ছ্যাঁকা দেওয়ার পর ভূত তো গেলই, মেয়েটার প্রাণও গেল! আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম...শুধু দেখলাম...!'

ওঁর হাহাকারের সান্ত্বনা আমার কাছে ছিল না! শুধু বুঝলাম, স্বাস্থ্যের এই হাল! আর শিক্ষার কথা বলতে গেলে কান্না পেয়ে যায়। আমি নিজেই এখানে শিক্ষকতা করতে এসেছি। আমাদের এন জি ও আপাতত একটা মেটে বাড়িতে শ্রমিক সন্তানদের জন্য অস্থায়ী স্কুল গড়ে তুলেছে। সেখানে পড়ানোর জন্য একজন হেডস্যার ও আমাকে নিয়ে সর্বসাকুল্যে দুজন শিক্ষক উপস্থিত। অফিস থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এই মেটে বাড়িটা পাকা হবে কি না তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ছাত্রসংখ্যার ওপরে! টার্গেট টাইম : দু-বছর। কিন্তু আমি এখনই হলফ করে বলতে পারি, জীবনেও হবে না! দশমাস আগে ছাত্রসংখ্যা ছিল শূন্য! এখনও তাই! তাও ভালো জনগণনা মাইনাসে রান করে না! তাই বৎসরান্তে রিপোর্ট করার সময় 'উন্নতি হয়নি' বলতে পারব। কিন্তু 'অবনতি হয়েছে' তা আমার অতিবড় শত্তুরও প্রমাণ করতে পারবে না!

'আগের জন তিনমাসেই পালিয়েছিল।' হেডস্যার আবার লখনৌ-র মানুষ। প্রথম সাক্ষাতেই চোস্ত হিন্দিতে বললেন, 'আপনি কবে পালাচ্ছেন জনাব?'

প্রথম সম্ভাষণেই হকচকিয়ে গেলাম। আমার বিস্ময় দেখে ভদ্রলোক হেসে ফেলেন, 'আপনি 'কলকত্তার' লোক। এখানকার হাল-চাল দেখলে দু-দিনেই 'পালাই পালাই' করবেন। এদের পড়ানোর সাধ্যি স্বয়ং দেবী সরস্বতীরও নেই, তো আমরা কোথাকার খাঞ্জা খাঁ?'

স্কুলের হেডস্যার যদি প্রথমেই এমন একখানা আছোলা বাঁশ দিয়ে দেন, তবে শিক্ষক বেচারি যায় কোথায়? তবু ভাবলাম, এত সহজে ছাড়ব না।

'প্রথম প্রথম অনেক চেষ্টা করেছি।' হেডস্যার নির্লিপ্ত মুখে জানালেন, 'কিন্তু বাচ্চাগুলো পড়বে কী! ওরাও তো বাপ-মায়ের সঙ্গে কাজে বেরোয়। কেউ কয়লাখনিতে যায়। কেউ জমিতে খাটার কাজ করে।'

'কিন্তু শিশুশ্রম তো বে-আইনি!'

'আইন!' এবার সজোরে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, 'এখানে আইন কোথায়? 'পুলিশ-ঠানে' একটা আছে ঠিকই, কিন্তু আইন নেই!'

বুঝলাম, 'পুলিশ-ঠানে' আসলে শালগ্রাম শিলারই নামান্তর! তবু হাল ছাড়িনি। এই এন জি ও-তে এটাই প্রথম আমার 'বিগ ভেঞ্চার'। এতদিন বয়েস নিতান্তই কম বলে ছোট-খাটো কাজই করতে হচ্ছিল। নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ এই প্রথম। মনে মনে ভাবলাম, এত সহজে ছাড়ব! চ্যালেঞ্জ নিয়েই দেখি না কী হয়! আমিও নজরুল, নেতাজি, ক্ষুদিরামের দেশের লোক। 'আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেইদিন হব শান্ত...!'

অনেক উত্তপ্ত কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করে অবশেষে মাঠে নেমেই পড়লাম। মনে মনে বিদ্রোহী কবিতা আওড়ালেও বাহ্যিক ভাবটা একদম বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতো! যেন দোরে দোরে গিয়ে ঝুলি পেতে বলছি, 'ভিক্ষাং দেহি'! কুড়িয়ে বাড়িয়ে যদি একটি ছাত্র বা ছাত্রী মিলে যায় তবেই একেবারে আগ্রা ফোর্ট জয় করে ফেলব! কিন্তু 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।' প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতেই চা, গুড়, মুড়ি পেলাম, সসম্মানে 'মাস্টারজি' অভিধাও জুটল, হাতপাখার মিঠে বাতাসও পেলাম; কিন্তু ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেল না! ঘরে ঘরে শুধু বাটিটা পাততে বাকি রেখেছি। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। ঘরের শিশুদের ধানখেতে, কয়লাখনিতে, কিংবা কোনও লালার চাল-কলে, তেল-কলে খাটতে দিতে রাজি ওরা। কিন্তু স্কুলে পড়তে পাঠালেই 'সত্যনাশ'। বেশ কয়েকবার বোঝানোর চেষ্টাও করলাম। সবার মুখেই এক কথা, 'আমার একার রোজগারে 'গেরস্থি' চলে কী করে মাস্টারজি? একেই কাজের ঠিক নেই। আজ আছে, কাল নেই। বাঁচতে হলে তো সবাইকেই 'মেহনত' করতে হবে। আর আমাদের মতো মজুরদের ঘরের ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করে কোন 'জজ-কালেক্টর' হবে! ওসব আপনাদের মতো বড়লোকদের ব্যাপার! মজদুরি খাটলে পয়সা আসবে, 'সকুল'-এ পড়ে কি দু-বেলার 'দাল-রোটি' জোগাড় করতে পারবে বাচ্চা?'

এই 'ঘর-ঘর' ক্যাম্পেনিং-এর সময়ই দেখা হল বনোয়ারিলালের সঙ্গে! ওর দাদা বংশীলাল এবং বনোয়ারির বাড়িতেও গিয়েছিলাম ছাত্র-ছাত্রীর খোঁজে। কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম তাতে চক্ষু চড়কগাছ! বনোয়ারি তখন ওর বৌ রামদুলারিকে পেটাতে ব্যস্ত ছিল। উঠোনে পা দিয়েই বুঝলাম, টাইমিঙে ভুল

হয়েছে! সামনে এক ক্ষীণদেহী, বিবর্ণ-শুকনো-খয়াটে চেহারার নারী ঘুসি-লাথি খেয়ে কঁকিয়ে যাচ্ছে, আর এক পুরুষ তাকে মেরে মেরে পাট পাট করছে। গালি দিচ্ছে, 'কালমুহি, করমজলি! আজ তোকে মেরেই না ফেলেছি!'...

'মাস্টারজি...!'

মুহূর্তের মধ্যে চিন্তাসূত্রটা ছিঁড়ে গেল। কিন্তু সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে! সামনেই ক্লান্ত-ধ্বস্ত চেহারার সুখিয়া দাঁড়িয়েছিল। ক্লান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। তিনদিন আগেই সে একটি সন্তান প্রসব করেছে। এ গ্রামের সকলেই জেনে গিয়েছে আমি 'ছাত্রবিহীন মাস্টারজি' ; অর্থাৎ 'মিনিস্টার উইদআউট পোর্টফোলিও'! কিন্তু পড়াশোনা জানি বলে গাঁয়ের অনেকেই আমার কাছে সমস্যা সমাধানের আর্জি নিয়ে আসে। আজ বনোয়ারিলালের হাজত-বাসের খবর নিয়ে এসেছে ভগ্নদূত নিরুপায় সুখিয়া!

মনে মনে ভাবছিলাম, 'পুলিশ-ঠানে' নামক শালগ্রাম শিলাটি হঠাৎ নড়েচড়ে বসল কেন? এতদিনে কি তবে কয়লা-চুরির অপরাধ ধরা পড়ল? না আচম্বিতে রামদুলারির মাথায় কোনও দিব্যশক্তি ভর করে ফোর নাইন্টি এইটের পাঠ পড়িয়েছে! রামদুলারিও তো গর্ভবতী! নাকি গর্ভবতী বৌটা মার খেতে খেতে মরেই গেল বলে খুনের অভিযোগে ধরেছে পুলিশ? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে বেশ হয়েছে। অনেক আগেই ওর শাস্তি হওয়া উচিত ছিল!

নির্বিকার ভাবে জানতে চাই, 'পুলিশ ধরেছে কেন? কয়লা চুরি করেছে? না বৌটাকে খুন করেছে?'

সুখিয়া ছলছল চোখে বলল, 'না মাস্টারজি। বনোয়ারি রামদুলারিকে পেটায়নি।' একটু থেমে সজল চোখে জানায় সে, 'ও বংশী...মানে আমার মরদটাকে পিটিয়েছে! পিটিয়ে নাক-মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। ও 'ঠানে'তে বনোয়ারির নামে 'রপট' লিখিয়েছে হুজুর! এদিকে রামদুলারিরও পেট হয়েছে। সকাল থেকে কিছু খায়নি সে। খালি কাঁদছে। এখন আপনি কিছু করুন। নয়তো পুলিশ বনোয়ারিকে ছাড়বে না! রামদুলারি কেঁদে কেঁদে জান দিয়ে দেবে।'

যাঃ কলা! এ তো উলটপুরাণ! মাথায় আস্ত আকাশ ভেঙে পড়লেও বোধহয় এত আশ্চর্য হতাম না! শেষ পর্যন্ত বনোয়ারি রামদুলারিকে নয়, বংশীলালকে পেটানোর অপরাধে জেলে গেল! ভাবা যায় না! কবিগুরু এই পরিস্থিতিতে থাকলে নির্ঘাৎ একটা আপ্তবাক্য লিখে ফেলতেন :

'বৌ ঠ্যাঙাইলে নিস্তার আছে, ভাই ঠ্যাঙাইলে নাই!'

২

'আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন মাস্টারজি?' একমুখ জর্দাপানের পিক ফেলে বললেন দারোগা, 'এ তো ওদের 'নিজি' মামলা। এক ভাই আরেক ভাইকে পিটিয়েছে। পুলিশে 'রপট' লিখিয়েছে। এরপর দেখবেন একটু পরেই দুই ভাই গলা জড়াজড়ি করে কান্নাকাটি করবে। 'মাফি' চাইবে। তারপর নালিশ তুলে নিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বাড়ি চলে যাবে। বংশী আর বনোয়ারি, দুটোই সমান 'নৌটঙ্কিবাজ'!'

'নিজি' মামলা আর পারিবারিক 'নৌটঙ্কি'র মধ্যে পুলিশ কেন মাথা ঘামাচ্ছে তা বুঝতে অবশ্য বাকি ছিল না। বংশীলাল চোরাই কয়লার দামের 'হিস্যা' দারোগা সাহেবকে দেয়। অতএব সেই কড়ক নোটের সুগন্ধ শালগ্রাম শিলাতেও প্রাণসঞ্চার করেছে। আমি একঝলক বনোয়ারিলালের দিকে দেখলাম। লোহার গরাদের পিছনে সে বিস্রস্ত, অবিন্যস্ত হয়ে বসে আছে। মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। চুল উশকোখুশকো।

গরাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'বংশীকে পেটালি কেন?'

সে বলল, 'বংশী ভাবিকে পেটাচ্ছিল। তাই আমিও দিয়েছি কয়েক ঘা!'

এবার আর আকাশ নয়, গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাই বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল মাথায়! এ কী কথা শুনি মন্থরার মুখে! যে নিজেই বৌ-পেটানোয় ওস্তাদ, সে কি না বৌদির গায়ে হাত তুলেছে বলে নিজের দাদাকেই পিটিয়েছে! এ চৈতন্য হল কবে ওর?

আমার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে বনোয়ারি যেন অনুচ্চারিত প্রশ্নটা বুঝে নিল। আস্তে আস্তে বলল, 'ভাবি আবার লড়কি পয়দা করেছে। তাই দাদা পেটাচ্ছিল! ম্যায়নে ভি দিয়া রখকে!' সে ভাসাভাসা চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে, 'আপনিই তো বলেছিলেন মাস্টারজি, যে লড়কি লছমীজির অংশ হয়! সীতার জাত লড়কি! তবে সীতা-মাইয়ার অপমান কী করে হতে দিই?'

এ কী! এ যে পুরো সীতাভক্ত হনুমান! এই ভাবান্তর হল কী করে? কবেই বা হল! বনোয়ারি ভিতরে ভিতরে এতটা পাল্টেছে, টেরই পাইনি! এ কী আদৌ সেই বনোয়ারিলাল...!

...সেদিন বনোয়ারি একটা আস্ত বাঁশ দিয়ে এলোপাথাড়ি পেটাচ্ছিল বৌটাকে! অসহায় রামদুলারি মাটিতে পড়ে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছিল আর কাঁদছিল! বংশী আর সুখিয়া নীরব দর্শক! দৃশ্যটা দেখে আর বৌদ্ধ ভিক্ষুর ইমেজ বজায় রাখতে পারলাম না। বাঁশটা ফের বিপজ্জনক ভাবে তুলেছিল বনোয়ারি। আমি লাফ মেরে এগিয়ে গিয়ে খপ করে তার হাত চেপে ধরি।

বনোয়ারি রক্তচক্ষু তুলে আমার দিকে তাকায়। একটু অনুতাপও নেই ওর মুখে। বরং পারলে যেন বাঁশটা রামদুলারির মাথায় না বসিয়ে আমার মাথাতেই বসায়! কিন্তু অত সহজ নয়। আমার হাত খেটে খাওয়া মজুরের না হলেও কলেজ লেভেলে চ্যাম্পিয়ন বক্সারের কড়া হাত। বনোয়ারি সেটা বুঝতে পেরেছিল। প্রথমে রাগ, পরে বিস্ময় ছাপ ফেলল ওর মুখে। রাগে গরগর করে বলল, 'কে আপনি? আমাদের ঘরের ব্যাপারে দখলদারি করছেন কেন?'

রামদুলারির দিকে তাকালাম। ওর চোখে জল। দু-হাত জোড় করে অসহায় মিনতিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখেই বুঝলাম, মেয়েটি এই প্রথম মার খাচ্ছে না। আগের মারের দাগগুলো এখনও তার মুখ থেকে অবলুপ্ত হয়নি।

আমার মাথার ভেতরটা দপ করে জ্বলে উঠল। বললাম, 'লজ্জা করে না! নিজের বৌকে এমন অমানুষের মতো পেটাচ্ছ! তোমাকে আমি পুলিশে দেব!'

'পুলিশ!' বনোয়ারি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে, 'কী অপরাধ করেছি আমি?'

'স্ত্রীকে পেটানো আইনত অপরাধ।' দাঁতে দাঁত পিষে বললাম, 'এই অপরাধে তোমার জেলযাত্রা কেউ আটকাতে পারবে না! এটা ভারতীয় কানুন।'

'ছ্যাঃ!' বনোয়ারি হাতের বাঁশটা ফেলে দিয়ে বলল, 'আপনিও দেখছি আগের 'নাকচড়ি' মাস্টারনিটার মতো কথা বলছেন! আমি পাপ করেছি? ওই শালিকে জিজ্ঞাসা করুন, ও কী করেছে? তিন বছর ধরে আমার ঘরে 'লড়কি' পয়দা করছে!'

'লড়কি পয়দা করেছে তো কী? মেয়েরা মানুষ নয়?'

'ওসব আমি জানি না!' তেড়িয়া ভঙ্গিতে জানায় সে, 'জংলিবাবা বলেছে আমার ঘরে 'রামললা'র অবতার আসবে। রামললা জংলিবাবার স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি আমার ঘরে আসবেন! আমার কিসমত চমকাবে। তার জন্য ঘরে যা ছিল সব বেচেবুচে প্রতিবছর ছেলের জন্য যজ্ঞ করাচ্ছি জংলিবাবাকে দিয়ে! আর এই 'করমজলি' খালি লড়কির পর লড়কিই পয়দা করেছে। এটা পাপ নয়?'

বলতে বলতেই সে ফের তেড়ে গেল মেয়েটির দিকে, 'শালি, মেরেই ফেলব আজ তোকে!'

রামদুলারি ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। আমার মাথাতেও খুন চেপে গেল! এতদিন ধরে কুসংস্কারের সঙ্গে লড়তে লড়তে আমারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। অন্ধত্বেরও একটা সীমা আছে। সপাটে এক ঘুসি বসিয়ে দিলাম ওর মুখে। বক্সারের ঘুসি! সামলাতে না পেরে পড়ে গেল বনোয়ারি!

'তোর জংলিবাবার এইসি কি তেইসি! যজ্ঞ করলে ঘরে রাম আসবে?' রাগে অন্ধ হয়ে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল। কী বলছি, কী করছি খেয়াল ছিল না। আঙুল তুলে বললাম, 'জীবনেও আসবে না! কারণ রাম নারায়ণের অংশ! আর নারায়ণ লক্ষ্মীকে ছাড়া কখনও একা আসেন না! লক্ষ্মীর অংশ হলেন রাধা, সীতা। মেয়ে নন ওঁরা? তোরা যখন রাম নাম করিস, তখন কার নাম আগে বলিস? যখন ডাকাডাকি করিস তখন সীতা-রাম, রাধে-শাম বলিস, আর এটাও বুঝিস না রাম বলার আগে সীতার নাম আসে? শামের আগে রাধা? কাউকে আজ পর্যন্ত রাম-সীতা বলতে শুনেছিস, রাঘব-জানকী বলতে শুনেছিস? সবসময় সীতা রামের আগে থাকে, জানকী-রাঘব বলা হয়। শামের আগে রাধা, নারায়ণের আগে লক্ষ্মী! আর 'লড়কি' লক্ষ্মীর অংশ হয় শুয়োরের বাচ্চা! যেখানে লক্ষ্মীর এমন হেলাফেলা, যেখানে সীতার জাতের 'মোল', 'ইজ্জত' নেই; সেখানে রাম কোনওদিন আসে না! আসবেও না! আর রইল তোর জংলিবাবা? তাকেও দেখে নেব আমি!'

কথাগুলো ছুড়ে দিয়েই হনহন করে চলে এসেছিলাম। এরকম নাটকীয় ভাষণ আগে কখনও দিইনি। রক্তারক্তি কাণ্ডও হয়ে যেতে পারত! কিন্তু আসার আগে দেখেছিলাম বনোয়ারি কেমন যেন হতবাক হয়ে বসে আছে। পালটা মার দেওয়া তো দূর, সে যেন একেবারে শক্তিহীন হয়ে মূঢ়ের মতো এলিয়ে পড়েছে উঠোনে!

এই ঘটনা রাষ্ট্র হতে বেশি সময় নেয়নি। দাবানলের মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। হেডমাস্টারমশাই এবং ডাক্তারবাবু আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। বললেন, 'সর্বনাশ! সত্যিই কি আপনি জংলিবাবার বিরুদ্ধে স্টেপ নেবেন?'

আমার গরম রক্ত তখন টগবগিয়ে ফুটছে, ‘নিশ্চয়ই। ওই ভণ্ডবাবাই হল সব নষ্টের গোড়া! ওকে তো আমি...।’

হেডমাস্টারমশাই সভয়ে বললেন, ‘ওসব করার কথা মনেও আনবেন না। ঐ জংলিবাবা ডেঞ্জারাস লোক। আপনার আগে যে দুজন টিচার এসেছিল, তারাও ওই লোকটার এগেনস্টে স্টেপ নিতে চেয়েছিল। অমনি গ্রামবাসীদের জংলিবাবা বোঝালেন যে ওরা নাকি শয়তানের দূত! ওদের পুড়িয়ে মারলে স্বর্গের দরজা খুলে যাবে। অনেক পুণ্য হবে। ব্যস, গ্রামবাসীরা একদিন রাতে এসে ওদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল!’

শুনতে শুনতে রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বলি, ‘তারপর?’

ভদ্রলোক হাসলেন, ‘দুজনেরই বরাত ভালো ছিল। কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে আসতে পেরেছিলেন। তারপরই কালক্ষেপ না করে সিধা চম্পট! আপনাদের কলকাতা অফিস এই ঘটনা জানে। সেইজন্যই প্রথম দিন জানতে চাইছিলাম, কবে পালাচ্ছেন?’

এবার পুরো ছবিটা পরিষ্কার হল। সম্ভবত আমার অন্য কোলিগরা এই ঘটনা জানে বলেই কেউ আসতে রাজি হয়নি। যেহেতু আমি তখন নতুন জয়েন করেছি, কিছুই জানতাম না তাই বাড় খেয়ে শহিদ হওয়ার জন্য আমাকেই এখানে পাঠিয়েছে অফিস। আমি যোগ্যতর বলে নয়!

ডাক্তারবাবু জানান, ‘পৃথিবী উলটে যাক, কিন্তু জংলিবাবার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলবেন না। একটু সাবধানেও থাকবেন। এ ব্যাটারা দল বেঁধে মারপিট করতে এক্সপার্ট।’

আমি হেসে জানাই, ‘অত সহজ নয়। দল বেঁধে মারতে এলে আগে কয়েকটাকে মেরেই মরব। সে ক্ষমতা আছে।’

ডাক্তারবাবু বিড়বিড় করেন, ‘তবু হাতের কাছে একটা লাঠি রাখবেন। বলা যায় না...!’

ডাক্তারবাবুর সামনে ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিলেও মনে কিন্তু একটা ভয় থেকেই গেল। এরপর সচরাচর রাতে বাইরে বেরোতাম না। একটা প্রমাণ সাইজের লাঠি ঘরে মজুত রাখলাম। রাত্রে ঘুম হত না! কী জানি! যদি বনোয়ারিলাল দলবল নিয়ে এসে হাজির হয়...! যদি জংলিবাবার নির্দেশে ‘গৃহদাহ’ কেস করে দেয়...!

বনোয়ারি অবশ্য এল। কিন্তু দলবল নিয়ে নয়। একদিন ভোর রাতে দরজায় জোরালো নকের আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠলাম। পোক্ত লাঠিটা বিছানার পাশেই ছিল। শক্ত করে চেপে ধরে বলি, ‘কে?’

উলটো দিক থেকে ভেজা ভেজা গলার স্বর ভেসে এল, ‘মাস্টারজি, আমি বনোয়ারি!’

নামটা শুনেই আমার হাতের মুঠো আরও শক্ত করে লাঠিটাকে চেপে ধরল, ‘কী চাও?’

‘থোড়া বাতচিৎ করতে চাই মাস্টারজি।’

কথা বলার সুরটা অবশ্য যথেষ্টই নরম ছিল। তবু সন্দিগ্ধ স্বরে বলি, ‘বাতচিৎ করতে এসেছ, না দলবল নিয়ে মারপিট করতে?’

অন্যপ্রান্ত থেকে বনোয়ারির বিব্রত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘রামললার কিরে বাবু। স্রেফ কয়েকটা কথা বলতে এসেছি। আমি একা। আর কেউ নেই!’

কথা শুনে মনে হল সত্যি কথাই বলছে। তবু সাবধানের মার নেই। একহাতে লাঠি বাগিয়ে ধরে অন্যহাতে হুড়কো খুলে দিলাম!

তারপর যা ঘটল, তা অবিশ্বাস্য! বনোয়ারি কথা নেই বার্তা নেই, হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে আমার দু-পা জড়িয়ে ধরল! কান্নাবিকৃত স্বরে বলল, ‘আপনি ঠিকই বলেছিলেন হুজুর! আমি পাপী! না বুঝে অনেক পাপ করেছি। সিয়া-মা’র জাতকে দূরছাই করেছি! তাই রামললা আমার কাছে আসছেন না! জংলিবাবাও বলল, আগে সিয়া, পরে রাম! সীতা না এলে রাম আসে না! যেখানে সীতা-মাইয়া নেই, সেখানে রামজি থাকবেন কী ভাবে?’

মনে হল বোধহয় সুকুমার রায়ের ‘হযবরল’ গল্পের মতো আমারও নাম কেউ ‘কিংকর্তব্যবিমূঢ়’ রেখে দিয়েছে, অথবা ও ফরাসি ভাষায় কথা বলছে! ঘটনা যে এমন ট্র্যাপিজের খেলের মতো ডিগবাজি খাবে স্বপ্নেও ভাবিনি। কোনমতে প্রাণপণে পা ছাড়িয়ে নিয়ে বলি, ‘আরে ঠিক আছে...ঠিক আছে।’

‘না মাস্টারজি!’ সে নাছোড়বান্দা। ফের পা জড়িয়ে ধরেছে, ‘ওই লাঠিটা আপনি আমার পিঠে ভাঙুন! আমি পাপী। মহাপাপী! আমি সীতা-মাকে অবহেলা করেছি। রামললাও তাই গুসসা করে আমার ঘরে আসছেন না! মারুন মাস্টারজি!’

শুরু হয়েছিল মারপিট দিয়ে। কিন্তু কিছুদিন গড়াতে না গড়াতেই বন্ধুত্ব জমে গেল। বনোয়ারিলাল নিয়ম করে বিকেলবেলায় নানারকম ‘ভাজি-পুরি’ নিয়ে এসে হাজির হত। অনেক বারণ করেছিলাম। ও শোনেনি। রোজ এসে এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা ধরে গল্প করত, সুখ-দুঃখের কথা বলত। ওর বৃদ্ধ-বাপ মা এখনও বেঁচে আছেন। কিন্তু বংশী বা বনোয়ারি, কেউই ওদের দেখে না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এই গ্রামেই ওর বোন আর বেহনোই-এর সঙ্গে থাকেন। বংশী আর বনোয়ারির একটাই দুঃখ। মা ষষ্ঠীর কৃপায় বংশীর চার সন্তান। আর বনোয়ারির তিন। কিন্তু কারোরই পুত্রসন্তান নেই। সবই কন্যাসন্তান।

‘মাস্টারজি, বেটা না থাকলে যে নরকেও ঠাঁই হবে না!’ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে জানিয়েছিল বনোয়ারি, ‘ছেলের হাতের জল না পেলে যে আত্মার শান্তিও হবে না! লড়কি তো সুখের পায়রা। আজ এখানে বকম বকম করছে, অন্য বাড়িতে দানা-পানি পেলে সেখানেই উড়ে চলে যাবে। বুড়ো বয়েসে তবে দেখবে কে?’

ভয়ংকর হাসি পেল। কোনওমতে হাসি চেপে বললাম, ‘তাই? তা তোর বাপ-মায়ের তো দু-দুটো বেটা! বুড়ো বয়েসে ওদের কে দেখছে? বেটা না বেটি?’

বনোয়ারি একটু থমকাল। কী বুঝল কে জানে! কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে তারপর বলল, ‘কিন্তু বেটার হাতের জল না পেলে যে স্বর্গ নসিব হয় না! পরজন্মে মানব জন্মও মেলে না!’

মৃদু হেসে জানাই, ‘ভাই, আমি শুধু এইটুকু জানি যে এ জন্মে যদি বেঁচে থাকতে ভাত-জল, সন্তানের আদর-যত্ন না পাই, তো মরার পরে ওই মশা মারার ধূপ আর পিণ্ড দিয়ে আমার কাঁচকলা

হবে! না খেতে পেয়েই যদি মরি, তবে যম শিং নিয়ে তাড়া করুক, কী মেনকা সামনে এসে ধেই ধেই করে নৃত্যই করুক; কী আসে যায়! তোদের রামললাও তো শুধু বাপের এক কথায় বনবাসে চলে গিয়েছিলেন। বাপ-মাকে কতটা ভক্তি করলে এমন করা যায় ভাব তো!'

সে চুপ করে আমার কথা শুনছিল। বুঝলাম ওষুধ ধরছে! ওরা যে ভাষা, যে জাতীয় যুক্তি বোঝে, সেই যুক্তি দিয়েই গজচক্র করতে হবে ব্যাটাকে! বললাম, 'তাছাড়া রামললা আসবেই বা কেন? তোরা সব নিরক্ষর! রামজির বাপ-মা কত শিক্ষিত ছিলেন জানিস? ভগবান রামজি নিজেও কত শিক্ষিত ছিলেন। সব বিদ্যা জানতেন! তোদের ঘরে এলে তো বেচারিকে ক' অক্ষর গোমাংস হয়েই থাকতে হবে! হয় কারোর খেতে কাজ করতে হবে, নয়তো কয়লাচুরি করতে পাঠাবি। কোনও দেব-দেবী এসব করে?'

বনোয়ারি কী বুঝল কে জানে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের আস্তে আস্তে বলল, 'সও টাকা কি বাত মাস্টারজি। কথা দিচ্ছি বেটা ঘরে এলে তাকে আমাদের মতো 'আনপঢ়, গওঁয়ার' বানাব না! আপনার সকুলেই পড়াব ছেলেকে! অনেকগুলো পাশ দেওয়াব...!'

এরপরও ও অনেকবার আমার কাছে এসেছে। দেখলাম, রামকে ছেড়ে ও এখন সীতাকে নিয়ে পড়েছে। সীতা-মাইয়াকে নিয়ে ওর অপরিসীম কৌতূহল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সীতার জন্মবৃত্তান্ত জানল। তারপর কী যেন ভেবে বলল, 'আচ্ছা মাস্টারজি, সীতা-মাইয়া তো তবে ধরতি মায়ের পুত্রী! মিট্টিতেই জন্ম। তবে তিনি কোনও ঔরতের পেট থেকে আসবেন কী করে?'

ওর প্রশ্নটা শুনে চমৎকৃত হয়েছিলাম। একটা অশিক্ষিত, মজুর মানুষের মাথায়ও এমন প্রশ্ন আসে! সীতার জন্ম যে মনুষ্য-যোনি থেকে হয়নি, হতে পারে না তা একদম ঠিকঠাক বুঝে গিয়েছে। আমি মৃদু হেসে বলি, 'এটা কলিকাল বনোয়ারি। এখন আর সীতা মাটি ভেদ করে আসেন না! আগে যজ্ঞ করে রাজা-রাজড়ারা ছেলেমেয়ে পেতেন। এখন হয়? তুইও তো তিন তিনবার ঘর বাঁধা দিয়ে, রামদুলারির গয়না বেচে জংলিবাবাকে দিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করালি। হল?'

বনোয়ারি সেদিন অসন্তুষ্ট মুখে চলে গিয়েছিল। সম্ভবত উত্তরটা ওর পছন্দ হয়নি। কিন্তু পিতৃ-মাতৃভক্তির ওষুধটা সত্যিই ধরেছিল। একদিন খবর পেলাম বনোয়ারি বাপ-মাকে নিজের ঘরে এনে তুলেছে। তাদের জোরদার সেবাও করছে!

সেদিন ভেবেছিলাম পরিবর্তনটা সাময়িক। কিন্তু আজ বংশীলালকে মেরে বনোয়ারি প্রমাণ করে দিল, সত্যিই সে বদলে গিয়েছে!

৩

'আপনি তো মিরাকল করে দিলেন মশাই!'

ডাক্তারবাবু প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে তাকালেন, 'ওদের অস্ত্রে ওদেরই ঘায়েল করেছেন! রামদুলারিকে বনোয়ারি আর পেটায় না। বংশীও ভাইয়ের ভয়ে সুখিয়ার গায়ে হাতটুকুও তোলে না! অতবড় একটা ট্র্যাজিক ঘটনা হয়ে যাওয়ার পরও সুখিয়াকে বেশি দোষারোপও করেনি! করলেন কীভাবে!'

ঘটনাটা সত্যিই ট্র্যাজিক! বংশীলালের সদ্যোজাত শিশুকন্যাটি দেখতে বড় চমৎকার হয়েছিল। ওদের ঘরে অমন সুন্দর রাজকন্যার মতো মেয়ে জন্মায় না! বংশী আর বনোয়ারির ঝামেলা চুকেবুকে গিয়েছিল সেদিনই। বনোয়ারি ছাড়া পেয়েই আমাকে ওর নতুন ভাইঝির 'মুখ-দিখাই'-এর জন্য 'নেওতা' দিয়ে বসল। প্রথামাফিক দেখতেও গিয়েছিলাম। একজোড়া ছোট ছোট রুপোর বালা দিয়ে শিশুটিকে দেখেওছিলাম। ভারী মায়াবী। সবচেয়ে মায়াবী তার হাসি! বংশী গর্বিত কাকার মতো বলেছিল, 'এই হল আমাদের সীতা-মাইয়া; নয় মাস্টারজি?'

আমি হেসে মাথা নেড়েছিলাম। বনোয়ারি তার সুন্দরী ভাইঝির গর্বে একেবারে কয়েক ইঞ্চি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল! এমনকি কাজ থেকেও তাড়াতাড়ি ফিরত শিশুকন্যাটির জন্য। সবসময়ই হয় তাকে কোলে নিয়ে আদর করছে, নয়তো খেলছে!

কিন্তু একদিন ও বাড়িতে ফের কান্নার রোল উঠল! তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে! বনোয়ারির অমন সুন্দরী শিশু সীতা-মাইয়াকে ভামে কিংবা শেয়ালে টেনে নিয়ে গিয়েছে। এ ঘটনা অবশ্য নতুন নয়! ওদের চিরকালীন অভ্যাস গরমকালে বাড়ির বাইরে দাওয়ায় শোওয়া! এর আগেও বহু নবজাতক ভাম বা শিয়ালের হিংস্র, লোলুপ দাঁতের শিকার হয়েছে। হতভাগিনী ক্লান্ত মা শিশুকন্যাকে কোলের কাছে রেখে নিশ্ছিদ্র ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল। কখন যে তার সন্তানকে বুক থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছে সুযোগসন্ধানী জানোয়ারগুলো, টেরই পায়নি।

ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি সে এক সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! বংশী সুখিয়াকে যা নয় তাই বলে দোষারোপ করছে। তার অবস্থা দেখে মনে হয় শোকের চেয়েও রাগ বেশি! তেলে পড়বে কী জলে পড়বে বুঝতে পারছে না!

আমি পৌঁছতেই গালিগালাজগুলোকে গিলে নিল বংশী। সুখিয়া বেচারি শুধু কেঁদেই চলেছে। ওর অবস্থা দেখে রাগ হল। বললাম, 'ওর কী দোষ? তুমিও তো বাপু পাশে ছিলে! তুমি টের পেয়েছ? না মেয়ের দায়িত্ব একা মায়েরই?'

চুপ করে ভর্ৎসনাটা হজম করল ও। মাথা হেঁট করে আমার কথাই মেনে নিল। জোরালো গলায় বললাম, 'খালি কান্নাকাটি-গালিগালাজ করলেই চলবে? মেয়েটার খোঁজ করবে না? হয়তো এখনও জন্তুটা বেশি দূর যেতে পারেনি। হয়তো এখনও আশা আছে...!'

আশা ছিল না! অনেক খোঁজাখুঁজির পর শুধু মেয়েটির পরনের ছোট্ট জামাটা মিলল। তাও ছেঁড়াখোঁড়া! সুখিয়া তিনদিন শুধু বুক ভাসিয়ে কাঁদল। বনোয়ারি গুম হয়ে বসে রইল। বংশী কয়েকদিন কাজে গেল না। আসন্নপ্রসবা রামদুলারি ভারী শরীরটা নিয়ে শুকনো মুখে গোটা ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে রইল। তার অনাগত সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় হয়তো কাঁদতেও পারল না!

তারপর আবার সব স্বাভাবিক! গরিবের ঘরে শোক বেশিদিন থাকে না। বিশেষ করে যখন একটির মৃত্যুর শোক ভোলাবার জন্য ঘরে আরও তিনটি মজুত রয়েছে তখন দুঃখের ঠাঁই বেশিক্ষণ হয় না। সুখিয়া চোখের জল মুছে কাজে লাগল। বংশীও ফের কয়লাচুরির কাজে নেমে পড়ল। ধাক্কাটা শুধু সামলাতে পারেনি বনোয়ারি। তার হাবভাব এরপর থেকেই কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেল! বেশি কথা

বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। সারাদিন ধরে কী যে ভাবে ভগবানই জানে! জিজ্ঞাসা করলে শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে!

'যে ভাবে এগোচ্ছেন, তাতে আপনার স্কুল হয়তো শিগগিরই ছাত্র-ছাত্রীতে ভরে উঠবে।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনাকে ওরা সবাই খুব মান্য করে। পারলে আপনিই পারবেন। অন্তত একটা লোককে তো কুসংস্কারের কবল থেকে টেনে বের করেছেন! আজ একজন বেরিয়েছে, কাল আরও দুজন বেরোবে। এইভাবেই তো হয়...!'

বুকের কয়েক ইঞ্চি ফুলে উঠল। অনেক সময় মানুষের ধারণা হয়, সে আসলে সাধারণ মানুষ নয়; যুগন্ধর! আমারও হঠাৎ তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এটা আসলে নিয়তি! আমি ওদের অন্ধত্ব দূরীকরণের জন্যই আসলে এসেছি! রামমোহন, বিদ্যাসাগর না হলেও আমি ছোটখাটো এক সমাজ সংস্কারক!

আত্মশ্লাঘা কখনই স্বাস্থ্যকর জিনিস নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু গর্বিত বোধ না করে পারলাম না। অন্তত বনোয়ারিকে তো আলোয় টেনে আনতে পেরেছি। যদিও পুরোপুরি নয়। কারণ তিনবারের পরও তার শিক্ষা হয়নি। রামদুলারির এখন-তখন অবস্থা। যে কোনও সময়ই চলে আসতে পারে নবজাতক। এই পরিস্থিতিতে সে আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে জংলিবাবাকে দিয়ে ফের যজ্ঞ করাচ্ছে! আমি আপত্তি করেছিলাম। সে শোনেনি। বলেছে, 'এইবার শেষ! এবার রামললা আসবেই!'

'যদি না আসে?'

সে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তবে আর কোশিশই করব না!'

আমি চুপ করে ওদের ঝুপড়ির দিকেই তাকিয়েছিলাম! কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উড়ছে! ওই জংলিবাবা কীসব পোড়াচ্ছে কে জানে! যত্তসব ভড়ং! যজ্ঞ, তুক-তাকের নামে কত লোকের শেষ সম্বলটুকুও গিলেছে শয়তানটা! আমার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। ওটাকেও দেখে নেব একদিন। যেদিন আমার সময় আসবে, সেদিন...!

আর কিছু ভাবার আগেই আচমকা মনে হল মাথাটা ঘুরছে! এ কী!...চতুর্দিকটা এভাবে পাক খাচ্ছে কেন? টের পেলাম পায়ের নীচে মাটিটাও আন্দোলন শুরু করেছে! যেন রামদুলারির মতোই প্রসব বেদনা উঠেছে তারও!...চোখের সামনে দেখতে পেলাম গাছগুলো কাঁপছে...কেউ যেন ধরে ঝাঁকাচ্ছে...ঝুপঝাপ করে ঝুপড়িগুলো খসে পড়ছে!...কী সর্বনাশ! ভূমিকম্প!

পড়িমরি করে দৌড়লাম শ্রমিকদের ঝুপড়ি লক্ষ্য করে। পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে...মনে হচ্ছে টাল খেয়ে পড়ে যাব...তবু দৌড়লাম...ওদের এখনই সাবধান করে দিতে হবে...বাইরে বেরিয়ে আসতে বলতে হবে! আর রামদুলারি! তার কী অবস্থা কে জানে...! ঝুপড়ির নীচে চাপা পড়েনি তো...!

টলতে টলতে কোনওমতে হাজির হয়েছি বনোয়ারিদের বাড়ির সামনে! বংশী আর সুখিয়া ততক্ষণে কোনওমতে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এসেছে যন্ত্রণাকাতর রামদুলারিকে। মেয়েরা মিলে কোনওমতে পরনের শাড়ি, গামছা দিয়ে আড়াল করেছে তাকে। ধাই-মা উপস্থিত! যজ্ঞ লন্ডভন্ড! ঝুপড়িগুলো মৃত সৈনিকের মতো মাটিতে এলিয়ে পড়েছে!...

'আ গয়ি! আ গ—য়ি!'

এই অবস্থায় একটা উচ্ছ্বসিত, আনন্দ-উদ্বেলিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠি! কী আশ্চর্য! বনোয়ারিলাল অমন উন্মত্তের মতো দু-হাত তুলে নাচছে কেন? ও কি পাগল হয়ে গেল! শোকে-দুঃখে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে?

'সীতা-মাইয়া আ গয়ি মাস্টারজি!' সে আমাকে আনন্দের চোটে জড়িয়ে ধরেছে, 'কলিকালেও সীতা-মাইয়া মাটির বুক চিরে প্রকট হয়েছেন! ওই দেখুন!'

তার অঙ্গুলিনির্দেশ লক্ষ্য করে যা দেখলাম তাতে মনে হল আদৌ ভূমিকম্পটা মাটিতে হচ্ছে না! আমার শরীরে হচ্ছে! প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম...মনে হল, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না...শুনতে পাচ্ছি না...!...বংশী আর সুখীয়া স্তম্ভিত, বিহ্বলের মতো সেদিকেই দেখছে...আর আমি...!

ভূমিকম্পের তীব্রতায় উঠোনের মাটি কোথাও ধসে পড়েছে! কোথাও লম্বালম্বি বিরাট চিড় ধরেছে। সেই চিড়ের ফাঁক দিয়েই উদ্ধত প্রশ্নের মতো একটা শিশুহাতের কঙ্কাল উঁকি মারছে! হাতে এখনও আমার দেওয়া রুপোর বালা! শিশুহাতটার তর্জনী নিবদ্ধ বনোয়ারিলালের দিকেই! কী যেন ইঙ্গিত করছে...! তার মানে...ওকে কোনও ভাম বা শেয়ালে নেয়নি...!

আমি কোনওমতে বললাম, 'বনোয়ারি! এ-কী!'

বনোয়ারি নাচতে নাচতেই বলল, 'সিয়া-মা! ধরতি ফুঁড়ে উঠে এসেছে! আমি জানতাম! আমি জানতাম কলিকাল হলেও আমার সিয়া-মা পুনর্জন্ম নিয়ে ধরতির বুক থেকে ঠিক উঠে আসবেনই! এবার তো রামললা আমার ঘরে আসবেই! সবাই জয়-জয়কার করো। শাঁখ বাজাও! সীতা-মাইয়া এসেছেন! রামও আসছেন! জয় সিয়ারাম, জয় জানকী-রাঘব, জয় সিয়ারাম...!'

হে রা-ম!

—

টিক-টক

১

ঘড়িটা দেখতে ভারী অদ্ভুত! মেহগনি কাঠের জগদ্দল চেহারার প্রায় ছ'ফুট লম্বা ঘড়ি। বাদামি মসৃণ দেহের চারপাশে সোনালি বর্ডার। প্রস্থেও কিছু কম নয়। ডায়ালটাও বিচিত্র! বিরাট গোলাকৃতি ডায়ালের ভেতরে সোনালি-রুপোলিতে লতাপাতার কারুকাজ। কতগুলো ডিজাইনের খপ্পরে এমন জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে সংখ্যাগুলো যে চট করে সময় উদ্ধার করা দুষ্কর! নীচে কাচের চতুষ্কোণ অংশে সোনালি পেন্ডুলাম মন্থর ভঙ্গিতে দুলছে। সবমিলিয়ে অদ্ভুত।

এতবড় ঘড়ি দিয়ে কী করত সাহেবগুলো ভগবানই জানেন! ঘড়ি তো নয়, আস্ত আলমারি! ওদের বিটকেল শখগুলো বোঝার ক্ষমতা বেশির ভাগ লোকেরই নেই। হাতে গোনা যে কয়েকটি লোক এই অদ্ভুত শখগুলোর মর্মার্থ বোঝেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমাদের মনিকাকু। তাঁর আবার আদ্যিকালের জিনিসপত্র কেনার খুব শখ! যত রাজ্যের ভারী ভারী ভিক্টোরিয়ান আসবাবপত্রে ঘর ভরিয়ে রেখেছেন। এ বাড়িতে ঢুকলই মনে হয়, ভুল করে কোনও জাদুঘরে ঢুকে পড়েছি বুঝি! অথবা ফ্ল্যাশব্যাকে ইংরেজ আমলে চলে গিয়েছি। মনিকাকুর এই জাতীয় শখে কাকিমা যথারীতি বিরক্ত! কথায় কথায় একদিন বলেই ফেললেন, 'এ বাড়িতে তো দেড়শো-দুশো বছরের কমবয়সি কোনও জিনিসই নেই! তাও আবার খাঁটি ইংরেজ স্টাইলের। তা এতই যখন ইংরেজ প্রীতি, তখন বিয়ে করার সময়ে দুশো বছরের একটি ইংরেজ পাত্রী জোগাড় করতে পারলে না? ল্যাটা চুকত!'

মনিকাকুর নিস্পৃহ জবাব, 'সে চেষ্টা করিনি ভাবছ? পার্কস্ট্রিটের গোরস্থানে গিয়ে অনেকবার খুঁজে দেখেছি। কিন্তু কোনও মেমসাহেবের প্রেতাত্মাই এই 'নিগারের' প্রতি ইন্টারেস্ট দেখালেন না! অগত্যা...!'

বলাই বাহুল্য কাকিমার বিরক্তিও কাকুকে থামাতে পারেনি। প্রতি বছরই তিনি কিছু না কিছু জিনিস দিব্যি আমদানি করে চলেছেন। বসার ঘর থেকে মাস্টার বেডরুম অবধি সবকিছুই প্রায় ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক জিনিসপত্তরের ম্যাও সামলানোও যে চাট্টিখানি কথা নয়, তা কাকু প্রথম টের পেলেন যখন টেলিফোনটা বিগড়ে গেল। রিসিভার তুললে প্রায়ই ডায়ালটোনের বদলে বজ্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। ভাগ্যক্রমে যদি বা কখনও লাইন লেগেও যায়, উল্টোদিকের কণ্ঠস্বর শুনলে মনে হয় যে বক্তার নির্ঘাত হুপিং কাশি হয়েছে!

বাধ্য হয়েই ফোন সারাই করার উদ্যোগ নিতে হল। যে ভদ্রলোক টেলিফোন ঠিক করতে এসেছিলেন, তিনি টেলিফোনের চেহারা দেখে প্রায় ভির্মি খেয়ে পড়েন আর কী! যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে বিষম খেয়ে বললেন, 'এটা...! এটা কক...ক্ষী!'

মনিকাকু সবিনয়ে জানান, 'আজ্ঞে টেলিফোন। এটা অবশ্য পুরোনো মডেলের রিসিভার। আসলে এটা হ্যামিলটন সাহেবের বাড়ির ফোন। বহুবছর আগে...!'

তিনি হয়তো রিসিভারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝাতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই ভদ্রলোক মুখ লম্বাটে করে বললেন, 'আজ্ঞে, আমায় মাফ করুন। আমি টেলিফোন ঠিক করতে পারি; শিলনোড়া নয়!'

কী মর্মবিদারী ডায়লগ! অমন শখের ঐতিহাসিক রিসিভারকে শিলনোড়া বললে মন ভেঙে যাওয়াই স্বাভাবিক। আমরা সবাই ভেবেছিলুম, হয়তো কাকু এই ট্র্যাজেডির পর ক্ষান্ত দেবেন। কিন্তু আমাদের ভাবনার ওপরে কয়েক গ্যালন জল ঢেলে কয়েকদিন পরেই তিনি এই জগদ্দল চেহারার ঘড়িটি আমদানি করলেন।

'এই ঘড়িটার নাম কী জানিস?' কাকু সগর্বে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'টিক টক!'

'টিক টক!' আমি অবাক, 'এ আবার কী জাতীয় নাম! ঘড়ির নাম আবার এরকম হয় নাকি!'

'হয়...হয়...জানতি পারো না।' কাকু হেসে বললেন, 'হিস্ট্রি আছে। একেবারে যাকে বলে রোমহর্ষক ইতিহাস!'

আমার দিদি মুখটা পাঁপড়ভাজার মতো করে বলল, 'প্লিজ, ফের বানিয়ে বানিয়ে কোনও ভূতের গল্প বলবে না। এর আগে বলেছিলে, ও ঘরের খাটটা যে মেমসাহেবের ছিল, তিনি নাকি আজও প্রতিরাতে নিজের পালঙ্কটা দেখতে আসেন। সেই গল্প শুনে বোন ওই পালঙ্কে শুয়ে সেরাতে ঘুমোতেই পারেনি! এসব ভুলভাল গল্প বলে বেচারিকে ভয় দেখানোর কোনও মানে হয়?'

'আমি ভুলভাল গল্প বলি?' কাকু গাল ফুলিয়েছেন, 'আচ্ছা বেশ, বলব না!'

এমন সুন্দর একটা গল্প শুরু হওয়ার আগেই গেল ভেস্তে! এমনিতেই আমার স্বভাব হিন্দি হরর ফিল্মের নায়িকাদের মতো। ভয়ও পাব, আবার সব কিছু দেখা বা শোনাও চাই। তাই প্রতিবাদ করলাম, 'মোট্টেও না। আমি একটুও ভয় পাই না। কাকু, তুমি বলো।'

কাকু সোৎসাহে বললেন, 'আচ্ছা। তবে নিজের দায়িত্বে শুনবি কিন্তু। নয়তো তোর দিদি বলবে আমি ভুলভাল গল্প বলে তোকে ভয় দেখাচ্ছি। ভয় পেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।'

'কিচ্ছু বলবে না। তুমি বলো।' আমি রীতিমতো আবদার ধরে বসেছি। দিদি বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, 'ধ্যুৎ! ফের গাঁজাখুরি গপ্প শুরু হবে। তুই একাই শোন। আমি বরং...!'

আর কিছু বলার আগেই আচমকা 'খ্যাঁও' করে একটা আর্তচিৎকার! আমি ভয় পেয়ে কাকুকে প্রায় জাপ্টে ধরেছি! দিদিও লাফ মেরে সরে গিয়েছে। কিছু বোঝার আগেই দেখলাম একটা সাদা উলের বল বিদ্যুৎবেগে পালিয়ে যাচ্ছে!

'জো-বি-স্কো! বাঁদর কোথাকার!' দিদি রেগে লাল, 'একদিন এটাকে আমি ঠিক গলা টিপে মারব! কথা নেই, বার্তা নেই, যেখানে-সেখানে লেজ পেতে শুয়ে থাকবে। আরেকটু হলেই লেজ মাড়িয়ে দিতাম...!'

এবার ঘটনাটা বোঝা গেল। বাঁদর নয়, জোবিস্কো কাকুর পোষা বিড়ালের নাম। আমি অনেক ধরনের বিড়াল দেখেছি, কিন্তু এমন বজ্জাত বিড়াল কখনও দেখিনি। জোবিস্কো নিজের লেজটাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে। সে অন্যান্য বিড়ালদের মতো সোফায়, বিছানায় বা আলমারির মাথায় উঠে বসে থাকে না। বরং যে রাস্তা দিয়ে লোকজন বেশি যাতায়াত করে ঠিক সেখানেই লেজটি পেতে দিয়ে শুয়ে থাকাই ওর স্বভাব। ভাবটা এমন, একবার শুধু ন্যাজে পাড়া দিয়ে দ্যাখ। তাপ্পর দেখাচ্ছি কী হয়...!

আমি আর দিদি ছাড়া আমাদের বাড়ির এমন কেউ বাকি ছিল না যে এ বাড়িতে বেড়াতে এসে অন্তত একবার জোবিস্কোর আঁচড়-কামড় খায়নি। এমনকি কাকিমাও তার ফাঁদে, থুক্কু...লেজে ভুল করে পা দিয়ে ফেলেছিলেন! এবং জব্বর কামড়ও খেয়েছিলেন। কাকিমা রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বহুবার জোবিস্কোকে পগারপার করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাকুর জন্য পারেননি।

'আহা, অমন বলিসনি।' মনিকাকু জোবিস্কোর প্রতি পরম মমতায় বললেন, 'অবোলা জীবটাকে গলা টিপে মারার কথা আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না! শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরার যে কী যন্ত্রণা, তা মর্মে মর্মে না বুঝলেও খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। যেদিন থেকে টিকটকের গল্প শুনেছি, সেদিন থেকে তো আরও বেশি...!'

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, 'খালি ভণিতাই করবে, না গল্পটাও বলবে?'

'শুনবি?' তাঁর চোখ চকচক করে ওঠে, 'আচ্ছা, শোন তাহলে।'

২

'এই ঘড়িটা একসময়ে জর্জ মাউন্টফোর্ড নামের এক সাহেবের ছিল।'

কাকু সিগারেটে আয়েশ করে একটান মেরে বললেন, 'সে বহুবছর আগেকার কথা। ১৮৫৭ সাল। সিপাহি বিদ্রোহের আগুন ক্রমাগত চতুর্দিকে লেলিহান শিখার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মীরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, দিল্লি তখন জ্বলছে। ভারতীয় সেপাইরা তখন সাদা চামড়া দেখলেই হয় গুলি করছে, নয়তো কুপিয়ে মারছে বা মুন্ডু উড়িয়ে দিচ্ছে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভেবে কূল পাচ্ছে না কীভাবে এই ভয়ংকর বিদ্রোহকে থামাবে! বিশেষ করে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরাই ছিল সেপাইদের টার্গেট। একের পর এক সাহেবদের কুঠিতে আক্রমণ চালাচ্ছে বিদ্রোহীরা। কিছু সাহেব সপরিবারে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। কেউ পারল না।

জর্জ মাউন্টফোর্ড তখন বিহারে ছিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে কোনও মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারেন। নিজেকে নিয়ে বিশেষ চিন্তা ছিল না। কিন্তু তাঁর সুন্দরী স্ত্রী অ্যাডেলাইন, শিশুপুত্র জ্যাক ও কন্যা ক্লারার জীবনও বিপন্ন। সিপাহীরা কাউকে রেয়াত করবে না। তাই তলে তলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করছিলেন। কিন্তু পালাবার সময় পেলেন না। এক অভিশপ্ত রাতে ভারতীয় সেপাইরা তাঁর কুঠি আক্রমণ করল! চাকর-বাকররা কে কোথায় পালাল কেউ জানল না! মাউন্টফোর্ড ছিলেন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাকাবুকো কর্মচারী। তিনি একাই রাইফেল নিয়ে সিপাহিদের মোকাবিলা

করতে চলে গেলেন। তবে যাওয়ার আগে প্রিয় পুত্র ও নাবালিকা কন্যাকে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখে গেলেন। তিনি ছাড়া একমাত্র তাঁর স্ত্রী অ্যাডেলাইনই জানতেন যে জ্যাক আর ক্লারা কোথায় আছে। কিন্তু ক্ষিপ্ত সেপাইরা দুজনকেই কচুকাটা করে, কুঠি লুটপাট করে চলে গেল।'

কাকু চুপ করে কিছুক্ষণ সিগারেটে টান মেরে ধোঁয়ার রিং বানাতে লাগলেন। আমি তখন চোখ গোলগোল করে গল্প শুনছি। কোনওমতে বললাম, 'তারপর?'

'তারপর আর কী?' তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, 'সাহেবের দাসদাসীরা পালিয়ে কোনওমতে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে সেই ভগ্ন কুঠিতে ভয়ের চোটে আর কেউ ফিরে গেল না। বিলাসবহুল কুঠিটা জনমানবহীন বিধ্বস্ত শ্মশানের মতো পড়ে রইল। শুধু সাহেবের এক অতিবিশ্বস্ত কাজের লোক ছিল, আগাথা! না, ঠিক কাজের লোক বলা যায় না তাকে। আসলে সে জ্যাক আর ক্লারার ধাত্রী। প্রাণ হাতে করে সে চব্বিশ ঘণ্টা পরে গোপনে ফিরে গেল কুঠিতে। মনে এই অসম্ভব অথচ ক্ষীণ আশা ছিল, যদি জ্যাক এবং ক্লারা কোনওমতে রক্ষা পেয়ে থাকে। কিন্তু আগাথা গোটা কুঠি তন্ন তন্ন করেও খুঁজে পেল না তাদের। ভগ্নমনোরথ হয়ে যখন ফিরে আসছে, তখনই আচমকা শুনতে পেল এই ঘড়ির ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ আসছে! কেউ যেন প্রাণপণে ঘড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে! মৃদু ধাক্কার সঙ্গে আঁচড়ের শব্দও পেল সে। কেউ যেন পাগলের মতো আঁচড় কাটছে ঘড়ির গায়ে!

আগাথা অতি সন্তর্পণে কান পাতল ঘড়ির গায়ে। কিন্তু যা শুনল তাতে তার রক্ত হিম হয়ে যায়। কে যেন ঘড়ির ভেতর থেকে ক্ষীণ স্বরে বলে চলেছে, 'টিক টক, টিক টক,...টিক টক!'

সে বিস্মিত হয়ে দেখল ঘড়ির বাইরের অংশে একটা ছোট্ট আংটা লাগানো আছে। সহজে চোখে পড়ে না। ঘড়ির গায়ের বাদামি রঙের সঙ্গেই বার্নিশ করে দেওয়া হয়েছে আংটাটাকে। ফলে সেটা আপাত অদৃশ্য। সম্ভবত সিপাইদের চোখেও পড়েনি। সে আংটাটাকে ধরে টানতেই ঘড়ির গায়ে একটা ছোট্ট দরজা খুলে গেল। এই দ্যাখ, একদম এই ভাবে...!'

বলতে বলতেই ঘড়ির গায়ের সেই আংটা ধরে টান মারলেন কাকু! সঙ্গে সঙ্গেই যেন খুলে গেল একটা ছোট্ট দরজা। বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখলাম, ওই জগদ্দল দশাসই ঘড়ির নীচের অংশটা ফাঁপা! রীতিমতো গুপ্ত কুঠুরির মতো একটা ফাঁপা জায়গা আছে সেখানে। একটা আস্ত পূর্ণ দৈর্ঘের চেহারার মানুষ না ঢুকতে পারলেও, ছোটখাটো চেহারার নাবালিকা বা একজন শিশু অনায়াসেই ঢুকে যেতে পারে সেখানে। অর্থাৎ এটাই সেই গোপন জায়গা, যেখানে মাউন্টফোর্ড সাহেব জ্যাক আর ক্লারাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন!

'মাউন্টফোর্ড সিপাইদের হাত থেকে পুত্র-কন্যাকে বাঁচিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভাবেননি ওই স্বল্প পরিসর জায়গায় কতক্ষণ তারা বদ্ধ হয়ে বাঁচতে পারবে! সঠিক সময়ে ওদের উদ্ধার না করলে যে ওই ঘড়িই তাঁর পুত্র-কন্যার জীবন্ত সমাধি হয়ে যাবে তাড়াহুড়োর মাথায় এ সম্ভাবনা মনে আসেনি। এবং যা হবার তাই হয়েছিল। দমবন্ধ হয়ে শিশুপুত্র জ্যাক অনেক আগেই মারা গিয়েছিল। তার বরফ-শীতল কঠিন মৃতদেহ কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে একটু

একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল ক্লারা! একটু অক্সিজেনের জন্য হাঁকপাক করতে করতে সে শুধু শুনতে পেয়েছিল ঘড়ির টিক টক শব্দ! এক একটা সেকেন্ড চলে যাচ্ছে, আর নাবালিকা প্রতীক্ষা করে যাচ্ছে এই গুপ্ত দরজা কখন খুলবে! এক একটা মুহূর্ত কাটছে, আর সে আশা ক্ষীণ হচ্ছে! ঘড়ির টিকটকের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকার লড়াই করছে সে। চোখের সামনেই নিঃশ্বাস নিতে না পেরে ততক্ষণে মারা গেছে ভাই জ্যাক! সে বুঝতে পেরেছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার আয়ুও শেষের পথে যাচ্ছে! শেষ পর্যন্ত সময়ের শব্দই অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় পাগল করে তুলেছিল তাকে!

আগাথা দরজাটা খুলে দিতেই ভিতর থেকে ক্লারার অবসন্ন দেহ ঢলে পড়ল তার বুকে। মেয়েটা ততক্ষণে জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। তার মুখ নীল! মৃত্যুযন্ত্রণায় হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ। কোনওমতে শুধু উচ্চারণ করল অন্তিম দুটো শব্দ, 'টিক টক!'

তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করলেন। এক অদ্ভুত মনখারাপ করা নীরবতা নেমে এল কিছুক্ষণের জন্য। আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কাকু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজার ওপরে আলতো করে হাত রাখলেন, 'সেই থেকেই এই ঘড়িটার নাম 'টিকটক'। আর এই দ্যাখ, এখনও পাল্লায় আঁচড়ের দাগগুলো রয়ে গিয়েছে...!'

সত্যিই এখনও সেখানে নখের আঁচড়ের দাগগুলো সুস্পষ্ট হয়ে জ্বলজ্বল করছে!

কাকু ভারী গলায় বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার জানিস, অনেক রং, বার্নিশ করার পরেও, বহু চেষ্টা করেও এই আঁচড়ের দাগটা মুছে দেওয়া যায়নি। যতবার রং করে ঢেকে দেওয়া হয়; ঠিক তার পরদিনই দেখা যায়, নখের আঁচড়গুলোর দাগ ফের স্পষ্ট হয়ে যথাস্থানে জ্বলজ্বল করছে! যতদিন যায়, আঁচড়ের দাগটাও যেন তাজা হয়ে ওঠে!'

'সে কী!' আমি অবাক, 'তা কী করে সম্ভব!'

তিনি জবাব দিলেন, 'দেয়ার আর মোর থিংস ইনি হেভেন অ্যান্ড আর্থ হোরেশিও...।'

৩

রাতে ঘুম আসছিল না! বারবার মনে পড়ছিল হতভাগ্য জ্যাক আর ক্লারার কথা। মাউন্টফোর্ড সাহেব আর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু বরং অনেক সহজে হয়েছিল। বড়জোর কয়েক মুহূর্তের মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল ওঁদের। কিন্তু সেই শিশু আর নাবালিকার কপালে যে এমন ভয়ংকর অভিশপ্ত মৃত্যু লেখা ছিল তা কে জানত!

আমি মনে মনে ভাবছিলাম ক্লারার কথা! কত বয়েস ছিল তার? বড়জোর দশ বা বারো! কেমন দেখতে ছিল সে? কল্পনায় তার চেহারাটাও দেখতে পাচ্ছিলাম। আইভরির মতো স্নিগ্ধ গায়ের রং। একঢাল কোঁকড়ানো সোনালি চুল! বার্বি ডলের মতো অবয়ব! চোখদুটো ঘন নীল! টুকটুকে গোলাপি ঠোঁটদুটোতে মায়াবী হাসি মাখানো! সেই মেয়ে একটা অন্ধকূপের মধ্যে বসে প্রতি মুহূর্তে তার মৃত্যুর প্রহর গুনছিল! চোখের সামনে শিশু ভাইটা দমবন্ধ হয়ে ধড়ফড় করে মারা গেল, অথচ কিচ্ছু করার নেই! কী অসহায়! তার প্রাণহীন দেহটাকে কোলে নিয়ে জীবন্ত সমাধির ভেতরে বসে আছে সে।

কেমন লেগেছিল তার? কী ভেবেছিল ক্লারা? দম নিতে পারছে না। একটু বাইরের হাওয়ার জন্য পাগলের মতো হাঁকপাক করছে। প্রাণপণে অন্ধকূপের দরজায় ধাক্কা মারছে, উন্মত্তের মতো আঁচড়াচ্ছে! একটা জীবিত, পরিচিত মানুষের কণ্ঠ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে এই আশায়, যদি কেউ এই অন্ধকূপ থেকে তাকে উদ্ধার করে। অথচ কানের কাছে শুধু একটাই শব্দ, টিকটক, টিকটক, টিকটক! শব্দ নয়, মৃত্যুর পদধ্বনি!

ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে বারোটার ঘণ্টা পড়ল। চিন্তায় চিন্তায় মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। গলাও শুকিয়ে গিয়েছে। অগত্যা বিছানা ছেড়ে উঠে গেলাম ডাইনিং রুমের দিকে। একটু ফ্রিজের ঠান্ডা জল না খেলে চলছে না! কী কুক্ষণে যে জ্যাক আর ক্লারার গল্প শুনতে গিয়েছিলাম! দিদি ঠিকই বলেছিল। মনিকাকুর গল্প না শুনলেই বোধহয় ভালো হত...!

এসব ভাবতে ভাবতেই আপনমনে ডাইনিংরুমের দিকে চলেছিলাম। আচমকা একটা অদ্ভুত শব্দ কানে আসতেই থমকে গেলাম! এ কী! এ কীসের আওয়াজ! কেমন খড়খড় শব্দ! তার সঙ্গে অস্ফুট গুমগুম! যেন কেউ দরজার পাল্লায় ধাক্কা মারছে।

আওয়াজটা আসছে কোথা থেকে? সদর দরজায়? এত রাতে কে আসবে? মনিকাকুর ঘরের দিকে তাকাই। সে ঘরের দরজা খোলা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ভিতর থেকে নাইট বালবের নীলাভ আলো চুঁইয়ে আসছে বাইরে। আমাদের ঘরের দরজা এইমাত্রই খুলে এসেছি। অতএব কারোর ধাক্কা মারার প্রশ্নই নেই! তবে? আমি কি ভুল শুনছি?

উৎকর্ণ হয়ে চুপচাপ আওয়াজটা শোনার চেষ্টা করি। নাঃ, মনের ভুল নয়। সত্যিই শব্দটা শোনা যাচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে পেলাম হলঘর থেকেই ধাক্কা মারা ও আঁচড়ানোর শব্দ আসছে। আর ওই ঘরেই রাখা আছে সেই বিখ্যাত ঘড়ি! টিকটক! জ্যাক আর ক্লারার জীবন্ত সমাধি...!

মুহূর্তের মধ্যেই মনে হল গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেছে! আওয়াজটা যেন ক্রমাগতই বাড়ছে। আমি যেন আর আমার মধ্যে নেই। মনে হচ্ছে হাত-পা গুলো ক্রমাগতই ভারী হয়ে উঠছে। এ যেন আমার হাত-পা নয়! যেন অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে আমায়।

সম্মোহিতের মতো এসে দাঁড়ালাম হলঘরে। আমি আর ঘড়িটা একদম মুখোমুখি! আর সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই! স্পষ্ট বুঝতে পারছি ধাক্কা মারার ও আঁচড়ানোর শব্দ ওই ঘড়ির চোরাকুঠুরির ভেতর থেকেই আসছে! এখন আরও জোরালো! অনেক বেশি সুস্পষ্ট! কে আছে ওর ভেতরে? তবে কি জ্যাক আর ক্লারা এখনও মুক্তি পায়নি ওই মৃত্যুকূপ থেকে! আজও শ্বাসরোধকারী যন্ত্রণায় আছাড়িপিছাড়ি খেয়ে মরছে! আমি কে? আমার ভূমিকা কী? সেই গভর্নেস আগাথা'র জায়গায় তবে কি আজ আমিই এসে দাঁড়িয়েছি! যার হাতে ওই চোরাকুঠুরির দরজা খুলবে!

বুকের ভিতর থেকে আচমকা আওয়াজ এল টিক টক, টিক টক! হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বলে চলেছে, টিক টক, টিক টক, টিক টক...! ঘড়ির পেন্ডুলামটা প্রবল ব্যঙ্গে তাল মারছে, টিক টক,

টিক টক...! ঘড়ির চোরাকুঠুরির ভেতর থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল, 'টিক টক...টিক টক...টিক টক...! চতুর্দিকে,...দেওয়াল, ছাত ফুঁড়ে ভেসে আসছে শুধু একটাই শব্দ :

'টিক টক...টিক টক...টিক টক...!'

এবার ঘড়িটার ভেতর থেকে আসছে শব্দটা! না, ভুল নয়। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, একটা কচি গলা হাঁকপাক করতে করতে বলছে, 'টিক টক—টিক টক...!' আমার অসহ্য লাগছে! না, এ শব্দ শুধু শব্দ নয়! জাগতিক আওয়াজ তো নয়ই...! হয়তো অন্য কোনও দুনিয়া থেকে ভেসে আসছে! এই শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে নিষ্ঠুর মৃত্যুর দ্যোতনা!...এ শব্দ মৃত্যুযন্ত্রণারই আরেক নাম! মনে হল দু-কান চেপে ধরি! কিন্তু আওয়াজ থামছে না! চোরাকুঠুরির দরজায় খড়খড় আঁচড়ের আওয়াজ ক্রমাগতই বাড়ছে। গুমগুম করে কে যেন দরজা পিটছে! দমবন্ধ মুহূর্তের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে প্রাণপণ ধাক্কা মারছে! প্রচণ্ড শক্তিতে দরজা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে সে!

হঠাৎ মনে হল, চারপাশের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার শ্বাসরোধ করে ফেলছে আমার! এত বড় হলঘরটা কবে এত ছোট হয়ে গেল? পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কীসে যেন পিঠ ঠেকে গেছে। আমি এগোতে পারছি না, পিছোতেও পারছি না! টের পেলাম, দরদর করে ঘামছি। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে! ফুসফুস দুটো পাথরের মতো ভারী! শরীর শিথিল হয়ে আসছে। আমিও কি ক্লারার মতোই অন্ধকূপে বন্দি? শুধু শুনতে পাচ্ছি ঘড়ির কুঠুরির দরজায় প্রবল ধাক্কা পড়ছে! আর সব কিছু মিলিয়ে যেতে যেতে মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে খেলা করে বেড়াচ্ছে একটাই অমোঘ শব্দ :

'টিক টক! টিক টক! টিক টক!'

কানের কাছে ফিসফিস করে কে যেন বলল।...কেউ আমার হাত ধরেছে। শিউরে উঠি! কী ঠান্ডা তার হাত! মৃত্যুযন্ত্রণায় শীতল হয়ে এসেছে! হাওয়া নেই! অথচ কার সুগন্ধী চুল যেন চোখে মুখে এসে আছড়ে পড়ছে। সিল্কের রাতপোশাকের সুগন্ধ ও মৃদু খসখস...! টের পাচ্ছি! সব টের পাচ্ছি!

যেটুকু শক্তি দেহে বাকি ছিল তা জড়ো করে কোনওমতে চেঁচিয়ে উঠি, 'কাকু, উ-উ-উ-উ!'

মুহূর্তের মধ্যে দুড়দাড় করে মানুষের ছুটে আসার শব্দ! হঠাৎ করে হলঘরের আলো জ্বলে উঠল। খড়খড় আওয়াজটা আরও বাড়ছে। আমি প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম! কে যেন ধরে ফেলল। দিদি! আবছা চোখে দেখলাম মনিকাকু থমকে দাঁড়ালেন ঘড়িটার সামনে! ভীতসন্ত্রস্ত চোখে কাকিমার দিকে তাকাচ্ছেন। অর্থাৎ শব্দটা তাঁর কানেও গিয়েছে। কাকিমার মুখও ফ্যাকাশে!

কয়েকটা অসহ্য মুহূর্ত! তারপরই কাকু এগিয়ে গেলেন ঘড়ির দিকে। অত্যন্ত সন্তর্পণে চোরাকুঠুরির দরজা খুলে দিলেন তিনি...আর সঙ্গে সঙ্গেই...!

'ম্যাঁও!'

একটা সাদা উলের বল আর্তনাদ করে, লম্ফ মেরে বেরিয়ে এল চোরাকুঠুরির ভেতর থেকে। তারপর এমনই পাঁই পাঁই করে দৌড় মারল, যেন তাকে ভূতে তাড়া করেছে!

মনিকাকু লাফ মেরে উঠে ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন, 'হতভাগা জোবিস্কো! আরেকটু হলেই বাড়িসুদ্ধু লোকের হার্টফেল হচ্ছিল! শয়তান বিড়াল কোথাকার! কালই যদি তোকে কান ধরে বাড়ি

থেকে বের না করেছি...!’

নাঃ, জ্যাক বা ক্লারা নয়, এসব জোবিস্কোরই কীর্তি! যখন মনিকাকু দরজাটা খুলে গল্প বলায় মগ্ন ছিলেন, আর আমি শুনতে শুনতেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, সেই সুযোগেই জোবিস্কো সুট করে ঢুকে পড়েছিল চোরাকুঠুরির ভিতরে। মনিকাকু সেটা লক্ষ না করেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এরপরের ঘটনা বলাই বাহুল্য। আচমকা আটকা পড়ে বিড়াল মশাই হতভম্ব! প্রথমে বুঝতে পারেননি ঘটনাটা কী ঘটেছে! যখন হৃদয়ঙ্গম হল তখন সেখান থেকে বেরোবার জন্য দরজায় ধাক্কা এবং আঁচড় দুইই তিনিই মারছিলেন! বাদবাকি ভৌতিক পরিবেশটা আমারই উত্তপ্ত মস্তিষ্কপ্রসূত!

এরপরও অনেকবার গিয়েছি মনিকাকুর বাড়ি। ঘড়িটা, অর্থাৎ টিকটক এখনও সেখানে আছে। তবে এরপর মনিকাকু আর কোনও ঐতিহাসিক জিনিস কেনেননি। জোবিস্কোও ওই একরাতের ধাক্কাতেই সোজা হয়ে গিয়েছিল। আর কোনও বেয়াদবি করেনি।

সবই ঠিক। শুধু একটা কথা আজও কাউকে বলিনি! সে রাতে এক ভিনদেশি অসহায়, ভীত, মৃত্যুপথযাত্রী নাবালিকার যন্ত্রণা সামান্য হলেও টের পেয়েছিলাম আমি! কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও এক ইংরেজ আর এক ভারতীয় মেয়ের অনুভব এক হয়ে গিয়েছিল। আজও সেই অদেখা হতভাগিনী মেয়েটার জন্য সহানুভূতি রয়ে গিয়েছে মনের এক কোণে।

তাই ক্লারাকে আজও ভুলিনি। ওকে ভোলা যায় না।

আরও একটা কথা কোনওদিন কাউকে বলিনি, বলবও না। সে রাত্রে আমি সত্যিই ঘড়ির ভেতর থেকে মানুষের কণ্ঠস্বরে একটানা বলে যাওয়া ‘টিক টক’ শব্দটা শুনতে পেয়েছিলাম। জোবিস্কোর ডাক শুনতে পাইনি। আমি কি ভুল শুনেছিলাম? নাকি অন্যকিছু? আর পরদিন আঁচড়ের দাগটাও ভালো করে দেখেছিলাম। আশ্চর্য বিষয়, সেখানে বিড়ালের তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ের দাগ ছিল না!

কিন্তু মানুষের নখের আঁচড়ের দাগ ছিল! আরও স্পষ্ট! আরও জ্বলজ্বলে!

তবে?...

সমাপ্ত

Table of Contents